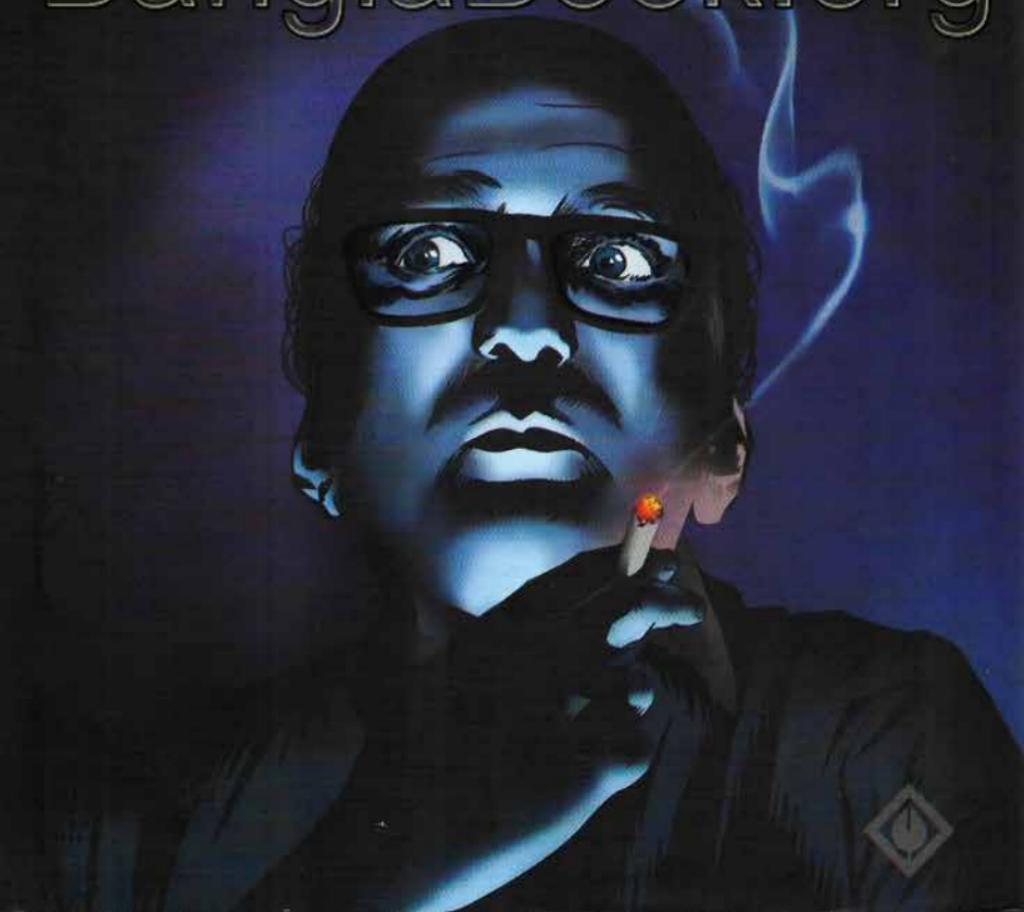


অনীশ দেব

# ভূমিখণ্ড গান্ধি

BanglaBook.org



# ବ୍ୟାପାରେ

ଅଭିଜ୍ଞତାର ବୁଲିତେ ଅଲୋକିକ-ଅତିଲୋକିକ  
ଘଟନାର କୋନ୍ତ ଶେଷ ନେଇ । ସେଇ ବୁଲି ଥେକେଇ  
ନିର୍ବାଚିତ ଦଶଟି ଶିହରନ-ଜାଗାନୋ କାହିନି  
ଏଇ ବହିଯେ ତୁଳେ ଧରେଛେ ଲେଖକ ।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার ভূতের ভয় পেতেন  
ছোটবেলা থেকেই। সেই ভয় থেকে রেহাই  
পাওয়ার জন্য তিনি কম চেষ্টা করেননি।  
অবশ্যে এক সন্ধ্যাসীর কাছে খুঁজে  
পেলেন ভূতের ভয় কাটানোর মহামন্ত্র।  
মনপ্রাণ দিয়ে ভূতের খোঁজ করে বেড়ালেই  
ভূতের ভয় কেটে যাবে।

সেই থেকে ভূতের খোঁজ শুরু। অশরীরী,  
অলৌকিক, প্রেত, পিশাচ, অপদেবতা  
নিয়ে চর্চা চলতে লাগল দিনের পর দিন।  
এরই মধ্যে কখন যেন প্রিয়নাথ নামটা  
বদলে হয়ে গেল ভূতনাথ।

ভূতনাথের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে  
অলৌকিক-অতিলৌকিক ঘটনার  
কোনও শেষ নেই। সেই ঝুলি থেকেই  
নির্বাচিত দশটি শিহরন-জাগানো কাহিনি  
এই বইয়ে তুলে ধরেছেন লেখক। প্রতিটি  
কাহিনি বিষয়-বৈচিত্র্যে অনন্য, আর  
প্রতিটি কাহিনিতেই রয়েছে চুম্বকের  
তীব্র টান।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে এত  
নিষ্ঠাভরে প্রাপ্তমনস্ক ভৌতিক কাহিনি  
আর কেউ বোধহয় আমাদের উপহার  
দেননি।



জন্ম ২২ অক্টোবর ১৯৫১, কলকাতায়। স্কুলের পড়াশোনা ও হিন্দু স্কুল। সাম্মানিক পদার্থবিজ্ঞানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে বি. টেক., এম. টেক. ও পিএইচ.ডি। পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি স্বর্গপদক ও একটি রৌপ্যপদক।

কর্মজীবনে ১৯৮৩ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার। ১৯৯০ থেকে ওই বিভাগেই রিডার, আর ১৯৯৮ থেকে প্রফেসর। ২০১৬-য় অবসর নিয়েছেন।

লেখালেখির শুরু ১৯৬৮-তে, অধুনালুপ্ত ‘মাসিক রহস্য পত্রিকা’য়।

প্রকাশিত কয়েকটি গল্পগ্রন্থ ও অনীশের সেরা ১০১, অশ্রীরী ভয়ংকর, দেখা যায় না শোনা যায়, তেইশ ঘণ্টা ঘাট মিনিট, ঘাট মিনিট তেইশ ঘণ্টা, বারোটি রহস্য উপন্যাস, পাঁচটি রহস্য উপন্যাস, ভয়পাতাল, কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র, বিশ্বের সেরা ভয়ংকর ভূতের গল্প, ভৌতিক অলৌকিক, সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র ইত্যাদি।

জনপ্রিয়-বিজ্ঞান প্রাঞ্চ বিজ্ঞানের হরেকরকম, সহজ কথায় ইন্টারনেট, কেমন করে কাজ করে যত্ন, রোমাঞ্চকর ধূমকেতু ইত্যাদি।

প্রধান নেশা—রহস্য-গোয়েন্দা, অলৌকিক ও কল্পবিজ্ঞান কাহিনি লেখালেখি, জনপ্রিয় বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান গবেষণা এবং কম্পিউটার।

পেয়েছেন প্রাচীন কলাকেন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৮), ড. জনচন্দ্র ঘোষ জাতীয় পুরস্কার (১৯৯৯), পাই নিয়ে রূপকথা বইয়ের জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার (২০১২) ও দীনেশচন্দ্র শুভি পুরস্কার (২০১৪)। সম্পাদনা করেছেন অল্পকালজীবী কয়েকটি মাসিক পত্রিকা ও বিমল করের ‘গল্পপত্র’ পত্রিকার বিশেষ কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা।

প্রচন্দ রঞ্জন দত্ত



ভূতনাথের ডায়েরি

অনীশ দেব

# তৃতীয় নাথের ডায়েরি



The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG



প্রভা ভারতী

[www.bookspatrabharati.com](http://www.bookspatrabharati.com)



পত্রভারতী

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK .ORG**

প্রথম পত্রভারতী প্রকাশ নববর্ষ ১৪২৪। এঙ্গিল ২০১৭

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯  
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রতা প্রিণ্টিং ইন্ডাস্ট্রি, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক নেণ,  
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচন্দ রঞ্জন দত্ত  
অলংকৃত সমীর সরকার

প্রকাশক এবং স্বাধারিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের  
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।  
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**BHUTNATHER DIARY**

A collection of ghost stories by Anish Deb  
Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009  
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799  
E-mail patrabharati@gmail.com  
visit at [www.facebook.com/PatraBharati](http://www.facebook.com/PatraBharati)

Price ₹ 250.00

ISBN 978-81-8374-439-3

অরংগচন্ত্র মজুমদার  
শাস্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়  
শ্রদ্ধাভাজনেষু

যাদের উৎসাহ ও ভরসা ছাড়া  
এ-বই কখনও লেখা হত না

## এক মিনিট, আপনাকে বলছি

‘ভূতনাথের ডায়েরি’-র জেনেসিসটা আপনাকে জানিয়ে দিই। সালটা ছিল ১৯৯৯। ‘দেব সাহিত্য কুটীর’-এর সর্বময় কর্তা ছিলেন অরুণচন্দ্র মজুমদার—যিনি এখন ‘শুকতারা’ পত্রিকার অন্যতম প্রকাশক। আমার পরম শ্রদ্ধেয় ‘অরুণদা’ একদিন ফোন করে বললেন, ‘অনীশবাবু, একদিন আমার দপ্তরে একটু আসবেন? একটু দরকার ছিল—’

‘সুভদ্রা অরুণদা এরকমই ছিলেন। বহুবার আপত্তি করা সত্ত্বেও আমার শুভনামের লেজে ‘বাবু’ জুড়ে দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হননি। আর তার সঙ্গে ‘আপনি’। সে-‘আপনি’ অরুণদা আজও ছাড়েননি।

তো দেখা করতে গেলাম। অরুণদা বললেন, ‘সামনের মাস থেকে প্রতিমাসে ‘নবক঳োল’ পত্রিকায় একটা করে ভূতের গল্প লিখতে হবে।’

ভয় পেয়ে গেলাম। আমি কি পারব?

পশ্চের উক্তরটা ঠিকঠাকভাবে ভেবে ওঠার আগেই তিনি বললেন, ‘কী ভাবছেন? আপনি ঠিক পারবেন।’

ব্যস, নির্বাহী সম্পাদক শাস্তিপ্রিয় বন্দোপাধ্যায়-কে তিনি পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিলেন। এবং পরের মাস থেকে ‘নবক঳োল’ পত্রিকায় শুরু হয়ে গেল ‘ভূতনাথ’-এর গল্পের সিরিজ। ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে এগারো মাসে দশটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল (একটি সংখ্যায় আমার লেখা দিতে দেরি হয়েছিল, তাই এগারোয় দশ)। পত্রিকায় প্রকাশের ক্রম অনুসারে গল্পগুলো বইয়ে সাজানো হয়েছে।

২০০১ সালে প্রথম প্রকাশের সময়ে প্রয়াত শিল্পী সমীর সরকার

—আমার কাছে ‘সমীরদা’—বইয়ের সমষ্ট ছবি এঁকে দেন। সম্পর্কের টানে ব্যক্তিগতভাবে ছবিগুলো তিনি আমাকে এঁকে দেন। এই ঘটনায় প্রথম প্রকাশকের কোনওরকম ভূমিকা ছিল না।

সমীর সরকারের ছবিগুলো এতই মনোহর যে, সেগুলো ছাড়া ‘ভূতনাথের ডায়েরি’-কে আমার পক্ষে ভাবা সম্ভব নয়। সেইজন্যই মোলো বছর পরে বইটির যে-সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে তাতে অনীশ দেব ও সমীর সরকারের যুগলবন্দি।

বইটি বহুবছর ধরে সহজলভ্য নয়। তাই আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই নতুন উদ্যোগ। এবং যথারীতি সেই উদ্যোগে ‘বইতরণী’ ত্বিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, ‘এই মানুষটা আমার জন্য আর কত করবেন!?’

তবে বইটা পরিমার্জিত সূচারু সংস্করণে প্রকাশিত হচ্ছে দেখে আমার ভালো লাগছে। পত্রভারতীর বরঙ্গ রায় বইটির মেকাপে যথেষ্ট অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।

সুতরাং ‘নতুন’ ভূতনাথ এখন আপনার হাতে। সেইসঙ্গে আমার লেখালিখির গুণমানের বিচারও।

নমস্কার।

১২ মার্চ ২০১৭

ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ  
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়  
রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ  
কলকাতা ৭০০ ০০৯

অনিল দেব

anishdeb2000@yahoo.co.in

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG



## ভূতনাথের ডায়েরি

আমার নাম প্রিয়নাথ জোয়ারদার। বিজ্ঞান যেখানে শেষ, সেইখান থেকে আমার কৌতুহল ও আগ্রহের শুরু। ছোটবেলা থেকেই ভূতে আমার ভীষণ ভয়। অশৰীরী, অলৌকিক, ভূত, প্রেত, পিশাচ আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিত। আঘায়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে যখনই এ-জাতীয় কোনও কাহিনি শুনতাম তখনই খুব ভয় পেতাম। পরে বড় হয়ে, কাঠমাণুর এক সন্ন্যাসীর পরামর্শে আমি ভূত-প্রেতের ভয় কাটানোর জন্য অভিনব এক পথ ধরি : ভূত-প্রেতের খোঁজ করে বেড়ানো।

সুতরাং সেই পঁচিশ-ছাবিশ বছর যায়স থেকেই আমার ভূতচর্চার কাজ শুরু হয়েছে। আজ এক্ষণ্পরিণত বয়েসে এসেও সে-কাজ থামেনি। এই তিন যুগ সময়ে কখন যেন আমার নাম ‘প্রিয়নাথ’-এর বদলে ‘ভূতনাথ’ হয়ে গেছে। সমবয়েসি বা গুরুজনরা সামনেই ‘ভূতনাথ’ বলে ডাকেন। আর, ছোট যারা, তারা বলে আড়ালে। আমি তাতে কিছু মনে করি না। বরং বেশ মজী পাই।

প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর ধরে ভূত-প্রেত, অশৰীরী-অলৌকিক নিয়ে আমার কম অভিজ্ঞতা হল না। তা ছাড়া ভূত-প্রেতের বহু কাহিনিও আমি শুনেছি। সেই সব অভিজ্ঞতা ও কাহিনি আমি যত্ন করে লিখে রেখেছি বারোটা মোটা-মোটা বাঁধানো খাতায়—অনেকটা ডায়েরির মতন। মাঝে-মাঝে সেই খাতাগুলোর পাতা উলটে স্মৃতিচারণ করি।

সম্প্রতি আমার আলাপ হয় এক কলমচির সঙ্গে। আলাপ করে জানলাঘ, তিনি নাকি রানিয়ে-বানিয়ে ভূতের গঁপ লেখেন। তখন আমি হেসে আমার খাতাগুলোর কথা তাঁকে বলি। শুনে তাঁর উৎসাহ দ্যাখে কে! আমার মিনমিনে ওজর-আপন্তি অগ্রাহ করে তিনি খাতাগুলো নিয়ে যান। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, ‘ডায়েরির লেখাগুলো ঘষে-মেজে কল্পনার প্রলেপ দিয়ে সামান্য রদবদল করে একে-একে আমি লিখব। আপনার কোনও আপন্তি শুনব না।’ ।

ভদ্রলোক আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। তাই একরকম মেহের বশেই তাঁকে আমি অনুমতি দিয়েছি। আমার ডায়েরির পৃষ্ঠায় কাহিনিগুলো বন্দি না থেকে সকলের সামনে প্রকাশ করলে ক্ষতি কী!



অন্ধকারে, হাতে হাত রেখে ১৩  
নন্দিনীর রাতের স্বপ্ন ৩৫  
অলক্ষণের গণি ৪৭  
ভয় পাওয়া মানুষ ৫৯  
মনের মতো বউ ৯১  
আঁধারে মায়ার খেলা ১০৩  
সামান্য কুয়াশা ছিল ১২৫  
নগ নির্জন রাত ১৪৭  
কনে-দেখো আলোয় ১৬৯  
ছায়াবন্দি খেলা ১৮৯



## অন্ধকারে, হাতে হাত রেখে

‘প্ল্যানচেট’ শব্দটা প্রথম কে উচ্চারণ করেছিল জানি না, তবে তাকে আমি দোষ দিতে চাই না। কারণ সে-রাতে শেষ পর্যন্ত যা হয়েছিল তার জন্যে আমরা কেউই দায়ী ছিলাম না। দায়ী ছিল একমাত্র নিয়তি।

ঘটনার শুরু সায়েন্স কলেজের ক্যান্টিনের আড্ডা থেকে।

পি-কে-সি-র ক্লাস কেটে আমরা পাঁচজন চায়ের কাপ সামনে রেখে ‘টাইটানিক’ নিয়ে তুমুল তর্ক করছিলাম। বিষয় ছিল, কেট টিউবলেন্ট বেশ সুন্দর দেখতে, না মাধুরী দীক্ষিত।

হঠাৎই রমেশ তিওয়ারি বলে উঠল, ‘পরশু অঞ্চি জুমেলিয়াকে স্বপ্নে দেখেছি—।’

আমাদের আড্ডা ‘ঝুপ’ করে থেমে গেল। সবাই চুপ।

কারণ জুমেলিয়া তিনমাস আগে অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

ও আমাদের সঙ্গেই পড়ত। মন্তে তিনেক আগে আমরা, মানে বি.টেক. থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্টরা, শৌনকদের মাইকেলনগরের বাগানবাড়িতে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। দলে আমরা মোট সতেরোজন ছিলাম। পিকনিকটা ছিল একেবারেই আমাদের নিজেদের ব্যাপার—ফলে কোনও স্যার-ট্যার

সঙ্গে যাননি। শীতের ছুটির দিনটা আমাদের দারুণ কেটেছিল।

টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিয়ে নাচ-গান। স্যারদের ক্যারিকেচার। ব্যাডমিন্টন, তাস, জমাটি আড্ডা। একটু-আধটু নেশা করা। তারপর কবজি ডুবিয়ে মাংস-ভাত। দিনটা সবাই দারুণ এনজয় করেছিল।

তা ছাড়া শৌনকদের বাগানবাড়িটাও ছিল চমৎকার। বিশাল গাছ-গাছালির বাগান, আর তার সঙ্গে প্রকাণ্ড মাপের দোতলা বাড়ি। কলকাতায় যে-নির্জনতার দেখা পাওয়াই ভার, এখানে তাকে দ্যাখে কে! তাই হারিয়ে যাওয়ার কোনও মানা ছিল না। জোড়ায়-জোড়ায় অনেকে হারিয়েও গেছি।

দিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে দৃটি কারণে।

সেদিন আমি সুছন্দাকে প্রথম চুমু খেয়েছিলাম।

আর, ফেরার সময় যশোর রোডের ওপর ‘জুমেলিয়া অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়।

সেদিন ওর সিগারেট খাওয়ার ঝঁক চেপেছিল। একে তো পিকনিকে ছল্লোড় করে এক-দু-পেগ খেয়ে একটু টিপসি ছিল, তারপর একটু জেদি—তাই ফেরার পথে জেদ ধরল এক্সুনি ওর ক্লাসিক সিগারেট চাই।

আমাদের কারও সঙ্গে ক্লাসিক ছিল না। আমরা অন্য ব্র্যান্ড ওকে দিতে চাইলাম। কিন্তু ওর সেই এক কথা, আমার বাপি ক্লাসিক ছাড়া খায় না—আমারও ওই চাই—রাইট নাউ সো স্টপ দ্য ব্লাডি বাস।’

বাস থামিয়ে জুমেলিয়া একা-একাই সেমে পড়েছিল। রাস্তা পার হয়ে গিয়েছিল একটা পান-সিগারেটের সেকানে। তারপর ফেরার সময় একটা ট্রাক ওর সিগারেট খাওয়ার সাথে চিরজীবনের মতো শেষ করে দিল।

ট্রাকটার একটা হেডলাইট খারাপ ছিল, আর জুমেলিয়ার নজর ছিল ঝাপসা! ফলে চোখের পলকে সব শেষ হয়ে গেল।

জুমেলিয়ার সঙ্গে আমাদের ক্লাসের বাঙাদিত্যর ‘ইয়ে’ আছে। কিন্তু বাঙা নিজেও সেদিন একটু-আধটু আউট ছিল। তার ওপরে জুমেলিয়া হল বড়লোক বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে—আদুরে এবং জেদি। সুতরাং ওর ভবিতব্য কেউ বদলাতে পারেনি।

নির্জন শীতের রাস্তায় সেই মর্মাঞ্চিক দুর্ঘটনা আমাদের সাংঘাতিক এক

ধাক্কা দিয়েছিল। আমরা পাথর হয়ে গিয়েছিলাম।

বাপ্পাদিত্য প্রায় দু-মাস পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। তারপর কোনওরকমে সামলে উঠেছে। এখনও ও প্রায়ই আনমনা হয়ে পড়ে, ক্লাসের পড়ায় মনোযোগ দিতে পারে না। সবকিছু ভীষণ ভুলে যায়। অথচ ও পড়াশোনায় দারুণ ছিল। বি. টেক. পার্ট ওয়ান আর পার্ট টু মিলিয়ে ওর র্যাক সেকেন্ড। জানি না, ফাইনাল ইয়ারে কীরকম রেজাল্ট করবে।

জুমেলিয়ার খেঁতলানো দেহটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। ওর ফরসা সুন্দর মুখটা অটুট ছিল। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ওর মুখ দেখে মনেই হয়নি ও আর নেই। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি। অপলক দু-চোখে অনেক সাধ ও স্বপ্ন। আর ঠোঁটের বাঁদিকে ছেউ কালো জড়ুলটা বরাবরের মতোই সুন্দর। বাপ্পা ওই জড়ুলটার জন্যে পাপল ছিল।

আমরা পাঁচজনই সেই পিকনিকে ছিলাম। আমি, বাপ্পা, রমেশ তিওয়ারি, শৌনক, আর ঐলিলা।

রমেশের কাণ্ডজন বেশ কম। যখন যা মনে হয় হটহাট করে বলে দেয়। যেমন, এখন। বাপ্পার অবস্থা জেনেশনেও ও ফস করে জুমেলিয়ার কথা তুলে বসল। তা ছাড়া, আমরা অনেকেই জানি, জুমেলিয়ার ব্যাপারে তিওয়ারির ইন্টারেস্ট ছিল। ভালো করে বাংলা শেখার জন্যে ও আমাকে আড়ালে বহুবার ধরেছে। বলছে ‘রঙ্গন, ইয়ার, আমাকে দো-তিন বাংলা লাভ ডায়ালগ শিখিয়ে দো।’

আমি হেসে জানতে চেয়েছি ‘কেন? কোথায় অ্যাপ্লাই করবি?’

জুমেলিয়ার কথা তিওয়ারি আর বলতে পারেনি। কারণ ও জানত, বাপ্পাকে আমরা সবাই ভালোবাসি। এমনকী ঐলিলাও বাপ্পাকে মনে মনে চাইত। পরে শৌনকের সঙ্গে ওর রিলেশন হয়।

তিওয়ারি জুমেলিয়ার কথা বলামাত্রই আমাদের আলোচনার বিষয় পালটে গেল। আলোচনা শুরু হল পিকনিক আর জুমিকে নিয়ে।

আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে-মনে চাইছিলাম এ-আলোচনা বন্ধ হোক, কিন্তু তা হয়নি। ধাপে-ধাপে আলোচনা পৌঁছে গেল আম্মা, প্রেতাম্মা, প্ল্যানচেট, সিয়াস, প্রেতচক্র, এইসবের দিকে। তবে ‘প্ল্যানচেট’

শব্দটা প্রথম কে উচ্চারণ করেছিল তা আমার মনে নেই।

ঐদ্বিলা এক চুমুকে চায়ের কাপ শেষ করে বলল, ‘আমার বড়জেঠু ছেটবেলায় খুব প্ল্যানচেট করতেন। নামকরা সব লোকদের নাকি ডেকে আনতেন। একবার নাথুরাম গডসে-কে ডেকেছিলেন। তখন অঙ্ককার ঘরের মধ্যে গুলির শব্দ শুনেছিলেন—।’

শৌনিক হো-হো-করে হেসে উঠে বলল, ‘যত্ত সব লাটাই-ঘূড়ি। আর-একটু তোলাই দিলেই বলবি মহাদ্বা গান্ধীর ‘হা রাম!’ কথাটাও তিনি শুনতে পেয়েছিলেন।’

ঐদ্বিলা রীতিমতো খেপে গিয়ে বলে উঠল, ‘প্ল্যানচেটের তুই কী বুঝবি! তোর কাছে তো সবকিছু ট্যান হয়ে বেরিয়ে যায়।’

আমি ওদের শাস্তি করার জন্যে বললাম, ‘তোরা যা-ই বলল প্ল্যানচেট ব্যাপারটা বোধহয় একেবারে বোগাস নয়। আমি একজনকে জানি...।’

বাঙ্গা আমাকে বাধা দিলঃ ‘আমি জুমিকে প্রায়ই স্বল্পে দেঁধি। কিছুতেই ওকে ভুলতে পারছি না।’

কথা বলতে-বলতেই বাঙ্গা মাথা নীচু করল, চোখে বুঝে চোখের কোণ আঙুলে টিপে ধরল। ওর পিঠটা বারবার ক্ষেপে উঠতে লাগল। বুঝতে কোনও অসুবিধে হল না যে বাঙ্গা ক্ষেপে দেঁধে।

ঐদ্বিলা বাঙ্গার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল, বিষণ্ণ গলায় বলল, ‘অন্য কথা ভাবার চেষ্টা কর। জুমি তো আর নেই। ওর কথা ভেবে শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছিস।’

আমি আর শৌনিক বাঙ্গাকে বোঝাতে লাগলাম। ওর মনটা বড় নরম আর সাদাসিধে—ঠিক কচি কলাপাতার মতো—অঙ্গেতেই আঁচড় পড়ে যায়।

অনেকক্ষণ পর বাঙ্গা নিজেকে সামলে নিয়ে ভারী গলায় বলল, ‘আমার কপালটাই খারাপ! জুমিকে যদি একটিবার দেখতে পেতাম! ’

শৌনিক আনমনা হয়ে কী যেন ভাবছিল। হঠাৎই ও ক্যান্টিনের বেঞ্চি ছেড়ে উঠে এল বাঙ্গার খুব কাছে। তারপর সিরিয়াস গলায় বলল, ‘তোকে একটা কথা জিগ্যেস করব?’

বাঙ্গা অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। আমরাও খানিকটা



गमीव संस्कार

বিমৃঢ় হয়ে চেয়ে রহিলাম শৌনকের চোখে।

শৌনক আবার বলল, ‘একটা কথা তোকে জিগ্যেস করব?’

‘কী কথা?’ বাঙ্গা জানতে চাইল।

জুমেলিয়াকে একবার দেখতে পেলেই তোর সাধ মিটবে?’

বাঙ্গা অস্বাভাবিক ঝটকায় মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ—।’

রমেশ এতক্ষণ গোবেচারাভাবে এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল, এইবার বলে উঠল, ‘ক্যায়সে দেখা যাবে?’

আমি আর ঐদ্বিলাও মুখে-চোখে একই প্রশ্ন ফুটিয়ে চেয়ে রহিলাম শৌনকের দিকে।

শৌনক বাঙ্গাকে আড়াল করে ঐদ্বিলার দিকে তাকিয়ে ঘড়যন্ত্রের হাসি হাসল। তারপর বলল, ‘আমরা পাঁচজন মিলে প্ল্যানচেটে বসব। ঐদ্বিলা মিডিয়াম হবে। জুমেলিয়ার সঙ্গে ওর ভালোরকম দৈনন্দিন ছিল। সুতরাং আমার বিশ্বাস, প্ল্যানচেটে জুমেলিয়া দেখা দেবে।’

আমি কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। একটু আগেই যে প্রেতচক্র নিয়ে ঐদ্বিলাকে ঠাট্টা-তামাসা করে নাজেহাল ব্রহ্মচূল সে হঠাৎ সিরিয়াসলি প্রেতচক্রের কথা ভাবছে! আর শুধু তা-ই নয়, জুমেলিয়া যে দেখা দেবে সে-কথাও প্রায় নিশ্চিতভাবে বলছে।

আমি ইতস্তত করে বললাম, ‘আমি ওতে নেই। প্ল্যানচেটের ব্যাপারে আমার ফান্ডা নেই।’

তিওয়ারি বলল, ‘রঙ্গন, তুই বেকার ঘাবড়াচ্ছিস। ভূতে আমার জবরদস্ত ফান্ডা আছে।’

পৃথিবীতে হেন কোনও বিষয় নেই যাতে রমেশ তিওয়ারির ফান্ডা নেই। সাধে কি আমরা ওকে ‘ফান্ডামেন্টাল তিওয়ারি’ বলে খ্যাপাই!

ঐদ্বিলা বলল, ‘তিওয়ারির ফান্ডার ওপরে ঠিক রিলাই করা যাবে না। রঙ্গন, তুই ব্যাপারটা নিয়ে একটু পড়াশোনা কর। আমি তোকে প্রচুর বইপত্র দেব। তোর হোমটাক্ষ হয়ে গেলে আমরা কাজে নামব।’

আমি বাঙ্গাকে দেখছিলাম। ওর মুখচোখে এক অদ্ভুত উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠেছে। জুমেলিয়াকে একটিবার দেখার জন্যে ও সতিই পাগল হয়ে গেছে।

তিওয়ারি বলল, ‘রঙ্গন পড়াশোনা করে করুক, আমি ভি থোড়াবহৎ স্টাডি করে আসব। কিন্তু কোথায় বসে প্ল্যানচেট করবি?’

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করতেই শৌনক বলল, ‘মাইকেলনগরে আমাদের বাগানবাড়িতে হবে। জায়গাটা জুমির হেবি পছন্দ ছিল।’

আমি বললাম, ‘প্ল্যানচেটের ব্যাপারটা রাতে হলেই ভালো হয় বলে শুনেছি। যদি সেটাই হয়, তা হলে সে-রাতে আমরা ফিরতে পারব না। ঐদ্বিলা কি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে? কাকিমা কি পারমিশান দেবেন?’

শৌনক অন্যরকম করে হাসল, বলল, ‘আমি যখন আছি তখন পারমিশান পাওয়া যাবে। আমরা তো ফাইনাল পরীক্ষার পরই সেট্টল করব। কী বল, মিতি?’

‘মিতি’ ঐদ্বিলার ডাকনাম। শৌনক মাঝে-মাঝে ওকে এই নামে ডাকে। মজা করে বলে, ‘ওর ডাকনামটা জ্যামিতি থেকে শৈমেছে।’

ঐদ্বিলা বলল, ‘মাস্মির প্ল্যানচেটের ব্যাপারে শুধু ইন্টারেস্ট। তা ছাড়া জুমিকে চিনত। জুমি আমাদের বাড়িতে বেশ ক্ষমতাবার গিয়েছিল। জুমিকে প্ল্যানচেট করা হবে শুনলে মাস্মি হয়তো আমার সঙ্গে যেতে চাইবে।’

শৌনক একেবারে হাততালি দিয়ে উচ্চিলঃ ‘তা হলে তো দারুণ হবে! কাকিমার হাতের রাঙ্গা খাওয়া যাবে—ঠিক পিকনিকের মতন...।’

বাঙ্গাদিত্য বিড়বিড় করে বলল, ‘জুমেলিয়াকে যদি দেখাতে পারিস, ‘তোদের কাছে আমি এভাব গ্রেটফুল থাকব।’

ঐদ্বিলা আমার দিকে আঙুল তুলে বলল, ‘রঙ্গন, কাল থেকে তোমার প্ল্যানচেটের প্রজেক্ট শুরু—কালই আমি বড়জেরুর কাছ থেকে একগাদা বইপত্র চেয়ে নিয়ে আসব।’

ব্যাপারটা সেদিন পিকনিক গোছের শুনিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোটেই সেরকম হয়নি।

ঐদ্বিলার দেওয়া বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলাম বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। করণ ঘটনার দিন

ঐন্দ্রিলা ওর মায়ের সঙ্গে মাঝবয়েসি এক ভদ্রলোককে নিয়ে হাজির হল।

মাইকেলনগর যাওয়ার পথে তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় হল। ভদ্রলোকের নাম প্রিয়নাথ জোয়ারদার—ভূত-প্রেতের ব্যাপারে আগ্রহের সীমা নেই। প্রেতাঞ্চার্চায় একেবারে ওস্তাদ মানুষ। ঐন্দ্রিলার বড়জেঠুর খুব বন্ধু। আমাদের প্ল্যানচেটের মতলবের কথা জানতে পেরে নিজেই আগ বাঢ়িয়ে সঙ্গী হতে চেয়েছে।

প্রিয়নাথ জোয়ারদারের মাথায় কপাল থেকে শুরু করে বেশ বড় মাপের টাক, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, দীর্ঘ সৌম্যকাণ্ডি ফরসা চেহারা। পরনে গাঢ় রঙের প্যান্ট আর নীল-সাদা স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট। পুরু ঠোঁটে সিগারেট।

ওঁকে দেখে সিনেমা বা নাটকের লোক বলে মনে হয়। ভূত-প্রেতের সঙ্গে ওঁর যে কোনওরকম সম্পর্ক থাকতে পারে আ অনুমান করা এককথায় অসম্ভব।

এরকম একজন বিচিত্র সঙ্গী পেয়ে মাইকেলনগর যাওয়ার পথে সময়টা দারুণ কাটল।

প্রিয়নাথের ভরাট গলা, আর কথাও বলেন ভারী চমৎকার। আমরা জুমির ব্যাপারটা ওঁকে জানিয়েছিলাম। এখন জুমিকে ঘিরে নানা ঘটনার কথা বলছিলাম। শুধু বাঙ্গা চুপচাপ বসে ছিল, আর ঐন্দ্রিলাও ওর মায়ের পাশে বসে কেমন যেন আনন্দনা, উদাস—দেখে মনে হচ্ছিল, ভেতরে-ভেতরে জটিল কোনও অঙ্ক কষছে।

প্রিয়নাথ তখন বলছিলেন, ‘জানো তো, ভূতচর্চা করি বলে সবাই আমার নাম দিয়েছে ভূতনাথ। তবে ওতে আমি কিছু মাইন্ড করি না। কোনও কিছু নিয়ে গবেষণা করাটা তো আর খারাপ না! এই ধরো না, এলাইনে না এলে আমি মাইকেল ফ্যারাডের ভূতের কথা জানতেই পারতাম না...।’

‘মাইকেল ফ্যারাডের ভূত!’ তিওয়ারি আর আমি অবাক হয়ে বললাম।

প্রিয়নাথ হেসে বললেন, ‘হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও মাইকেল ফ্যারাডের ভূত। ব্যাপারটা প্রথম রিপোর্টে হয় ১৯৬২ সালে। রিপোর্ট

করেছিলেন লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের হেভি ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক ডক্টর এরিক লেইথওয়েট। লন্ডনের রয়্যাল ইন্সিটিউশনে তিনি বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি হঠাৎ টের পেলেন তাঁর কাছে ফ্যারাডের ছায়া-শরীর দাঁড়িয়ে আছে। ফ্যারাডের প্রেত তাঁকে যেন বলল, ‘নাউ ইট্স অলরাইট, ল্যাড। যু আর ডুয়িং ফাইন।’ লেইথওয়েট যখন অন্য বিজ্ঞানীদের একথা জানালেন, তখন অনেকেই স্বীকার করেন যে, তাঁদেরও একইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। তোমারা নিশ্চয়ই জানো, ১৮১৩ সালে রয়্যাল ইন্সিটিউশনে ফ্যারাডে স্যার হামফ্রি ডেভির ল্যাবরেটোরি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতেন। পরে, ১৮৩৩ সালে, তিনি ডেভির জায়গায় প্রফেসর অফ কেমিস্ট্রি হয়েছিলেন।’

হাতের সিগারেটে বেশ কয়েকবার টান দিয়ে প্রিয়নাথ সেঙ্গী গাড়ির জানলা দিয়ে ফেলে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, লেইথওয়েটের ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়নি। ১৯৬৪ সালে ক্রিসমাসের ছুটিতে লেইথওয়েট আবার রয়্যাল ইন্সিটিউশনে ঘান উদ্দেশ্য ছিল, স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্যে বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়া। এধরনের বক্তৃতামালার ব্যাপারটা ফ্যারাডে নিজেই একসময় শুরু করেছিলেন। তো বক্তৃতার মাঝে একদিন লেইথওয়েট দর্শকদের সমন্বয়ে একটা পরীক্ষা সরাসরি করে দেখাতে চাইলেন। দুটো তারের কয়েল নিয়ে একটা ইলেকট্রিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট। এক্সপেরিমেন্টটা ঠিকঠাক হলে কয়েলে কারেন্ট পাঠানোমাত্রই একটা প্লেট থেকে একটা বল ছিটকে লাফিয়ে উঠবে। আর যদি ঠিক সময়ে কারেন্ট পাঠানো না হয় তা হলে বলটা প্লেটের ওপরে শুধু এপাশ-ওপাশ ঠকঠক করে কাঁপবে—লাফিয়ে উঠবে না।

‘তো লেইথওয়েট দু-বার পরীক্ষাটা করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সাকসেসফুল হলেন না। এটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার না—কারণ, লেইথওয়েট অঙ্ক কষে দেখেছিলেন এক্সপেরিমেন্টটা ৬৯৬ বার চেষ্টা করলে একবার মাত্র সফল হওয়া সম্ভব। সুতরাং তিনি আবার এক্সপেরিমেন্ট শুরু করার তোড়জোড় করতে লাগলেন। ঠিক তখনই একটা বিচ্ছি ঘটনা ঘটল। লেইথওয়েটের কানে কে যেন ফিসফিস করে বলল, তৃতীয়বারে

এক্সপ্রেরিমেন্টটা সাকসেসফুল হবে। ইচ্ছে করলে লেইথওয়েট আগেভাগেই স্টো দর্শকদের জানিয়ে দিতে পারেন। লেইথওয়েট ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কী ভেবে তিনি সত্যি সত্যিই দর্শকদের আগাম জানিয়ে দিলেন যে, এইবার পরীক্ষাটা সফল হবেই।’

একটু থামলেন প্রিয়নাথ। তারপর ছোট করে হেসে বললেন, ‘সত্যি-সত্যিই থার্ডবারে এক্সপ্রেরিমেন্টটা সাকসেসফুল হয়েছিল।’

কাকিমা—মানে, মিতির মা—জিগ্যেস করে বসলেন, ‘কানে-কানে কে ওইরকম কথা বলেছিল?’

প্রিয়নাথ এবার শব্দ করে হাসলেনঃ ‘স্টোও কি আর বলতে হবে?’

আমি মাইকেল ফ্যারাডের কথা ভাবছিলাম, কোথা থেকে জুমি তার মধ্যে চুকে পড়ল। আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম জুমেলিয়া আমাকে বলছে, ‘চট্টপট কর— তোদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি যে ছটফট করছি।’

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই যশোর রোড থেকে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে আমাদের গাড়ি মাইকেলনগরে চুকে পড়ল।

অঙ্ককার কখন যেন পা টিপে-টিপে নেমে এসেছে। রাস্তার সামান্য আলো কিংবা ছোটখাটো দোকানপাঞ্জির আলো তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু আমার মনে হল, অঙ্ককার যেন শিকারি বাধের মতো গাছ-গাছালির মাথায় ওত পেতে অপেক্ষা করছে—সুযোগ পেলেই ঝাপিয়ে পড়ে সব গ্রাস করবে।

প্রিয়নাথ বললেন, ‘তোমরা সবাই জুমেলিয়ার কথা ভাবো। প্ল্যানচেট সাকসেসফুল হওয়ার জন্যে এটা খুব জরুরি।’

শৌনক বলল, ‘আমরা তো রাত দশটায় বসব। তা হলে এখন থেকেই ভাবার কী দরকার।’

মিতি ওকে প্রায় বকুনি দিয়ে বলল, ‘এসব ব্যাপারে আঙ্কল এক্সপার্ট। আঙ্কল যা বলেন তা-ই শুনবি।’

তিওয়ারি বলল, ‘আমি কিন্তু শুরুসেই তনমন দিয়ে জুমির কথাই ভাবছি। খেয়াল করেছিস, আমরা ওর অ্যাঙ্গিডেন্টের স্পটের ওপর

দিয়েই এলাম।'

ব্যাপারটা আমিও খেয়াল করেছি, কিন্তু ইচ্ছে করেই সে-কথা আর মুখে উচ্চারণ করিনি। কিন্তু রমেশটার তো কাণ্ডজ্ঞান নেই। দেখলাম, বাঙ্গা দু-হাতে মুখ ঢেকে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে।

শৌনকদের বাগানবাড়ির পাশের মাঠে গাড়ি রেখে আমরা লোহার সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। শৌনকের ডাকে বাগানবাড়ির কেয়ারটেকার মতিলাল এসে তালা খুলে দিল। দরজার পাল্লা ঠেলতেই গা-শিউরে-ওঠা ক্যাচক্যাচ শব্দ হল।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, মাত্র তিনমাস আগে এই বাগানবাড়িতে এসে আমরা কত হইষ্টলোড় করে গেছি। তখন জায়গাটাকে দারুণ লেগেছিল। অথচ আজ এখানে ঢুকতেই কীরকম যেন গা ছুরুক্ষু করছে।

বাগানের গাছ-গাছালির পাশ দিয়ে এগোতে-এগোতে শৌনক প্রিয়নাথকে লক্ষ্য করে বলল, 'আঙ্কল, আজ আমাদের মিশন মুকসেসফুল হবেই।' তারপর ঐন্দ্রিলার দিকে তাকিয়েং 'কী বল, মিতি?'

ঐন্দ্রিলা আনমনাভাবে বলল, 'হ্যাঁ, হচ্ছে পারে।'

প্রিয়নাথ শৌনককে জিগেস করলেন্তু তুমি কী করে এত শিওর হচ্ছ বলো তো? তুমি কি কিছু ফিল করছো? অনেক সময় প্রেতাভ্যারা আসার আগে মনের ওপর ছাপ ফেলে জানান দেয়।'

শৌনক খানিকটা বিব্রতভাবে বলল, 'না, সেরকম কিছু না—এমনি মনে হচ্ছে।'

প্রিয়নাথ আর কোনও কথা বললেন না। তবে ওঁর কপালে কয়েকটা ভাঁজ যেন চোখে পড়ল।

আমরা শৌনকদের বাড়িতে চুকে পড়লাম।

প্রায় দেড়কাঠা জুড়ে দোতলা বাড়ি। শৌনকের দাদুর নামে বাড়িটার নাম রাখা হয়েছে 'ভুজঙ্গ নিবাস।' বাড়িটার বয়েস তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর হবে। বাড়িতে চুকেই কাকিমা আর মিতি রান্নাঘরের দিকে রওনা হল। প্রথমে আমাদের চা-জলখাবারের ব্যবস্থা, তারপর রাতের আয়োজন। আমরা সাতজন যে আজ এখানে আসব, থাকব, সে-কথা মতিলালকে

আগেই টেলিফোনে বলা ছিল। তাই সব ব্যবস্থা ও আগেই করে রেখেছিল। কিন্তু কাকিমা আর মিতি রান্নাঘরের দিকে রওনা হতেই প্রিয়নাথ ওদের ডাকলেনঃ মিসেস ঘোষ, এক মিনিট—একটু দাঁড়িয়ে যান।’

প্রিয়নাথ আঙ্কলকে ঘিরে আমরা ছ'জন দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওঁর কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাল্বের আলোয় বিশাল হলঘরে আমাদের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে।

‘প্রিয়নাথ কখন যেন আমাদের দলপতি হয়ে পড়েছেন। একটু কেশে নিয়ে হাতঘড়ি দেখে তিনি বললেন, ‘এখন ছ'টা বাজে। ঠিক ন'টায় আমরা খেতে বসব। সেই বুবো রান্নাবান্না করবেন। আর ঠিক দশটায় আমরা প্রেতচক্র শুরু করব। এ ছাড়া আর-একটা কথা—এখন থেকে প্রতিটি মুহূর্ত আমরা জুমেলিয়ার কথা ভাবব, ওকে নিয়ে আনেচ্ছুঁ। আমি আগে গোটা বাড়িটা একটু ঘুরে দেখে নিই, তারপর ঠিক করব কোন ঘরে বসলে আমাদের কাজের সুবিধে হবে। বস, এবার আপনারা রান্নাঘরে যান। তবে সময়টা মনে রাখবেন—রাত ঠিক দশটায় কাঁটায়-কাঁটায়।’

কাকিমা আর মিতি চলে যেতেই প্রিয়নাথ আমাদের বললেন, ‘তোমরা বাড়িটায় ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারো, বিহুটী পড়তে পারো, এ-ঘরে টিভি দেখতে পারো—শুধু বাড়ির বাইরে কোথাও যাবে না—এমনকী বাগানেও না। আর শৌনক, তুঁ আমার সঙ্গে একটু থাকো, আমাকে একটু হেল্প করো।’

প্রিয়নাথ সঙ্গে করে মাঝারি মাপের একটা ব্রিফকেস নিয়ে এসেছিলেন। সেটা দেখে মিতি কী জিগ্যেস করতেই তিনি হেসে বললেন, ‘ওতে ভূত নামানোর সরঞ্জাম আছে। আবার অনেক সময় ভূত তাড়ানোর জিনিসপত্রও থাকে।’

ব্রিফকেসটা হলঘরের একপাশে রাখা ছিল। সেটা হাতে নিয়ে প্রিয়নাথ শৌনকের সঙ্গে বাড়ি পরিদর্শনের কাজে এগোলেন।

ঠিক তখনই এরোপ্লেনের শব্দ শুনতে পেলাম।

শৌনকদের বাগানবাড়িটা এয়ারপোর্টের এত কাছে যে, সবসময়ই

এরোপ্লেন ওঠা-নামার বিকট শব্দ শোনা যায়।

বাপ্পাদিত্য হলঘরের একটা খোলা জানলার সামনে বসে ছিল। লক্ষ করলাম, জানলার বাইরেটা এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাপ্পা বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতে চেষ্টা করছে।

তিওয়ারি হলঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। হঠাৎই আমার কাছে এসে বলল, ‘অ্যাই, রঙ্গন—কুছ টের পাচ্ছ?’

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘না তো!’

ও চাপা গলায় বলল, ‘আমি টের পাচ্ছ। আমি ঘরের ওই কোণটায় গিয়েছিল—ওই আলমারিটার পাশে। তো শুনলাম, কে যেন খুব সফ্ট্রিল বলল, “রংশে, আমি তোকে ফোন করব।” কী বলব তোকে...একদম স্পষ্ট জুমেলিয়ার গলা। রঙ্গন, ইয়ার, মেরা তো ডর লগ হ্যায়।’

আমি তিওয়ারিকে ইশারায় চুপ করতে বললাম। আমার ভয় হচ্ছিল, বাপ্পা এ-কথা শুনতে পেলে আপসেট হয়ে পড়বে। কিন্তু তিওয়ারি কি ভুল বকছে? আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ের ছাপ দেখতে পেলাম। তাই সাহস দেওয়ার জন্যে বললাম, ‘ভয়ের কিছু নেই। প্রিয়নাথ আঙ্কল আমাদের সঙ্গে আছেন।’

তিওয়ারিকে দেখে মনে হল না শুধু একটা ভরসা পেল। ও তাড়াতাড়ি গিয়ে টিভির সুইচ অন করে দিল। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল টিভির সামনে।

আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। শৌনকদের বাড়িটা আজ কেমন যেন অন্তুত লাগছিল। এ-বাড়ির সব ঘরেই সাধারণ বাল্ব—কোনও টিউব লাইট নেই। পিকনিকের দিন তাতে কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু আজ বাল্বের আলো কেমন মলিন রহস্যময় লাগছে। আর সেই সঙ্গে অন্তুত দীর্ঘমাপের বিকৃত সব ছায়া। আমাদেরই চেনা জিনিসের ছায়া, অথচ কেমন অচেনা লাগছে।

আবার একটা প্লেনের শব্দ শুনতে পেলাম।

মনে পড়ে গেল, জুমিরা গত বছর প্লেনে করে আন্দামান বেড়াতে গিয়েছিল।

কী আশ্চর্য! আমরা দেখছি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যে-কোনও প্রসঙ্গে জুমেলিয়াকে জড়িয়ে ফেলছি! তিওয়ারি কি তা হলে টেলিফোনের কথা ভাবছিল? ফাস্ট ইয়ারে পড়ার সময় ও প্রায়ই জুমিরে ফোন করত।

এমন সময় টেলিফোনের রিং শুনতে পেলাম। দোতলায় ফোন বাজছে। তিওয়ারি আর বাঙাকে বলে আমি দোতলায় রওনা হলাম। রাত যত ঘন হচ্ছে, ততই যেন শীত-শীত ভাবটা বাঢ়ছে। অথচ পথে আসার সময় শীত খুব একটা টের পাওয়া যায়নি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই একটা ছোট মাপের ঘর। সে-ঘরেই টেলিফোনটা রাখা আছে। ঘরে পা দিয়েই দেখি শৌনক রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই চোখ টিপে বলল, ‘নে, তোর ফোন। সুছন্দা।’

সুছন্দা এখানে ফোন করবে জানতাম। তাই টেলিফোনের পেয়েই ওপরে রওনা হয়েছিলাম। ফোনে কথা বলতে-বলতেই ঘরজরে পড়ল, পাশের ঘরে প্রিয়নাথ ব্যস্তভাবে চলাফেরা করে কীসন করছেন। শৌনকের দিকে তাকাতেই ও ইশারা করে বলল। ওই ঘরটাকেই প্রিয়নাথ প্ল্যানচেটের জন্যে পছন্দ করেছেন।

আমি জানি, ওই ঘরটার পরেই আছে অস্বা বারান্দা। আর তার পাশেই কাদের যেন বিশাল বাগান। সেই বন্ধনে গাছ আর আগাছা সমান দাপটে রাজত্ব করে।

সুছন্দার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমি খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। অঙ্ককারে জোনাকি পোকার আলো চোখে পড়ছিল। আর কেন জানি না, জুমেলিয়ার কথা খুব মনে পড়ছিল।

বাল্বের আলোয় দেওয়ালে আমার ছায়া নড়ছিল। সেই বিচিত্র ছায়ার দিকে তাকিয়ে আমার মন হঠাৎই বলে উঠল, ‘আজ রাতে জুমির সঙ্গে দেখা হবে।’

অঙ্ককারে, হাতে হাত ধরে আমরা জুমেলিয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

একটা টেবিলকে ঘিরে আমরা ছ'জন চুপচাপ বসেছিলাম, আর প্রিয়নাথের নির্দেশমতো জুমেলিয়ার কথা ভাবছিলাম।

ঘরের সব জানলা-দরজা বন্ধ। এক কোণে একটা কাঠের বাঞ্ছের আড়ালে একটা বড় মোমবাতি জুলছে। মোমবাতির আলো দেওয়ালে পড়ে আবছা একটা আলোর আভা তৈরি করেছে। আলোটা যাতে মলিন হয় সেজন্যে প্রিয়নাথ আড়ালের ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের সামনে টেবিলে একটা ডিজিটাল থার্মোমিটার আর কম্পাস রয়েছে। মাঝে-মাঝে পেনসিল-টর্চ জুলে প্রিয়নাথ সে-দুটোর রিডিং দেখেছেন। প্রিয়নাথের পাশেই বসেছে বাঙাদিত্য—ওর সামনে একটা বড় সাদা কাগজ আর পেনসিল।

প্রিয়নাথ ফিসফিস করে বললেন, ‘বাঙ্গা, আমি বললেই তুমি পেনসিলটা হাতে তুলে নেবে, আলতো করে ধরে রাখবে কাগজের ওপরে—যাতে ইচ্ছাশক্তি দিয়ে কেউ তোমাকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নিতে পারে’

বাঙ্গা চাপা গলায় বলল, ‘ঠিক আছে। কিন্তু পেনসিল ধরতে গেলে তো আমাকে রঙ্গনের হাত ছেড়ে দিতে হবে।’

‘ছেড়ে দেবে’ প্রিয়নাথ তারপর আঙুক উদ্দেশ করে বললেন, ‘রঙ্গন, তুমি তখন বাঙ্গাকে টাচ করে থাকবে।’

বাঙ্গার ডানপাশ থেকে আমি জুরীর দিলাম, ‘ও. কে.।’

‘ব্যস, আর কোনও কথা নয়—।’

শৌনক জিগ্যেস করল, ‘আমিও কি কাগজ-পেনসিল নেব?’

প্রিয়নাথ সিদ্ধান্তের সুরে বললেন, ‘না।’ একটু থেমে তারপর : ‘আমি নাম ধরে না ডাকলে কেউ সাড়া দিয়ো না। মিসেস ঘোষ, আপনিও না।’

আবার সব চুপচাপ।

একটা ব্যাপার আমার অস্তুত লাগছে। যে-শৌনক কখনও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে না, সবসময় প্ল্যানচেট ইত্যাদি নিয়ে রঙ-ব্যঙ্গ করে, সে যেন এই প্ল্যানচেটের ব্যাপারে এসে থেকেই অতি-আগ্রহ দেখাচ্ছে। আর বারবার বলছে, আমাদের মিশন সাকসেসফুল হবেই।

ঐলিলা আমাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বসে নেই। কারণ, ও

মিডিয়াম হয়েছে। প্রিয়নাথ ওকেই মিডিয়াম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কাকিমা এ-ব্যাপারে সামান্য খুঁতখুঁত করলেও শৌনক আর ঐন্দ্রিলাই উৎসাহের কাছে তাঁর অনিচ্ছা ভেসে গেছে। তা ছাড়া প্রিয়নাথ বলেছেন, আমাদের মধ্যে ঐন্দ্রিলাই সবচেয়ে ভালো মিডিয়াম হবে—কারণ, ও জুমেলিয়ার সমবয়েসি মেয়ে।

ঘরের সবচেয়ে গাঢ় অঙ্ককার অংশে মিতি স্থির হয়ে বসে আছে। ওকে দেখতে না পেলেও ওকে আমরা অনুভব করতে পারছি। ওর হাত দুটো সরু সাদা সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন প্রিয়নাথ। বাঁধার সময় তিওয়ারি বলেছে, ‘এ কাচে ধাগে তো স্যার টান মারলেই ছিঁড়ে যাবে!’

প্রিয়নাথ উত্তরে বলেছেন, ‘ঐন্দ্রিলা তো আর নিজে-নিজে সুতো ছিঁড়বে না। যাকে আমরা ডাকছি সে যদি চায় তবেই সুতো ছিঁড়বে।’

আমরা ছুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম। শুধু আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে লাগল। আর মাঝে-মাঝে এরোপ্লেনের শব্দ। তবে বুকের ভেতর একটা টিপটিপ শব্দও যেন টের পাইলাম।

হঠাৎই জোরে শ্বাস ফেলার মতো ‘কেউ’ করে একটা শব্দ হল। আর তারপরই আমাদের টেবিলটা স্মৃষ্টি নড়ে উঠল।

প্রিয়নাথ সঙ্গে সঙ্গে পেনসিল-চিত্র জেলে কম্পাস ও থার্মোমিটার দেখলেন। আমিও সেদিকে চোখ রাখলাম। কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে মুখ করে স্থির হয়ে আছে, আর থার্মোমিটারে উষ্ণতা ১৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস—প্রেতচক্রে বসার আগে যা ছিল প্রায় তাই।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার বলেছিলেন, কোনও প্রেতাভাব উপস্থিতিতে কম্পাসের কাঁটা যে-কোনও দিকে মুখে করে অস্থিরভাবে ছটফট করতে থাকে। অনেক সময় বনবন করে পাক খায়। আর উষ্ণতা নামতে থাকে নীচের দিকে।

ফলে আমি একটু স্বত্ত্ব পেলাম।

প্রিয়নাথ চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় প্রশ্ন করলেন, ‘কেউ কি এসেছেন?’ কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। তবে মনে হল যেন, আচমকা শ্বাস টানার একটা শব্দ পেলাম। তারপর সব চুপচাপ।

বাঙ্গা বোধহয় টেনশান আর সইতে পারছিল না। প্রিয়নাথের নিষেধ না মেনে ও ফিসফিসে স্বরে প্রশ্ন করল, ‘কে, জুমি?’

আমাদের পাথর করে দিয়ে ফিসফিস করে কেউ জবাব দিল, ‘হ্যাঁ—।’

শব্দটা একটানা সুরে দীর্ঘশ্বাসের মতো বেরিয়ে এল। যেন বিশাল কোনও বেলুন থেকে ধীরে-ধীরে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয়নাথ উত্তেজিতভাবে ধমক দিয়ে বললেন, ‘বাঙ্গা কী হচ্ছে!’ তারপর অন্ধকার লক্ষ্য করে আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, ‘কেউ কি এসেছেন?’ কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

কিন্তু পরক্ষণেই যা দেখলাম তাতে আমার চেতনায় কেউ যেন ভারী একটা হাতুড়ি দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করল।

মিতি কখন যেন ওর চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছে। যোমবৰ্তির আলোর সামান্য আভায় ওকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ কোন মিতি!

ও কালচে রঙের একটা চুড়িদার পরেছিল সেটা এখন ভৌতিক আলখাল্লার মতো লাগছে। ওর মুখে মূকাভিন্নতদের মতো সাদা রং মাখা। কেউ কি রং মাখিয়েছে, নাকি ভয় ফ্যাক্সে হয়ে ওর মুখের এই চেহারা দাঁড়িয়েছে! ওর মুখের সাদা রঙের জন্মেই ওর ঠোঁটের বাঁ দিকে একটা কালো জড়ুল নজরে পড়ল—ঠিক জুমেলিয়ার মতো। কিন্তু মিতির মুখে তো কোনও জড়ুল নেই! হঠাতে করে এ-জড়ুল এল কোথা থেকে!

হাত দুটো বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথার ওপরে তুলে মিতি এপাশ-ওপাশ দুলছিল। বড়-বড় শ্বাস ফেলতে-ফেলতে ও বাঙ্গাদিত্যের নাম ধরে ফিসফিস করে দু-বার ডেকে উঠল।

প্রিয়নাথ চাপা গলায় আদেশের সুরে বললেন, ‘বাঙ্গা, পেনসিল নিয়ে রেডি হও—।’

বাঙ্গার হাত যে কাঁপছিল সেটা আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম। ও আমার হাত ছেড়ে পেনসিল নিয়ে তৈরি হল। আমি অন্ধকারেই আন্দাজ করে ওর কাঁধ ছুঁয়ে বসে রইলাম।

প্রিয়নাথ পেনসিল-টর্চ জ্বেলে কম্পাস আর থার্মোমিটার দেখলেন।

সেখানে কোনও পরিবর্তন নজরে পড়ল না। তিনি উৎকৃষ্টিত গলায় প্রশ্ন করলেন, ‘কেউ কি এসেছেন?’

উত্তরে ঐদ্রিলা খলখল করে হেসে উঠল।

কাকিমা একটা ভয়ের চিন্কার দিয়ে উঠলেন। টেবিলে খটখট করে কয়েকবার শব্দ হল। আমার বুকের ভেতরে একটা পাগল তখন দুরমুশ পিটছিল।

এমন সময় একটা এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল।

শৌনকদের বাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া প্রতিটি প্লেনের শব্দ ঠিক একইভাবে ক্ষীণ থেকে শুরু হয়ে জোরালো হয়, তারপর গেঁ-গেঁ শব্দটা কমজোরি হয়ে ক্রমে দূরে মিলিয়ে যায়।

কিন্তু এইবারের শব্দটা আচমকা মাঝপথে থেমে গেল। ~~কেন্দ্ৰীয়~~ যেন গলা টিপে একটা কথা-বলা পুতুলকে থামিয়ে দিল।

ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। প্লেনটা আকাশ থেকে গেল কোথায়! কিন্তু ভাবার আর সময় পেলাম না। কারণ, ঠিক তফুনি ঐদ্রিলা পাগলের মতো দিঘিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মাথা ঝাঁকাঝে লাগল।

সে কী মাথা ঝাঁকানি! যেন একটা ‘মাথা-নাড়া বুড়ো’ পুতুলের পাধরে কেউ পাগলের মতো ঝাঁকাঝে।

ওই অবস্থাতেই মিতি বাঙ্গার নামটা ফিসফিস করে বলছিল।

বাঙ্গা ডুকরে কেঁদে উঠল। কাগজের ওপরে ওর পেনসিল ধরা হাত খসখস শব্দে চলতে লাগল।

আর স্পষ্ট টের পেলাম ঘরের উষ্ণতা কমছে। ভীষণ শীত করছে আমাদের।

প্রিয়নাথ পেনসিল-ট্র্যাচ জুলে থার্মোমিটার আর কম্পাস দেখলেন। ঘরের উষ্ণতা প্রায় ১০ ডিগ্রি, আর কম্পাসের কাঁটাটা বনবন করে ঘূরছে।

প্রিয়নাথ একরকম চিন্কার করেই জিগ্যেস করলেন, ‘কেউ কি এসেছেন?’

উত্তরে মিতি আবার খলখল করে হেসে উঠে অঙ্গুত চেরা গলায় বলল, ‘এখনও তুই বুঝিসনি?’

পাশের ঘরের টেলিফোনটা হঠাৎই পাগলা-ঘণ্টির মতো বাজতে শুরু করল। এরকম দ্রুত লয়ে কখনও আমি টেলিফোন বাজতে শুনিনি।

একটা জানলা ‘দড়াম’ করে খুলে গেল। ঠাণ্ডা বাতাস সাপের মতো পাক খেয়ে চুকে পড়ল ঘরে। তারপর প্রলয়ন্ত্য নাচতে শুরু করল।

আমাদের অবাক করে দিয়ে বাতাসের সঙ্গে-সঙ্গে চুকে পড়ল অসংখ্য জোনাকি। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি জোনাকি। অন্ধকার ঘরে আগুনের ফুলকি হয়ে ওরা ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়াতে লাগল। ওদের এলোমেলো ভেসে বেড়ানো দেখে বাতাসের শ্রোত বোৰা যাচ্ছিল।

তিওয়ারি আর্তনাদের মতো একটা শব্দ করল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, ‘ভাগজোগনি! ভাগজোগনি! জুগনু! জগনু!’

ততক্ষণে ঠাণ্ডায় আমরা ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছি। আর কাকিমা ‘মিতি! মিতি!’ বলে ডেকে-ডেকে হাউমাউ করে কাদতে শুরু করেছেন।

মিতি পাগলের মতো মাথা-ঝাঁকাচ্ছিল। হঠাৎই শক-খাওয়া মানুষের মতো ছিটকে পড়ল মেঝেতে। টেলিফোনের ঘণ্ট তখনও কিন্তু থামেনি।

প্রিয়নাথ চেঁচিয়ে বললেন, ‘শৌনকলাহট জুলে দাও।’ তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে ছুটে গেলেন শোমবাতির কাছে। ওটা তুলে নিয়ে ঐলিলার কাছে গেলেন।

ঘরের মধ্যে ঠিক কী যে হচ্ছিল মনে করে বলতে পারব না। শুধু মনে আছে এলোমেলো ভয়ের চিকিরা, কথাবার্তা, আর টেলিফোনের পাগলা-ঘণ্টি।

শৌনক ঘরের আলো জুলে দিয়ে চিকিরা করে বলল, ‘এক মিনিট। সবাই শোনো। এসবে ভয়ের কিছু নেই। এই ব্যাপারটা পুরোটাই সাজানো নাটক।’

মুহূর্তে সব চিকিরা চেঁচামেচি থেমে গেল। শৌনক ফোন ধরার জন্যে এগোতেই ফোনের ঘণ্টিও আচমকা ‘চুপ’ করে গেল।

আমরা সবাই তখন মিতিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছি। ও চোখ বুজে মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু এ কী অস্তুত চেহারা হয়েছে মিতির!

ওর সারা মুখে সাদা রং। ঠোটজোড়া টুকটুকে লাল। ঠোটের বাঁদিকে  
একটা কালো জড়ুল আঁকা রয়েছে।

প্রিয়নাথ মিতির ওপরে ঝুঁকে পড়ে ওকে নানাভাবে পরীক্ষা করছিলেন।  
শৌনক ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঠাট্টার হাসি হেসে বলল,  
'আঙ্কল, আপনি উঠে পড়ুন। মিতির কিস্য হয়নি। বাপ্পাকে একটু  
সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যে আমি আর মিতি নকল ভূত নামানোর প্ল্যান  
করেছিলেন। ওর হাতব্যাগে মেকাপের জিনিস ছিল। অঙ্ককারে লুকিয়ে  
মুখে মেখে নিয়েছে। আর জুমেলিয়ার এফেষ্ট আনার জন্যে ভুরু আঁকার  
পেনসিল দিয়ে জড়ুলটা এঁকে নিয়েছে।' কথা শেষ করেই শৌনক হো-  
হো করে হেসে উঠল : 'তবে সবাই যে এরকম ব্যাপক ~~ভুরু~~ পেয়ে  
যাবে ভাবিনি।'

রমেশ তিওয়ারি হতভম্ব মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। জোনাকিণ্ডলোর দিকে  
দেখিয়ে আমতা-আমতা করে শৌনককে জিগেস করল, 'তা হলে এই  
ভাগজোগনিণ্ডলো কোথা থেকে এল?'

জোনাকিণ্ডলো তখনও ঘরের ভেতরে উড়েছিল। তবে ঘরের আলোয়  
ওদের অনেক নিপ্পত্তি লাগছিল।

শৌনক থতমত খেয়ে বলল, 'জানি না—।'

প্রিয়নাথ কপালে হাত চেপে মিতির পাশে উবু হয়ে বসেছিলেন।  
শৌনকের দিকে ঘুরে তাকিয়ে গভীর গলার প্রশ্ন করলেন, 'টেলিফোনটা  
অমন পাগলের মতো বাজছিল কেন? প্লেনের গর্জনটাই বা মাঝপথে  
অমন থেমে গেল কেন? আর ঐদ্রিলা যেভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল মানুষ  
কি অমনভাবে মাথা ঝাঁকাতে পারে?'

শৌনক কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। বিব্রত অপরাধী মুখে চুপ করে  
দাঁড়িয়ে রইল। কাকিমা মিতির ওপরে ঝুঁকে পড়তে যাচ্ছিলেন, প্রিয়নাথ  
চিৎকার করে ওঁকে বাধা দিলেন : 'খবরদার, এখন ওর কাছে এগোবেন  
না!'

আমি যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, শৌনক আর ঐদ্রিলা মিলে এসব

কারসাজি করেছে? তা হলে টেম্পারেচার এরকম কমে গেল কেমন করে! বেশ শীত করছে...তা ছাড়া কম্পাসের নিউলটাই বা অমন বনবন করে ঘুরছিল কেন?’

শৌনক বলল, ‘টেবিলের শুরুগুলো আমি করেছিলাম। আর কথা ছিল, মিতি বাঙ্গার নাম ধরে কয়েকবার ডাকবে। ও আর কিছু করছে কি না আমি জানি না। ওকে ডাকুন—ও বলতে পারবে।’

ঐদ্বিলার ওপরে ঝুঁকে পড়ে শৌনক ডেকে উঠল, ‘মিতি! মিতি! ওঠ, সবাই খুব ভয় পেয়ে গেছে—।’

চিৎ হয়ে বিচ্ছি ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা ঐদ্বিলা কোনও সাড়া দিল না।

প্রিয়নাথ ওর কবজি ধরে বসেছিলেন। আমাদের ভয় পাওয়া মুখগুলোর দিকে একপলক নজর বুলিয়ে তিনি ভারী গলায় বললেন, ‘ও স্মৃতি উঠবে না। শি ইজ ডেড। আমি এতক্ষণ ধরে ওর পালস ফোজার চেষ্টা করছিলাম। যদি পারো তো কেউ একজন ডাক্তার জৰুরি আনো।’

প্রিয়নাথের কথায় আকুল ঝড় বয়ে গেল প্রায়ে।

শৌনক মিতির নাম ধরে পাগলের মতো ছেড়ে উঠে ওর ওপরে বাঁপিয়ে পড়তে গেল। কাকিমার বুকফাটা কান্না শুরু হয়ে গেল একই সঙ্গে। কিন্তু আবেগের ঝড় বেড়ে প্রস্তাবিতাগেই বাজ পড়ার মতো একটা শব্দ হল, টেলিফোনটাও আগের অন্তুত ঢঙে হঠাতেই বাজতে শুরু করল। মোমবাতির আলোটা একবার কেঁপে উঠেই নিভে গেল। কিন্তু বাল্বের আলোয় আমাদের দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

মিতির মৃতদেহের মুখটা ধীরে-ধীরে হাঁ হয়ে যেতে লাগল। দেখতে-দেখতে ওর টুকুটুকে লাল ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে গোল গর্তের চেহারা নিল। একটা অপার্থিব হাসি শোনা গেল ওর মৃতদেহের ভেতর থেকে। আর তারপরই একটা সবুজ রঙের মুখ দেখা গেল ওর মুখের গহুরে। ওর ঠোঁট চিরে মুখের গর্ত দিয়ে প্রাণপন চাপে ঠেলে বেরিয়ে এল মাথাটা। গোটা মাথায় কেমন এক চকচকে লালা জড়ানো।

মাথাটা মাপে ছোট ফুটবলের মতো। চোখ দুটোঁ টানা-টানা চুলু-চুলু। সারা মুখে অসংখ্য ভাঁজ। আর ঠোঁটের বাঁদিকে একটা কালো জডুল।

মাথাটা নেশাগ্রস্ত চোখে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে আমাদের একবার দেখল। তারপর ফিসফিসে হিমেল স্বরে বলল, ‘বাঙ্গা, এবার যাই।’

প্রিয়নাথ একলাফে ছিটকে চলে গেলেন ওঁর ব্রিফকেসের কাছে। কিন্তু তার বেশি কিছু করে ওঠার আগেই ঐদ্রিলার মৃতদেহ আচমকা চোখ খুলে তাকাল। এবং একটা ‘ফট’ শব্দ করে ঘরের বাল্বটা কেটে গেল।

ঘরের মধ্যে ভয়ার্ট চিৎকারের ঝড় উঠল আবার। আরও দুটো জানলা ‘দড়াম’ করে খুলে গেল। জানলার পাণ্ডাগুলো দেওয়ালে এলোপাতাড়ি বাঢ়ি খেতে লাগল। আর অংসখ্য জোনাকির শ্রোত ঘরে হাউইবাজির মতো পাক খেয়ে মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল।

আমাদের ভীষণ শীত করছিল। ভয়ে আর ঠান্ডায় আমরা সকলে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। অঙ্ককারে নজর চলছিল না। কিন্তু তাই মধ্যে দেখলাম, একরাশ কালো ধোঁয়া ঘরের আঁধার থেকে ঝেঁকে উঠে জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর জোনাকিগুলো এক পৈশাচিক উল্লাসে ঘরের বাতাসে মাতালের মতো নাচছে...নাচছে...নাচছে।

তারই মধ্যে কাকিমার সর্বহারা মর্মাঞ্চিক ক্ষেত্রে আমার কানে আসছিল। আমরা সবাই অসহায়ের মতো অঙ্ককারে দাঁড়িয়ে রইলাম।





## নন্দিনীর রাতের স্মৃতি

মৃ তু নিয়ে কথা হচ্ছিল।

প্রিয়নাথ জোয়ারদারকে কাছে পেলেই কী করে যেন অলৌকিক অপার্থির ঘটনার কথা চলে আসে। প্রিয়নাথের বাড়ি রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে। এ-পাড়ার বেশিরভাগ বাড়িই বেশ পুরোনো। কোনও-কোনও বাড়ি পলেস্তারা খসে-পড়া চেহারার, অথচ দু-মহলা। কোনও বাড়ির দালানে রয়েছে গৃহদেবতার মন্দির, কোনও বাড়ি থেকে কাক-ভোরে শোনা যায় স্তোত্রপাঠ, আবার কোনও বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কলি। এসব বাড়ির আনাচে-কানাচে কার্নিশে গোলাপায়রার রমরমা।

এ-ধরনের পুরোনো পাড়ায় যেমন রোয়াক-কালচার রয়েছে, তেমনই আছে বৈঠকি আজডার আসর। সুপ্রকাশ পালিতের বৈঠকখানায় এরকমই এক নিয়মিত আসর বসে। সঙ্কেবেলার এই আসরে সবৰক্ষ বিষয় নিয়েই চর্চা হয়। কিন্তু প্রিয়নাথ হাজির থাকলেই কেমন এক ঘোরালো-প্যাংচালো পথে আলোচনা শেষ পর্যন্ত ভূত-প্রেত অশরীরী ঝজ্জোকিকে গিয়ে দাঁড়ায়।

আজ সেই সকাল থেকেই আকাশ ছেঁষভাসি। তারপর দুপুরবেলা ধারাপাতের প্রথম পাতার শুরু। যতই সময় গড়িয়েছে বৃষ্টির দুঃখ ততই বেড়েছে। তাই হাঁটুজল ঠেলে সুপ্রকাশ পালিতের বৈঠকখানায় মাত্র চারজন

এসে হাজির হয়েছেন। রাস্তায় জমে থাকা জলের ওপরে খই-ফোটানো ঝমঝাম  
বৃষ্টির শব্দ পরিবেশটাকে একটু যেন অন্যরকম করে দিয়েছিল।

সুপ্রকাশ পালিতের চোখে হাই-প্রাওয়ারের চশমা। বেশ কিছুদিন আগে  
ছানি কাটিয়েছেন। বয়েস যত-না হয়েছে তার তুলনায় মুখে ভাঁজ পড়েছে  
অনেক বেশি। একটু মোটাসোটা জমিদারি চেহারার মানুষ। গাল দুটো ভারী  
হওয়ার মুখের দুপাশে সামান্য ঝুলে পড়েছে। মাথার চুল এখনও পুরোপুরি  
সাদা হয়ে যায়নি। নাকটা বেশ বড়, সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে। নৌচের  
ঠোঁটটা খানিকটা ওলটানো। গায়ের রং মাজা হলেও ঠোঁটের রং অস্বাভাবিকরকম  
গোলাপি।

হঠাৎ সুপ্রকাশ পালিত মন্তব্য করলেন, ‘ভূতনাথকে আজ সরাসরি একটা  
চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেব।’

প্রিয়নাথ সিগারেটের ধোঁয়ায় বুঁদ হয়ে ছিলেন, হেসে ক্লিনেন, ‘কী  
চ্যালেঞ্জ?’

চ্যালেঞ্জ মানে একটা স্ট্রেট কোশেন করব—তাঁর স্ট্রেটকাট জবাব চাই।  
যদি স্পষ্ট জবাব না দিতে পারেন তা হলে ধরে নিবে আপনি হেরে গেছেন।’

বরেন মল্লিক পান চিবোচ্ছিলেন। জড়মোঃ গালায় কৌতুহলী হয়ে বলে  
উঠলেন, ‘কী ব্যাপার! কী ব্যাপার! হাউরেস্টিং মনে হচ্ছে।’

বরেন মল্লিকের লক্ষ্মি আছে। তাই বর্ষা-ভেজা কাদা প্যাচপেচে দিন খুব  
পছন্দ করেন। পানের দারুণ ভক্ত। প্রায়ই বলেন, ‘পান আর বর্ষা আমার  
বড় ভরসা। পান নইলে জীবন বৃথা, আর বর্ষা নইলে লক্ষ্মির ব্যবসা তিলে—  
ক্যাশবাঙ্ক ঠনঠন গোপাল।’

বিজন সরকার এ-পাড়ার শাস্তি কমিটির সেক্রেটারি। পাড়ায় সকলের  
সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন। ছিপছিপে ফরসা চেহারা। পঞ্চাশ ছুঁতে-না-  
ছুঁতেই মাথার চুলে মদ্রসির শুরু হয়ে গেছে। সবসময় হাসিখুশি মেজাজে  
থাকেন। সুপ্রকাশ পালিতের সঙ্গে পাড়ার ব্যাপারেই কী একটা দরকার ছিল  
বলে এই বৃষ্টি মাথায় করেও এসেছেন। তারপর আড়ায় জমে গেছেন।

বিজন সরকার হেসে বললেন, ‘কী ব্যাপার, সুপ্রকাশদা! একেবারে খেপে  
গিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন।’

বৃন্দ জগৎ শ্রীমানী হাতের বিড়িতে ঘন-ঘন টান দিচ্ছিলেন। ভাঙা

ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলে উঠলেন, ‘কী স্ট্রেট কোশেন, সুপ্রকাশ? আমার বউ ফুলশয়ার রাতে ইয়ের সময় যে-কোশেন করেছিল সেরকম নয় তো।’ ফিকফিক করে হেসে উঠলেন জগৎ শ্রীমানী। হাসির দমক থামলে বিড়িতে জুত করে একটা টান দিয়ে মস্তব্য করলেন, ‘অবশ্য প্রিয়নাথবাবুর ভয় বা লজ্জার কিছু নেই। উনি সান্ত্বিক ব্যাচিলার মানুষ। তোমার কোশেন যদি নো-বল বা ওয়াইড বল না হয় তা হলে উনি ঠিক স্ট্রেট ব্যাটে খেলে দেবেন।’

জগৎ শ্রীমানী চেহারায় ছেটখাটো। যথেষ্ট বৃদ্ধ মানুষ। আদিরসের রসিকতার জন্য পাড়ায় বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত। ঈশ্বরভক্ত মানুষ অথচ মজা করে বলেন, ‘ভগবান আমাকে টেনে নেয় নিক, কিন্তু আমার গোবেচারা বউটাকে নিয়ে কেন টানাটানি করছে বলুন তো! ভগবানসাহেবের কি বউ নেই!’

জগৎবাবুর স্ত্রী কয়েকবছর ধরে ক্যাপ্সারে ভুগছেন। ভদ্রাইলা বলতে গেলে মরে গিয়েও বেঁচে রয়েছেন।

প্রিয়নাথ হাতের সিগারেটে একটা জোরালো টাম দিয়ে বললেন, ‘করুণ আপনার কোশেন।’

‘ভূত আছে না নেই?’ গলাখাঁকারি দিয়ে ঘৰ্ষণ পরিষ্কার করে নিয়ে জানতে চাইলেন সুপ্রকাশ।

প্রিয়নাথ হেসে বললেন, ‘কী আর বলব! ভূত আছে ভাবলে যাঁদের সুবিধে হয়, তাঁরা বলেন ভূত আছে। আর, ভূত নেই ভাবলে যাঁদের সুবিধে হয়, তাঁরা বলেন ভূত-টুত কিছু নেই।’

উত্তর শুনেই প্রতিবাদ করে উঠলেন সুপ্রকাশ পালিতঃ ‘এ কেমন উত্তর হল, ভূতনাথ! এ তো এড়িয়ে যাওয়া জবাব হল; আমি ভূতে বিশ্বাস করি। কিন্তু ভূত আছে ভাবলে আমার তো কোনও সুবিধে হয় না।’

প্রিয়নাথ হেরে যাওয়া হাসলেন। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা গুঁজে দিলেন অ্যাশট্রেতে। তারপর খানিকটা ইতস্তত করে বললেন, ‘ঠিক আছে। একটা স্ট্রেটকাট জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছি।’

বরেন মল্লিক, বিজন সরকার আর জগৎ শ্রীমানী চনমনে হয়ে বসলেন।

হঠাতেই বাজ পড়ার শব্দ হল। শব্দের রেশ অনেকক্ষণ ধরে ছুটোছুটি করল মেঘলা আকাশে।

সকলের মুখের ওপরে আলতো করে চোখ বুলিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, ‘আপনারা সকলেই তো একসময় জ্যামিতি পড়েছেন। তাতে বিন্দুর সংজ্ঞা মনে আছে? যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা বেধ নেই, কিন্তু অবস্থিতি আছে—তাকেই বলে বিন্দু! কী অদ্ভুত সংজ্ঞা। ধৈর্য্য, প্রস্থ বা বেধ নেই, অথচ আছে! অর্থাৎ, মাপা যায় না, কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে। এটাই আপনার স্ট্রেট কোশেনের স্ট্রেটকাট জবাব, সুপ্রকাশদা। ভূত হল জ্যামিতির ওই বিন্দুর মতো। বিজ্ঞান দিয়ে মাপা যায় না, অথচ অস্তিত্ব আছে।’

প্রিয়নাথের কথা শুনে সকলেই কেমন চুপচাপ হয়ে গেলেন। বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। ঘরে অদ্ভুত এক অনুভব নেমে এল যেন।

ঘরে আসবাবপত্র বলতে একটা বড়সড় তঙ্গপোশ—সবুজ-কাঞ্জো চেক কাটা চাদরে ঢাকা। আর একটা হাতলওয়ালা বড় চেয়ার। চেয়ারের রং-পালিশ সবই মলিন হয়ে গেছে।

ঘরের এক দেওয়ালে একটা অ্যানসনিয়া পেন্সিল-ঘড়ি। তার পাশেই একটা বড় মাপের পুরোনো ফটোগ্রাফ। ফটোর সঙ্গে বেঁধে অনেকে দাঁড়িয়ে। সময়ের আঁচড়ে ফটোর নানা জায়গায় ক্ষম ধোঁচে, কালো রং বাদামি হয়ে গেছে।

ঘরের ডানদিকে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কার্লকাজ করা একটা প্রাচীন আলমারি। আলমালির পাছ্বা কাচের। মলিন কাচের ওপিঠে কিছু বইপত্র আর টুকিটাকি জিনিস। একেবারে ওপরের তাকে দুটো পেতলের কাপ—কোনওকালে সুপ্রকাশ পালিতের কোনও পূর্বপুরুষ হয়তো প্রাইজ পেয়েছিলেন।

পুরোনো বিড়ি শেষ করে নতুন একটা বিড়ি ধরালেন জগৎ শ্রীমানী। সন্তা লাইটারটা পাঞ্জাবির পকেটে রাখতে-রাখতে মাথা নেড়ে তারিফের সুরে বললেন, ‘বেড়ে বলেছেন, প্রিয়নাথবাবু। ভূত নেই, অথচ আছে। কিংবা আছে, অথচ নেই।’

বরেন মল্লিক পানের পিক ফেলতে দরজার কাছে উঠে গেলেন। ফিরে আসতে আসতে বললেন, ‘এ-বৃষ্টি আরও ঘণ্টাখানেক চলবে।’ তারপর তঙ্গপোশে গুছিয়ে বসে মন্তব্য করলেন, ‘বোঝা গেল ভূত হচ্ছে বর্ডারলাইন কেস।’



ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ

বিজন সরকার মন দিয়ে সকলের কথা শুনছিলেন, আর কিছু একটা বলার জন্য উসখুস করছিলেন। সামান্য ফাঁক পেতেই বেশ সিরিয়াস মুখে প্রিয়নাথকে প্রশ্ন করলেন, ‘আচ্ছা, প্রিয়নাথবাবু, ভূত আর দুঃস্বপ্ন কি একই?’

প্রিয়নাথ ভুরু কুঁচকে বিজন সরকারের দিকে তাকালেন। আলো পড়ে তাঁর টাকের একটা দিক চকচক করছিল।

‘কেন, এ-কথা বলছেন কেন?’ প্রিয়নাথ জিগ্যেস করলেন।

‘যেহেতু দুটো দেখেই আমরা ভয় পাই। আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পাই। যদিও জানি ওগুলো স্বপ্ন, মিথ্যে— তা হলেও আমি ভয়ে কুলকুল করে ঘামতে থাকি। এটা কেন হয়?’

‘কারণ, স্বপ্ন দেখার সময় আমরা স্বপ্নটাকে সত্যি বলে ভাবি। ওটা যে স্বপ্ন, সেটা বুঝতে পারি ঘুম ভেঙে সচেতন হওয়ার পর। তখন ~~ক্ষেত্রে~~ স্বপ্নটা আমাদের মনে থাকে না। অনেকসময় টুকরে টুকরো মনে থাকে। গোটা স্বপ্নটা মনে রাখতে পারে এমন মানুষ ~~নেই~~ কর্ম। কোনও-কোনও স্বপ্ন কোন এক অজানা কারণে মনে থেকে আসে। সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর দেখা একটা স্বপ্ন সাঁহিত্রিশ বছর প্রক্রিয়ে স্পষ্ট মনে রাখতে পেরেছিলেন। এটা খুবই রেয়ার ক্যাপাসিটি এবং ব্যাখ্যা কেউ এখনও দিতে পারেননি। তা ছাড়া, স্বপ্ন যে আমরা ~~ক্ষেত্রে~~ যাই তার ব্যাখ্যাও বেশ জটিল।’

সুপ্রকাশ পালিত বিড়বিড় করে বললেন, ‘ভূতের মতোই...স্বপ্নও বড় রহস্যময় ব্যাপার। মৃত মানুষরা স্বপ্নেও অনেক সময় দেখা দেয়। আমার এক খুড়তুতো ভাই আটাশ বছর আগে বাস চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল। আমি তখন কলকাতার বাইরে ছিলাম। ওকে শেষ-দেখা দেখতে পারিনি। অথচ ওর অ্যাকসিডেন্ট হওয়া ডেডবিড়িটা আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখতে পাই। আমি ওকে খুব ভালোবাসতাম।’

বৃষ্টি হঠাৎ জোরে শুরু হল। বাজ পড়ার শব্দ শোনা গেল আবার।

প্রিয়নাথ চোখ থেকে চশমা খুলে চশমার কাচ দুটো রুমাল দিয়ে মুছতে-মুছতে বললেনন, ‘যদি আপনাদের হাতে সময় থাকে তা হলে একটি মেয়ের অঙ্গুত স্বপ্ন দেখার গল্প আপনাদের শোনাই। মেয়েটি বারবার করে বলেছিল, তার অসুখের কথা আমি যেন কাউকে না বলি। তাই ওর আসল নাম আপনাদের বলছি না। ও আমার কাছে ওর অসুখের ব্যাপারে কনসাল্ট করতে

এসেছিল। আমি ওকে কয়েকটা সাজেশন দিয়েছি। তাতে কিছু-কিছু কাজও হয়েছে’ চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসালেন প্রিয়নাথঃ ‘তবে গল্পটা বলার পর কেউ আমাকে কোনও প্রশ্ন করতে পারবেন না। সুপ্রকাশদা, আপনিও যেন আবার নতুন কোনও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবেন না।’

একটু চুপ করে থেকে প্রিয়নাথ শুরু করলেন তাঁর কাহিনি।  
‘ধরা যাক, মেয়েটির নাম নন্দিনী...।’

ঘরের তেরছা আলোয় নন্দিনীর মুখে ভয়ের ছাপ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ও অসহায় চড়ুইপাখির চোখে ডষ্টর মল্লিকের চোখে তাকিয়ে রইল। অনেক আশা নিয়ে ও ডষ্টর মল্লিকের চেম্বারে এসেছে। মনের ট্রিকিংসার ব্যাপারে ওঁর খুব নাম। অফিসের এক কোলিগের কাছে নন্দিনী ডষ্টর সুনয়ন মল্লিকের খোঁজ পেয়েছে।

ডষ্টর মল্লিকের কপালে অসংখ্য ভাঁজ—ভাঁজের সংখ্যা কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে। গদি আঁটা রিভলভিং চেয়ারে প্রত্যন্ত দিয়ে চোখ ছেট করে তিনি সাতাশ-আটাশের সুন্দরী মেয়েটির দিকে আকালেন। একটা ছেটু ‘হ্ম’ শব্দ করে ভারী গলায় বললেন, ‘কেন্দ্ৰীয় দাগ? আপনি শিওর?’

নন্দিনী আমতা-আমতা করে বলল, ‘আমার তো সেরকমই মনে হয়েছে। আপনি হয়তো দেখলে বলতে পারবেন—।’

ডষ্টর মল্লিক সোজা হয়ে বসলেন। তারপর পেশাদারি সুরে বললেন, ‘এইভাবে বললে ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে ঠিক ক্লিয়ার হচ্ছে না। কেমন যেন এলোমেলো...খাপছাড়া শোনাচ্ছে। আপনি বরং একটু গুছিয়ে বলুন...।’

নন্দিনী চেয়ারে একটু জড়সড় হয়ে বসল। তাঁতের শাড়ির আঁচলটা ডান কাঁধের ওপর দিয়ে টেনে ঠিকঠাক করে নিতে চাইল। তারপর বারকয়েক ঢোক গিলে মিষ্টি গলায় বলল, ‘ঠিক আছে, প্রথম থেকে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি...।’

নন্দিনী প্রায় প্রত্যেক রাতে একটা ভয়ের স্বপ্ন দ্যাখে। স্বপ্নটা সত্যি-সত্যি ভয়ের কি না ও জানে না, তবে স্বপ্নটা দেখে ও ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। একই ভয়ের স্বপ্ন রোজ দেখতে দেখতে ভয়ের মাত্রা ক্রমশ কমে আসা

উচিত, কিন্তু ওর বেলায় সেটা হয়নি। বরং উলটে ওর ভয় বেড়ে গেছে।

‘ডাঙ্গারবাবু, প্রায় এক বছর ধরে আমি একটা স্বপ্ন দেখি—একই স্বপ্ন—  
কিন্তু ওটা দেখলেই আমি ভয়ে পাথর হয়ে যাই—।’

ডক্টর মল্লিক লাইটার জ্বলে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর ঠাট্টার  
মেজাজে বললেন, ‘আপনার মুখ-চোখ দেখছি শুকিয়ে গেছে। স্বপ্নটা আমাকে  
বলতে গেলেও কি আপনার ভয় করবে না কি! নিন, চটপট শুরু করুন...।’

সন্টলেকের আট নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে একটা ছোট বাড়িতে আমরা থাকি।  
আমরা মানে, আমি আর আমার মা। মায়ের অনেক বয়েস হয়েছে...নানান  
রোগে একেবারে শয্যাশয়ী। আমার বাবা মারা গেছেন প্রায় আট বছর আগে।  
মোটরবাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। তারপর থেকে  
ওই বাড়িতে শুধু আমরা দুজন। আমি একটা প্রাইভেট ফার্মে স্টেনোগ্রাফারের  
চাকরি করি। সেই সময়টা একজন আয়া মায়ের দেখাশোনা করে মায়ের  
ঘর দোতলায়, আর আমারটা একতলায়। বাড়ি পাহাড়ে দেওয়ার জন্যে  
এরকমভাবে শুতে হয়। তবে মায়ের ঘর থেকে আমার ঘরে কলিংবেলের  
ব্যবস্থা আছে—যদি কোনওরকম ইমার্জেন্সি হয়, তাহলে মা রাতে ঘুমের ওশুধ  
থেয়ে ঘুমোন। ফলে রাতে কখনও জাগেন না। এতে আমিও বেশ নিশ্চিন্ত  
হয়ে ঘুমোতে পারি।

‘রাতে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিমে শুতে-শুতে আমার প্রায় এগোরোটা  
মতন হয়। তারপর একটু গল্পের বই-টই পড়ি। মোটামুটি আধঘণ্টা বই-  
ম্যাগাজিন পড়ার পর ঘুম। আর ঘুমোলে পরই আমি স্বপ্নটা দেখতে শুরু  
করি।’

কথা বলতে-বলতে নলিনীর গলার স্বর কেমন যেন ফিসফিসে হয়ে  
যাচ্ছিল। ওর ফরসা মুখে বিনবিন করে ঘাম ফুটে উঠল।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ডক্টর মল্লিকের ভীষণ মায়া হচ্ছিল। সিগারেটে  
তৃপ্তির টান দিয়ে তিনি মমতা মাখানো গলায় নলিনীকে তাড়া দিলেন :  
‘থামলেন কেন, বলুন—।’

‘হ্যাঁ, বলছি—।’ একবার দেক গিলে আবার বলতে শুরু করল নলিনী,  
‘আমার ঘরের একপাশে দেওয়াল যেঁষে একটা কাঠের পাঁচা আছে। খুব  
দুষ্পাপ্য কোনও কিউরিয়ো নয়—নেহাতই সাধারণ জিনিস। অনেক আগে  
রাজস্থানে বেড়াতে গিয়ে বাপি—মানে, আবার বাবা—ঘর সাজানোর জন্যে

ওটা নিয়ে এসেছিলেন। আমার স্বপ্নটা শুরু হয় ওই প্যাংচাটা দিয়ে—তবে ওটা তখন আর কাঠের প্যাংচা থাকে না।

‘স্বপ্নের মধ্যে হঠাতে আমি দেখতে পাই ওই প্যাংচাটা সবুজ রঙের বরফের চোখে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। অঙ্ককারে দেখতে না পেলেও ওর ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পাই আমি। কখনও-কখনও ওটা মুখ ঘুরিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকায়। তারপর আবার রঞ্জ-হিম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

‘তখন আমার ভীষণ শীত করতে থাকে। ঠান্ডায় শরীরে কঁটা দেয়, বুকের ভেতরটা আকুল হয়ে কাঁপতে থাকে। আর সেই সময়েই শুরু হয়ে যায় শিসের শব্দ। সুরেলা শিস দিয়ে কেউ যেন আমাকে ডাকছে—অনেকটা নিশির ডাকের মতো।

‘আমার বিছানার মাথায় দিকে একটা জানলা আছে। তবে বাইরোমাসই ওটা আমি বন্ধ করে শুই। কিন্তু স্বপ্নের ভেতরে আমি স্মৃষ্টি দেখতে পাই, ওটা কে যেন খুলে দিয়েছে, আর খোলা জানলা দিয়ে হিম-বাতাস কুলকুল করে চুকে পড়ছে ঘরে।

‘ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, আমার খাটের নীচে কেউ যেন লুকিয়ে রয়েছে। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই স্মৃজোকিক এক ক্ষমতায় ব্যাপারটা আমি টের পেলাম। আর একইসঙ্গে একটা দুর্গন্ধের ঢেউ আমার নাকে এসে ঝাপটা মারল। সাগরে যখন ঘূর্ণিঘড় ওঠে তখন কখনও-কখনও জলস্তুত তৈরি হয়ে যায়। সেই জলস্তুত যখন সাগরের বুকে আছড়ে পড়ে তখন তার ঝাপটায় অনেক সময় বড়সড় জাহাজও তলিয়ে যায়। এই দুর্গন্ধের ঝাপটা যেন তার চেয়েও কিছু বেশি। আমি একেবারে তলিয়ে গেলাম। আমার ঘ্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা পলকে অসাড় হয়ে গেল।

‘বিছানা থেকে না-নেমেই আমি বিছানার চারপাশটা দেখতে পেলাম...’

নদিনী দম নেওয়ার জন্য একটু থামল। খসখসে গলায় বলল, ‘একটু...একটু জল দেবেন?’

ডক্টর মল্লিকের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে তিনি টেবিলে রাখা একটা জলের জাগ এগিয়ে দিলেন নদিনীর দিকে। ঢকঢক করে জল খেল নদিনী। কয়েকটা বড়-বড় শ্বাস নিল। তারপর আবার শুরু করল ওর স্বপ্নের গল্প।

‘...দেখলাম, আমার বিছানার চাদরটা নাটকের ড্রপসিনের মতো মেঝের দিকে অনেকটা করে ঝুলে রয়েছে। আর কোন এক অলৌকিক হাওয়ায় চাদরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। চাদরের পেছনে কিছু একটা নড়ছিল। এ-ও বুবতে পারছিলাম, দুর্গন্ধের দমকা টেউটা বিছানার নীচ থেকেই বেরিয়ে আসছে। তা হলে কি দুর্গন্ধ ছড়ানো কোনও প্রাণী ওখানে লুকিয়ে থেকে আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে! তখনই দেখলাম, চাদরের গায়ে রক্তের দাগ!

‘বিছানায় শুয়ে-শুয়েই আমি সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম, টের পাচ্ছিলাম। আর ভয়ে সিঁটিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিলাম। ওই শিসের শব্দ, পঁঁচার ডানা ঝাপটানি, আর ওই গন্ধ আমাকে ধীরে ধীরে পালটে দিচ্ছিল। তার ওপর ওই রক্তের দাগ...।

‘হঠাতেই খেয়াল করলাম, আমার সারা গা লোমশ হয়ে উঠছে, দাঁতগুলো ঠোটের আড়ালে আর থাকতে চাইছে না। একইসঙ্গে আমার হাতজ্বার পায়ের নখ কালচে লম্বা হয়ে বেড়ে উঠল। আর আমি পাগলের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে বিছানাটাকে দাঁতে নথে চিরে ফালাফালা করে ছিমিঞ্চি করে দিলাম।

‘অন্ধকারেই আমি সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। একটু দূরে রাখা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে হঠাতেই নজর পড়েছিল আমার। দেখি, সেখানে আমার মুখের ছায়া পড়েছে। কিন্তু এ কার মুখ! সারাটা মুখ ওই পঁচাটার চোখের মতো গাঢ় সবুজ, দুটো দুটো বসা, চোখের জায়গায় দুটো অন্ধকার গর্ত। ঠিক তখনই একটা হিংস্র গর্জন শুনতে পেয়েছিলাম আমি। তারপর আর ভালো করে কিছু মনে নেই...।’

স্বপ্ন শেষ করে নন্দিনী থামল। ছোট রুমাল মুখে বুলিয়ে ঘাম মুছে নিতে চাইল।

ডক্টর মল্লিক কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর মাথায় আলতো করে হাত চালিয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘স্বপ্নটা দেখে আপনার খুব ভয় করে নিশ্চয়ই? নন্দিনী শুকনো গলায় বলল, ‘হ্যাঁ—।’

‘স্বপ্নের ঠিক কোন জায়গাটা আপনার কাছে সবচেয়ে ভয়ের বলে মনে হয়?’

একটু ইতস্তত করে নন্দিনী বলল, ‘বলব? শুনলে আপনি হাসবেন না তো!’

‘আরে না, না—আপনি নির্ভয়ে বলুন। আই অ্যাম ড্যাম সিরিয়াস।’

‘স্বপ্নের কোনও বিশেষ জায়গা নয়—গোটা স্বপ্নটাই আমার কাছে ভীষণ জীবন্ত আর সত্যি বলে মনে হয়—এটাই সবচেয়ে ভয়ের, ডাক্তারবাবু।’

ডক্টর মল্লিক হঠাৎই হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসির দমকে তাঁর ভারী শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, ‘মিস রয়, আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই। স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না। আমরা স্বপ্ন দেখি আমাদের নানা ধরনের অবসেশন থেকে, মনের চাহিদা থেকে। অনেক সময় ছোটবেলার কোনও ঘটনার জন্যে অপরাধবোধ বহু বছর পর্যন্ত স্বপ্নের ভেতরে তাড়া করে ফিরে বেড়ায়।’ ডক্টর মল্লিকের কপালে ভাঁজ পড়ল। গলার স্বর নামিয়ে তিনি জিগেস করলেন, ‘ছোটবেলায় আপনার সঙ্গে কোনও বাজে ব্যাপার হয়েছিল?’

‘বাজে ব্যাপার মানে?’ নদিনীর মুখে সরল বিশ্বায় ফুটে উঠল।

‘মানে, ইয়ে, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেটের কোনও ব্যাপার...’

‘না-না, সেরকম কিছু হয়নি।’

‘তা হলে আপনার চিন্তার কিস্যু নেই। হয়তো কেন্দ্র আজগুবি ভয়ের গল্প পড়ে আপনার স্বপ্নে তার ছায়া পড়েছে। আপনি স্বপ্নটাকে কোনও গুরুত্ব দেবেন না। দেখবেন, ধীরে ধীরে আপনার স্বপ্নটা ঝাপসা হয়ে এসেছে।’

ডক্টর মল্লিকের আশ্বাসে নদিনী বোধহৃতে মেন ভরসা পেল না। আমতা-আমতা করে বলল, ‘আমি গল্পের ঝুঁপড়ি বটে, তবে এই স্বপ্নটার মতো ঘটনা কোনও বইয়ে পড়িনি। আমার স্বপ্নটা ভীষণ জীবন্ত, আর সত্যি...।’

‘ওটা আপনার কল্পনা, মিস রয়। স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না—স্বপ্ন স্বপ্নই। আমরা যখন জেগে থাকি তখন নানান ঘটনায় অংশ নিই—তারই ছাপ কখনও-কখনও স্বপ্নে দেখা যায়। তার বেশি কিছু নয়। আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যান। টিভি-তে একটু সিনেমা-চিনেমা দেখুন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আজড়া মারুন, প্রেম করুন, মায়ের সঙ্গে গল্প করুন—লিড আ নরমাল লাইফ। তা হলেই দেখবেন সব প্রবলেম সল্ভ হয়ে গেছে। আমার কাছে আর আসতে হবে না। আপনি আমাকে ওয়ান ফিফ্টি দেবেন।’

ডক্টর মল্লিক একটানা সুরে এমনভাবে শেষ কথাটা বললেন যে, নদিনী প্রথমটা বুঝতে পারেনি উনি ভিজিটের কথা বলছেন। তারপরই মাথা নীচু করে ব্যস্তসমস্তভাবে ব্যাগ হাতড়ে ভিজিটের টাকাটা বের করল, ডক্টর মল্লিকের হাতে দিল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নন্দিনী, আলতো সুরে বলল, ‘আপনি বলছেন, সত্যিকারের সব ঘটনার ছায়া স্বপ্নে দেখা যায়। এর উলটোটা কি হয় না? মানে, স্বপ্নের ব্যাপারটা কি সত্যি হতে পারে না? বিশ্বাস করুন, আমার স্বপ্নটা এত জীবন্ত...।’

‘ডেন্ট টক রাবিশ, মিস রয়।’ নন্দিনীকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ডষ্টের মল্লিক, ‘সবকিছুর একটা লিমিট থাকা দরকার। বললাম তো, আপনি নিশ্চিন্তে বাঢ়ি যান—।’

নন্দিনী হাসল—কেমন যেন অস্বাভাবিক হাসি। তারপর মিষ্টি করে বলল, ‘আপনি বিশ্বাস করছেন না তো! আমার স্বপ্নটা তা হলে আপনাকে দেখাই...।’

সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ ঘরের ভেতরে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

নন্দিনীর চোখে এক অলৌকিক আলো জ্বলে উঠল। ঘরের আলো স্থিমিত হয়ে গিয়ে সন্ধ্যার আঁধার নেমে এল। একইসঙ্গে ঘরের উপত্যকা<sup>ক্রমতে</sup>-কর্মতে বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছে গেল। বিচি এক হিম-বাতসা<sup>ঘরের</sup> ভেতরে পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। শুরু হয়ে গেল<sup>অর</sup> সুরেলা শিসের শব্দ।

হঠাৎই একটা বিকট দুর্গম্ভোর ঢেউ ডষ্টের মল্লিকের চেতনা অসাড় করে দিল। একটা অদৃশ্য পাখির ডানা ঝাপটাম্বোর শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। আর অন্ধকারেই স্পষ্ট দেখতে পেলেন<sup>সুন্দরী</sup> মেয়েটির কমনীয় হাত দুটো লোমশ হয়ে উঠছে, হাত আর পায়ের নখ মাপে বড় হয়ে বঁড়শির মতো বেঁকে গেছে, গাল দুটো বসে গিয়ে বীভৎস দেখাচ্ছে, চোখের জায়গায় দুটো কালো গর্ত—আর তারই মাঝে দুটো সবুজ আলোর বিন্দু।

নন্দিনীর মুখের রং ক্রমেই গাঢ় সবুজ হয়ে উঠছে, দাঁতের দিকে ভয়ে তাকানো যাচ্ছে না।

ডষ্টের সুনয়ন মল্লিক আতঙ্কে কুঁকড়ে গেলেন, তাঁর গায়ে কাঁটা দিল। বুঝতে পারলেন, তিনি শেষের খুব কাছে পৌঁছে গেছেন।

ভয়ংকর কর্কশ পুরুষালি গলায় নন্দিনী বলে উঠল, ‘এবার আমার স্বপ্নটা বিশ্বাস হল তো।’





## ଅଲକ୍ଷଣେର ଗଣ୍ଡି

ଲ୍ଲ କ୍ଷମଣେର ଗଣ୍ଡିର କଥା ତୋ ଆପନାରା ସବାଇ ଜାନେନ । ଓହି ଗଣ୍ଡିର ବାହିରେଇ ଓତ ପେତେ ଛିଲ ଯତ ବିପଦ । କିନ୍ତୁ ଆମି ଏଥିନ ଆପନାଦେର ଶୋନାତେ ବସେଛି ଅଲକ୍ଷଣେର ଗଣ୍ଡିର କଥା—ଯେ-ଗଣ୍ଡିର ଭେତରେ ଅଜାନା ଏକ ବିପଦ ପ୍ରାୟ ଏକଶୋ ବଚର ଧରେ ଅଷ୍ଟପଦିତର ଓତ ପେତେ ରଯେଛେ ।

ଘଟନାଟା ଆମାକେ ଶୁଣିଯେଛିଲ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚାନବାହି ବଚରେର ବୃଦ୍ଧ ଏକଜନ ଖାସିଆ ଉପଜାତିର ମାନୁଷ । ଓର ନାମ ଛିଲ ପହେଲା । ଜାଟିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମେ ଓ ଜନ୍ମ ଥେକେଇ ଆଛେ ।

ଅସମେର ନର୍ଥ କାହାଡ଼ ହିଲ୍ସ ଜେଲାର ଏକଟି ଗ୍ରାମ ଜାଟିଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମଟିର ଭୋଗୋଲିକ ଅବସ୍ଥାନ  $25^{\circ}12'N$   $93^{\circ}E$  । ତାର ଅଧିବାସୀ ଖାସିଆ ଉପଜାତିର ମାତ୍ର ହାଜାରଦେଡକ ମାନୁଷ ।

୧୯୦୫ ମାଲେ ହାଫଲଙ୍କ ନଗରେର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବେ ପ୍ରାଯିନ୍ଦିଶ କିଲୋମିଟାର ଦୂରତ୍ଵେ ଜାଟିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମେର ପତନ ହେଁଛିଲ । ଜାୟଗାଟିର ‘ଅଭିଶପ୍ତ’ ବଲେ ବଦନାମ ଛିଲ । ଇଟ୍, ଲାଖୋନବଙ୍ଗ ସୁଚ୍ୟାଙ୍ଗ ନାମେର ଏକଜନ ଖାସିଆ ସେଖାନକାର ଆଦି ଆଦିବାସୀ ଜେମି ନାଗାଦେର କାହିଁ ଥେକେ ନାମମୁଣ୍ଡ ଦାମେ ‘ଅଭିଶପ୍ତ’ ଗ୍ରାମଟିକେ କିନେ ନେନ । ତଥନ ପହେଲାର ବୟେସ ଛିଲ ମାତ୍ର ତିନ ବଚର ।

ତାର ଟିନେର ଚାଲେର ବାଡ଼ିର ଦୀଓଯାଯ ବସେ ନେଶାଗ୍ରହ୍ଣ ପହେଲା ଆମାକେ

এক অদ্ভুত কাহিনি শুনিয়েছিল। সন্দেহ নেই, প্রথমে কাহিনিটি আমার কাছে আপাদমস্তক আজগুবি বলে মনে হয়েছিল। তা ছাড়া পূর্ণিমার চাঁদের আলো, ঠাণ্ডা বাতাস, আর পহেলার জরাজীর্ণ আঁকিবুকি-কাটা মুখ সবকিছুর ওপরে একটা অলৌকিক মাত্রা চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু গল্লের শেষে এমন প্রমাণ পহেলা দাখিল করেছিল যে, আমি আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলাম—ওর কথা সেই মুহূর্তেই আগাগোড়া বিশ্বাস করেছিলাম আমি। খুব সাধ জেগেছিল, পহেলার বর্ণনা মতো অলঙ্কণের গশ্শি-বেরা জায়গাটা একবার দেখে আসব। কিন্তু একটা পরিচয়হীন ভয় আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরেছিল। বুকের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠেছিল, যেয়ো না—তা হলে আর কোনওদিনই তুমি ফিরতে পারবে না।

পহেলাও সে-কথা বলেছিল—ওই অলঙ্কুণে জায়গা কেউ কখনও ফিরে আসেনি। শুধু পহেলা নেহাতই ভাষ্যের জোরে ফিরে এসেছিল—ভয়ংকর এক প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে।

ও জগাখিচুড়ি ভাষায় জড়ানো গলায় যে শব্দ সেদিন শুনিয়েছিল সেটাই সহজ করে আপনাদের বলছি। তবে আগেই বলে রাখছি, এ-কাহিনি যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন তা হলে আমি অস্তত কোনও অভিযোগ করব না।

পহেলা আমাকে বলেছিল...।

স্যার, আপনাকে তো আগেই বলেছি, জাটিঙ্গার পাহাড়ে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়ানোটা আমার নেশা। সেই কোন যুগে জার্মানির একটা দোনলা শটগান বাবার কাছ থেকে হাতে পেয়েছিলাম। সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে আমি সবসময় শিকারে বেরোতাম।

জাটিঙ্গার জঙ্গলে বেশিরভাগই মুলি বাঁশের ঝাড় আর বেতগাছের রমরমা। আপনি খেয়াল করেছেন কি না জানি না, আমাদের গ্রাম থেকে হাফলঙ্গের দিকে দু-কিলোমিটার এগোলে ডানদিকের খাদে খুব ঘন জঙ্গল দেখতে পাবেন। ওই জঙ্গলে কেউ যায় না। মানে, আমি যাওয়ার

পর থেকে আর কেউ যায়নি। আমার আগে ডাকাবুকো খাসিয়া যুবকরা কেউ কেউ হয়তো গিয়ে থাকবে, কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি। আমিই একমাত্র মানুষ, যে ফিরে এসে আর সবাইকে সাবধান করে দিয়েছি। জানিয়ে দিয়েছি, ওখানে গেলে কী হতে পারে।

পিচের রাস্তা থেকে যদি আপনি ঢাল বেয়ে নামেন তা হলে, স্যার, দেখতে পাবেন ওখনে একটা ‘নো এন্ট্রি’ বোর্ড লাগানো রয়েছে। আর লেখার নীচে একটা মড়ার খুলি অঁকা আছে। তবে এসব করা হয়েছে অনেক পরে।

আপনি তো জানেন, আমাদের চাষবাস বলতে ‘জুম’-এ গিয়ে আদা, লঙ্কা, কমলালেবু, আনারস, এসবের চাষ। জঙ্গলের সরু পথ দিয়ে চাষের জমিতে যাতায়াতের পথে অনেক সময় দাঁতালো শুয়োরের মুখে মুখে হতে হয়। তখন চার্লস ডেলি মডেলের শটগানটা আমার কাজে লাগে। একদিন সঙ্গের মুখে ‘জুম’ থেকে ফেরার সময় এক প্রকাণ্ড মাপের দাঁতালো শুয়োরের মুখে মুখি হলাম। দু-দুটো গুলি ছুড়লাম বটে, কিন্তু ওটাকে সেরকমভাবে ঘায়েল করতে পারলাম না। তখন আমি শূন্য শটগান হাতে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে উর্ধ্বশাস্ত্রে প্রেরিতে শুরু করলাম। কিন্তু ওই ঘন জঙ্গলের মধ্যে সেভাবে দৌড়েনো অসম্ভব। আমি কোনওরকমে ঝোপঝাড় ঠেলে পথ তৈরি করে এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ডালপালা-পাতার আওয়াজ ছাপিয়ে আহত শুয়োরটার গজরানি বেশ কানে আসছিল।

অন্ধকারেই ক্রমেই গাঢ় হচ্ছিল। বুরতে পারছিলাম, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল।

শটগানের নল দিয়ে ঝোপঝাড় সরিয়ে আমি এগোচ্ছিলাম, হঠাৎই একটা গুঞ্জনের শব্দ আমার কানে এল। সঙ্গে হলে জাটিঙ্গাতে বিঁবির ডাকে কানে তালা লেগে যায়। কিন্তু এটা সেই শব্দ নয়—তার চেয়ে আলাদা। বিঁবির ডাক থাকা সত্ত্বেও ওই মিহি গুঞ্জনের শব্দটা আলাদা করে বেশ কানে আসছিল।

দাঁতালো শুয়োরটা বোধহয় একগুঁয়েভাবে বনবাদাড় ভেদ কর ছুটছিল। কারণ আমি গাছপালার এলোপাতাড়ি নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম,

আর শুনতে পাচ্ছিলাম আহত প্রাণীটার গর্জন।

বলতে গেলে আচ্ছন্নের মতোই আমি সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎই দেখি খানিকটা ফাঁকা জায়গা—অনেকটা মাঠের মতো। কুয়াশা-মাখা ঘোলাটে আবছা অঙ্ককারে স্পষ্টভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে ছোট-ছোট কিছু ঝোপঝাড় ছাড়া জায়গাটা অস্বাভাবিকরকম ফাঁকা। যেন কেউ মালি লাগিয়ে জায়গাটা সাফ করিয়েছে।

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ওঞ্জনটা এখন তীব্রভাবে শোনা যাচ্ছিল। যেন কোনও বদরাগী ভিমরূল আমাকে লক্ষ্য করে তিরের মতো ছুটে আসছে—আর তার ডানার শব্দ এসে আমার কানে বিধিষ্ঠে। একইসঙ্গে একটা অচেনা কটু গন্ধ আমার নাকে এসে ধাক্কা মারল।

এমন সময় কোনও ছুটন্ত প্রাণীর শব্দ শুনতে পেলাম।

চমকে মুখ ফিরিয়েই দেখি গাঢ় কালো আঁধারের মতো শুয়োরটা ঝোপঝাড় ঠেলে ছিটকে চুকে পড়েছে সেই ফাঁকা জায়গায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গেল সেই অন্তুত ঘটনা।

শুয়োরটা ফাঁকা জায়গাটায় ঢোকামাত্রে গোড়া কাটা কলাগাছের মতো কাত হয়ে খসে পড়ল মাটিতে। আর কোনও নড়াচড়া করল না, কোনওরকম চিৎকার করল না।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। টের পেলাম, আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। একটু আগে উঁকি মারা ভয়টা একলাফে আমাকে একেবারে জাপটে ধরল। হঠাৎই আমার শরীরের ভেতরটা ঠান্ডা হয়ে গেল। ধীরে-ধীরে সেই ঠান্ডা স্নেত পা বেয়ে নামতে লাগল মাটিতে।

আমি হয়তো পড়ে যাওয়া শুয়োরটার কাছে এগিয়ে যেতাম, যদি-না সেই মুহূর্তে আরও একটা অন্তুত ব্যাপার দেখতে পেতাম।

জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন একটা রাতপাখি ডেকে উঠেছিল। সেই ডাকে চমকে উঠে মুখ তুলতেই দুটো বাদুড় আমার চোখে পড়ল। সীসের মতো আকাশের পটভূমিতে ওদের দেখতে পেলাম আমি। অঙ্ককারে আরও অঙ্ককার ডানা মেলে দিয়ে ওরা নিঃশব্দে নিপুণ ছন্দে ভেসে চলেছে।



महाराष्ट्रकर

উড়তে-উড়তে ফাঁকা জায়গাটার ওপরে আসামাত্রই বাদুড় দুটো গাছ-পাকা ফলের মতো টুপ করে খসে পড়ে গেল নীচে। ওদের দেহ দুটো আছড়ে পড়ার ভোঁতা শব্দ হল। আর সেই মুহূর্তে আমার চিঞ্চাভাবনাও যেন অবশ হয়ে গেল।

অঙ্ককার মাঠ থেকে আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছিল না—শুধু সেই গুঞ্জনের শব্দটা ছাড়া।

আমি ক্লান্ত দেহে জঙ্গলের গাছ-পাতার মধ্যেই বসে পড়লাম। অঙ্ককার আরও গাঢ় হয়ে উঠায় আমার চোখের সামনে থেকে সবকিছু মুছে যাচ্ছিল। সামনের ফাঁকা জমিটা ঘিরে একটা মারাত্মক ভয় আমাকে আঁকড়ে ধরল। গাঁয়ের নানা লোকের নানা কথা আমার মনে পড়ল। এটাই তা হলে সেই অভিশপ্ত জায়গা! এটার সঠিক পরিচয় একেন্দ্র জানত না বলে এটাকে সবাই জঙ্গল বলে ভেবেছে। যারা এই ‘অভিশপ্ত জায়গাটা চোখে দেখেছে তারা কেউ ফিরে যায়নি—ফিরতে পারেনি। তাই ‘অভিশপ্ত জঙ্গল’ হিসেবেই গড়ে উঠেছে জাটিঙ্গার কিংবদন্তী।

আমার হাতে অন্ত বলতে একটা খালি বাইফেল। আর সারা শরীর পাকে-পাকে জড়িয়ে এক অজানা ভয়সব মিলিয়ে নড়াচড়ার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না। তাই কাছেকাছি একটা বড় গাছ খুঁজে নিয়ে তাতে চড়ে বসলাম। অঙ্ককারে বোধহয় পিঁপড়ের বাসায় হাত দিয়ে ফেলেছিলাম। কারণ হঠাতেই হাতে-পায়ে জুলা-ধরানো কামড় টের পেলাম।

কোনওরকমে গাছে উঠে হাত-পা ঘষে পিঁপড়েগুলো ছাড়লাম। ঝিঁঝিপোকার ডাকে কানে যেন তালা লেগে যাচ্ছিল। তারই মধ্যে আলাদাভাবে মিহি গুঞ্জনটা শোনা যাচ্ছিল। গাছের ওপর থেকে ফাঁকা জায়গাটা চাঁদের আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। একইসঙ্গে লক্ষ করলাম, দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে—অর্থাৎ, মাউন্ট হেমিপয়ের দিক থেকে তরল কুয়াশার স্নেত সাপের মতো ধীরে ধীরে এঁকেবেঁকে নেমে আসছে জাটিঙ্গার খাদের দিকে। একটু পরেই হয়তো দুধের মতো সাদা কুয়াশা সামনের ফাঁকা জায়গাটাকে একেবারে ঢেকে ফেলবে।

থিদেয় শরীর আনচান করলেও কোনও উপায় ছিল না। আমি হতভাগ্য শুয়োরটা আর বাদুড় দুটোর কথা ভাবছিলাম। ওই জায়গাটায় কী এমন অভিশাপ আছে যে, কোনও প্রাণী সেখানে চুকলেই সঙ্গে-সঙ্গে মারা যায়! আমি যদি ওখানে যাই তা হলে আমারও কি একই দশা হবে!

মনে-মনে ঠিক করলাম, যদি এখান থেকে বেঁচে ফিরি তা হলে সবার আগে গাঁয়ের হেডম্যানকে ব্যাপারটা জানাব। সে-ই গাঁয়ের লোককে সতর্ক করার ব্যবস্থা করবে।

রোববার ছাড়া প্রতিদিন সঙ্গেবেলা জাটিঙ্গার গির্জায় গাঁয়ের লোকেরা উপাসনায় যোগ দিতে আসে। হেডম্যান যদি বুদ্ধি করে উপাসনার পর চার্চ থেকেই এই বিপদের কথা ঘোষণা করে দেয় তা হলে সবচেয়ে ভালো হয়। খবরটা ছোট গ্রামে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে।

কুয়াশা ক্রমশ চারপাশে ঢেকে ফেলছিল। ফলে ঝঁঝের আলো কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে সমানভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ঠিক যেন ঘষা কাচ দিয়ে কেউ টাঁদকে আড়াল করে দিয়েছে।

এরই মধ্যে ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হচ্ছে। জাটিঙ্গায় এরকম বৃষ্টি প্রায়ই হয়। যেমন হঠাৎ করে তার শুরু তেমনই হঠাৎ করে তার শেষ।

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বারে পড়া জলে আমি ভিজতে লাগলাম। ঠান্ডায় শরীরটা কুঁকড়ে যেতে চাইছিল। অসহায়ভাবে আমি দিনের আলোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আর মাঝে-মাঝে ওই ভয়ঙ্কর জায়গাটার দিকে নজর চলে যাচ্ছিল।

নিজের অজান্তেই কখন যেন সামান্য তন্দ্রা মতন এসে গিয়েছিল। হঠাৎই কী একটা শব্দে আমার ঘোর কেটে গেল। চমকে সজাগ হয়ে দেখি, ঝিরঝিরি বৃষ্টি তখনও পড়ছে। তবে কুয়াশা অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। সামনের ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

একটা অদ্ভুত গোলাপি আভা সামনের খোলা জমিটা থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে। আর মিহি গুঞ্জনটা কেমন যেন বিচ্ছি সুরে ওঠা-নামা করছে।

এরকম আলো আমি কখনও দেখিনি। এরকম মায়া-জড়ানো সুরও কখনও শুনিনি আমি। আমার ঘুম পেয়ে গেল—না, স্বাভাবিক কোনও ঘুম নয়, নেশায় পাওয়া ঘুম। ক্লাস্টি আর অবসাদে শরীর ছেয়ে গেল, চোখ জড়িয়ে গেল অলৌকিক কোনও টানে। প্রাণপনে গাছের ডাল অঁকড়ে ধরে আমি সম্মোহিতের মতো সামনের ফাঁকা জায়গাটার দিকে চেয়ে রইলাম।

গোলাপি আভা ক্রমেই তীব্র হচ্ছিল। আর তখনই নজরে পড়ল, তার মধ্যে কতকগুলো অদ্ভুত কালো ছায়া চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

ছায়াগুলোর অবয়ব যেন ‘নিরাকার’—ওদের নির্দিষ্ট কোনও আকার ছিল না। অথচ ওরা গোলাপি কুয়াশার মধ্যে অনায়াস দ্রুতগতিতে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাতে আমার শীত-শীত ভাবটা কমতে লাগল। আর তাক একটু পরেই বেশ গরম ভাব টের পেলাম। যেন সময় ভুল করে গ্রীষ্মকাল আবার ফিরে এসেছে।

পরিবেশের উষ্ণতা বাড়তে-বাড়তে অস্তিত্ব মাত্রায় পৌঁছে গেল। অলৌকিক এক তাপে আমার মুখ-চোখ-মেন পুড়ে যেতে চাইল। আমার মাথাটা কেমন টলে উঠল। চারপাশের গাছপালা দুলে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। আমার হাত থেকে বন্দুকটা খসে পড়ে গেল নীচে।

কোনওরকমে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, একটা দুর্তিময় গোলাপি বল কুয়াশার ভেতর দিয়ে ধীরে-ধীরে উড়ে চলেছে শূন্যে। কী অদ্ভুত মাতাল করা আভিজ্ঞাত্যে ভরা তার মসৃণ গতি!

আর আমার কিছু মনে নেই, কারণ তখন আমি জ্ঞান হারিয়ে গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম নীচে।

কাক-ভোরে আমার ঘুম ভাঙল—যদিও, স্যার, এখানে কাক, শালিক, বা চড়ুই দেখতে পাওয়া যায় না। হাফলঙ্গে ঘে-দু-একটা কাকের দেখা মেলে সেগুলো দাঁড়কাক।

ঘুম ভেঙে যা দেখলাম সে বোধহয় রাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

জল-কাদা মাথা শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমি টলতে-টলতে ফাঁকা

জমিটার কিনারে গিয়ে দাঁড়ালাম। জমির এলাকায় হয়তো চুকেই পড়তাম, যদি না সেই মুহূর্তে দুটো প্রকাণ বড় মাপের প্রজাপতি জমির এলাকায় চুকেই টুপ করে খসে পড়ত।

হেলে থাকা একটা সরু বাঁশগাছ ধরে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গতকাল সঙ্গের আবছা আলোয় যা-যা চোখে পড়েনি এখন সেগুলো স্পষ্টভাবে চোখ পড়ল।

মিহি গুঞ্জনের শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। এবড়োখেবড়ো ফাঁকা জমিটায় যেসব আগাছা গজিয়েছিল সেগুলো সব পুড়ে কালো হয়ে গেছে। নানা ধরনের কক্ষালে জায়গাটা ভরতি। জমিটার ডানদিক ঘেঁষে একটা লম্বা ফাটল। সেই ফাটল দিয়ে সাদা ধোঁয়ার রেখা সাপের মতো এঁকেবেঁকে বেরিয়ে আসছে। জমিটার বাঁদিকে একটা বড় মাপের পোড়া গাছ। তার একটা পোড়া ডাল থেকে একটা নাম-না-জনা পাখির কক্ষাল ঝুলছে।

সবকিছু দেখে আমার গা গুলিয়ে উঠল। ক্ষম্বলী রাতের কটু গন্ধটা বেশ কয়েক গুণ হয়ে যেন একেবারে মন্তিষ্ঠ গিয়ে ধাক্কা মারল। এ আমি কোন অলৌকিক শাশানের ক্ষেত্রাতে এসে দাঁড়িয়েছি! কোন অলৌকিক প্রক্রিয়ায় এখানে দিনের ক্ষম্বল দিন ধরে শুধু হাড় জমা হয়েছে! কোথায় গেল কাল রাতের শুয়োরটা আর বাদুড় দুটোর দেহ? ওগুলো কি মুহূর্তে কক্ষালের চেহারা নিয়েছে? কোথাও উড়ে গেল ওই গোলাপি গোলক? অবয়বহীন কালো ছায়াগুলোই বা গেল কোথায়? ওরা কারা? ওরা কি আবার ফিরে আসবে?

আমার ক্লান্ত অবসন্ন মনের মধ্যে এইসব প্রশ্ন উথালপাথাল করছিল, অথচ কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। মাতালের মতো টালমাটাল পায়ে পেছনের জঙ্গলের ঘাস-পাতা-কাদা ঘেঁটে দোনলা বন্দুকটা খুঁজে বের করলাম। ওটা তুলে নিয়ে জঙ্গল হাঁটকে ফেরার পথের হদিস করতে চাইলাম।

ঠিক তখনই একটা প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার পাখি—যাকে চলতি কথায় আপনারা দুধরাজ বলেন—আমার পাশ দিয়ে উড়ে চলে গেল ওই

অভিশপ্ত জায়গাটার দিকে। আর তার এলাকায় চুকে পড়ামাত্রই ব্যস—  
অমন সুন্দর ধবধবে পাখিটা থতম।

কী যে হল আমার, দৌড়ে ফিরে গেলাম ওই ফাঁকা জমিটার সীমানায়।  
দেখি সীমানার কাছাকাছিই পড়ে রয়েছে পাখিটা। তার লম্বা বাঁকানো লেজ  
একেবারে স্থির। ডানার একটি পালকও আর নড়ছে না।

হঠাৎ আমার চোখের সামনে যেন ম্যাজিক শুরু হল। পাখিটার নরম  
পালক আর শরীর তিলতিল করে ক্ষয়ে যেতে লাগল। জমির মাটির  
সঙ্গে আগাছার সঙ্গে তার পালক আর শরীরের কণা যেন মন্ত্রবলে মিলিয়ে  
গেল।

হা ভগবান! একটু পরেই পড়ে রইল শুধু পাখিটার কক্ষাল। যেন  
ভাগ অক্ষ সম্পূর্ণ হয়ে শুধু ভাগশেষ পড়ে আছে।

চোখের সামনে এ-দৃশ্য দেখে আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম,  
স্যার। দাঁতালো শুয়োরের মতো রাগ হয়ে গেল শরীরে। জানোয়ারের  
মতো চিংকার করে জমিটাকে খিস্তিখেড় করে উঠলাম আমি। শটগানসমেত  
ডানহাত ছুড়ে দিলাম। সামনে।

রাগে বোধহয় আমার আন্দাজে ভুল হয়ে গিয়ে থাকবে। বোধহয়  
আমার হাতটা চুকে পড়েছিল জমিজুর এলাকায়। কারণ চোখের পলকে  
আমার হাতে ধরা অবস্থাতেই বন্দুকটা গরম হয়ে গেল। আমি যন্ত্রণায়  
চিংকার করে বন্দুকটা ছেড়ে দিয়ে হাত টেনে নিলাম। আমার হাত  
অসহায়ক জুলা করছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমি দিশেহারা হয়ে  
গেলাম।

ওই অবস্থাতেই দেখলাম, বন্দুকটার কাঠের অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল—  
পড়ে রইল তার ইস্পাতের কক্ষাল।

আর আমার সাহসে কুলোয়নি, স্যার। বাঘে তাড়া করা ছাগলছানার  
মতো ভয়ে পাগল হয়ে জঙ্গলের মধ্যে এলোপাতাড়ি ছুটতে শুরু করলাম।  
কী করে যে সেদিন গাঁয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলাম জানি না।

গাঁয়ে ফিরে হেডম্যানকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। তারপর  
গাঁয়ের সবাই ব্যাপারটা জানতে পারে। তখন ওই জঙ্গলটাকে ঘিরে ওইসব

‘নো এন্ট্রি’ বোর্ড লাগানো হয়েছে। আর জাটিঙ্গার সব ছেলেমেয়েই বংশপরম্পরায় ওই জায়গাটাকে এড়িয়ে চলতে শিখেছে। ওই জায়গাটা, স্যার, অভিশাপের গতি দিয়ে ঘেরা। কিন্তু কী অভিশাপ সেটা কেউ জানে না—আমিও সেদিন বুবতে পারিনি।

ওর কাহিনি শেষ করে পহেলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটা ময়লা সৃতীর চাদর ওর গায়ে জড়ানো ছিল, সেটাকে আঁকড়ে ধরে শরীরের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাইল। তারপর চিবুক সামান্য তুলে আমার দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে রইল। যেন ওর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা শুনে আমার কিছু একটা বলা উচিত।

অন্ধকার পহেলাকে প্রায় আড়াল করে রেখেছিল। তবু তারই মধ্যে ওর চোখ চকচক করছিল।

কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল। বিংবিপ্রেক্ষার দল মুহূর্তের জন্যে ওদের চিৎকার থামিয়ে আবার একযোগে সুরে কানা শুরু করল। সিগারেটের ধোঁয়ার মতো কুয়াশার বেঝুঝুবাদিক থেকে ভেসে আসছিল। চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছিল, যেন স্নেইনও পাহাড়ি মেয়ে বাতাসে ওড়না ভাসিয়ে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আর কোনও উপায় না দেখে আমি ইতস্তত করে বললাম, ‘পহেলা, সেদিন তুমি...ইয়ে...আজকের মতো নেশা করে ছিলে না তো?’

একটা হেঁচকি তুলল পহেলা। তারপর নেশা-ধরা গলায় হো-হো করে হেসে উঠল। ওর হাসির মধ্যে কোথায় যেন একটা তিক্ত আঙ্কেপ আর বিক্রিপ লুকিয়ে ছিল। হাসির রেশটা অন্যরকমভাবে শেষ হতেই সেটা স্পষ্ট বুবতে পারলাম।

হাসি থামিয়ে জড়ানো গলায় পহেলা বলল, ‘স্যার, কেউ যখন আমার কথা বিশ্বাস করে না তখন আমি তাকে আমার ডানহাতটা দেখাই...এই দেখুন...।’

চাদরের আড়াল থেকে ডানহাতটা বের করে সামনে বাঢ়িয়ে দিল  
পহেলা। আর সেই মুহূর্তেই ওর গল্প আগাগোড়া বিশ্বাস করলাম আমি।

জ্যোৎস্নার আলোয় দেখলাম, ওর হাতের পাঁচটা আঙুলের মাংস যেন  
কোন অলৌকিক উপায়ে উধাও হয়ে গেছে। কক্ষালের হাতের মতো পাঁচটা  
হাড়ের আঙুল শুন্যে নড়াচড়া করছে। আর সেই সাদা আঙুল থেকে  
ঠিকরে বেরোছে এক অপূর্ব গোলাপি আলোর আভা।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার চোখের সামনে বহু বছর আগে পহেলার দেখা  
অভিশপ্ত ফাঁকা জায়গাটা জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠল।





## ଭୟ ପାଓଡ଼୍ୟା ମାନୁଷ

**ଚି**ଂକାରଟା ଶୁନେଇ ପ୍ରିୟନାଥ ଜୋଯାରଦାର ଥମକେ ଦାଁଡିଯେ ପଡ଼ିଲେନ । ଚିଂକାରଟାର ମଧ୍ୟେ ଯେନ ହିମ ବରଫକୁଚି ମେଶାନୋ ଛିଲ । ଚିଂକାରଟା ଯତକ୍ଷଣ ଧରେ ଚଲଛିଲ ତତକ୍ଷଣେର ଜନ୍ୟ କରିଭରେର ଆଲୋଟା ଯେନ ମଲିନ ହୟେ ଗେଲ—ହଠାତ୍ ଭୋଣ୍ଟେଜ କମେ ଗେଲେ ଯେମନ ହୟ । ତାରପର, ସେଇ ଭୟ-ପାଇୟେ-ଦେଓଡ଼୍ୟା ଚିଂକାରେର ରେଶ ଶେଷ ହଲେ, ବାଲ୍ବଟା ଆବାର ତେଜ ଫିରେ ପେଲ ।

ବିନୋଦନାରାୟଣ ପ୍ରିୟନାଥେର ସାମନେ ଦୁ-ଏକ ପା ଏଗିଯେ ଦାଁଡିଯେ ପଢ଼ିଛିଲେନ । ତାଁର କପାଳେ ଚିନ୍ତାର ରେଖା ଫୁଟେ ଉଠେଛିଲ । ମୁଖେ ଆଲତୋ କରି ହାତ ବୁଲିଯେ ନିଯେ ନରମ ଗଲାଯ ବଲିଲେନ, ସୁନୀତ । ଓର କଥାଇ ଆପଣାକେ ବଲିଲିମ । ତେଲାଯ ପେଛନେର ଦିକଟାଯ ଓ ଥାକେ ।

ପ୍ରିୟନାଥ ଚିଂକାରଟାର କଥାଇ ଭାବିଛିଲେନ । ଏମ ଚିଂକାର ବୁକେର ଭେତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଁଚଢ଼ ଟେନେ ଦେଯ । ଖୁବ ନୀଚୁ ପରିଷ୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୟେ ଧାପେ-ଧାପେ ଓପରେ ଉଠିଛେ । ଯେନ ଘୋରାନୋ ଲୋହାର ମିଳି ବେଯେ କେଉ ଆଇଫେଲ ଟାଓଡ଼୍ୟାରେର ମାଥାଯ ପୌଁଛୋତେ ଚାଇଛେ । ଆର ଯତଇ ଓପରେ ଉଠିଛେ, ଗଲାର ସ୍ଵର ତତଇ ଚୌଚିର ହୟେ ଯାଚେ ।

ମୃତ୍ୟୁକେ ମୁଖୋମୁଖୀ ଦାଁଡିଯେ ଥାକତେ ଦେଖିଲେ କେଉ ହ୍ୟାତୋ ଏରକମ

চিংকার করে। হয়তো ভাবে, এই চিংকারটা তাকে বাঁচিয়ে দেবে। যত উঁচু পরদায় চিংকার করতে পারবে, তার বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি।

চিংকারটা শেষ হওয়ার পর কয়েক সেকেন্ড যেন আলপিন-নিষ্ঠুরতা। তারপর বিনোদনারায়ণ কথা বলেছিলেন। কিন্তু প্রিয়নাথের কানে ভয়ঙ্কর চিংকারটার রেশ তখনও বাজছিল। পুরোনো যত চিংকার বা আর্টচিংকার প্রিয়নাথ শুনেছেন সুনীতের চিংকার এক পলকে সব মুছে দিয়েছে।

বিনোদবাবু বলেছিলেন, ওঁর ছোট ভাই সুনীতনারায়ণ মাঝে-মাঝে অস্ত্রুতভাবে চিংকার করে ওঠে। সেই সঙ্গে আরও কিছু-কিছু বিচ্ছিন্ন কাজ করে। প্রিয়নাথ যদি এ-ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারেন তা হলে ভালো হয়। কারণ, ডাক্তার বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা ভয়াঁস দিয়ে দিয়েছেন।

বিনোদনারায়ণ প্রিয়নাথের খোঁজ পেয়েছেন লতাঙ্গস্থাতায়। তারপর একদিন বিকেলবেলা ওঁর নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছেন। প্রিয়নাথকে খুলে বলেছেন নিজের সমস্যার দাঙ্গা। তারপর কাতরভাবে অনুনয় করে বাড়িতে আসার জন্য অবস্থান করেছেন।

‘কী করে আপনি বুঝলেন আপনার ভাইয়ের প্রবলেমটা কোনও ভুতুড়ে ব্যাপার?’ সিগারেটে কড়া টান দিয়ে জানতে চাইলেন ভূতনাথ।

কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে ইতস্তত করে বিনোদনারায়ণ বললেন, ‘লোকমুখে শুনেছি, বিজ্ঞান যেখানে শেষ সেইখান থেকে আপনার এলাকা শুরু। সুনীতের জন্যে ডাক্তার-সাইকিয়াট্রিস্ট করে-করে আমি বিজ্ঞানের পুঁজি শেষ করে বসে আছি। তাই নিরপায় হয়ে আপনার কাছে এসে হাত পেতেছি। আমার ছোট ভাইটাকে যে-করে হোক বাঁচান। ওর কষ্ট আর সহিতে পারছি না। এত হাসিখুশি টগবগে জোয়ান ছেলেটার এই প্যাথেটিক অবস্থা ভাবা যায় না...।’

কথা বলতে-বলতে বিনোদনারায়ণের চোখে জল এসে গিয়েছিল। প্রিয়নাথ লক্ষ করেছিলেন, ছোট ভাইয়ের কথা বলার সময় বড় ভাইয়ের মুখে-চোখে পিতৃন্মেহ ফুটে উঠেছিল—যা আজকের দিনে প্রায় দেখাই যায় না।

ପ୍ରିୟନାଥ କଯେକ ସେକେଣ୍ଡ ଚୁପ କରେ ବସେ ରହିଲେନ । ଏକମନେ ସିଗାରେଟେ ଟାନ ଦିଯେ ଗେଲେନ । ତାରପର ଛୋଟ କରେ ବଲଲେନ, ‘ଠିକ ଆଛେ । ଆମି ଏକବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ଦେଖି । କବେ ଆପନାଦେର ବାଡ଼ି ଯାଓଡ଼ା ଯାଇ ବଲୁନ...’ । ‘ଯେଦିନ ଆପନି ବଲବେନ ।’

ବିନୋଦନାରାୟଣଦେର ବାଡ଼ି ବସିରହାଟେ । ଓଂଦେର ପିତୃପୁରୁଷ ଜମିଦାର ଛିଲେନ । ତାଇ ଜମିଜମା-ପୁକୁର-ଦିଘିର କୋନଓ ହିସେବ ଛିଲ ନା । ଏଖନେ ନୟ-ନୟ କରେ ଯା ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଛେ ତାও ଅନେକ । ପୁରୋନୋ ଆମଲେର ବିଶାଳ ବାଡ଼ିତେ ଓରା ତିନ ଭାଇ ଥାକେନ । ବିନୋଦନାରାୟଣ, ପ୍ରମୋଦନାରାୟଣ, ଆର ଛୋଟ ଭାଇ ସୁନୀତନାରାୟଣ ।

ବିନୋଦନାରାୟଣ ସବେ କିଶୋର ଥେକେ ଯୁବକ ହୟ ଉଠଛେନ ତଥନ ଓଂଦେର ବାବା ସାପେର କାମଡ଼େ ମାରା ଯାନ । ଶ୍ରଦ୍ଧା-ଶାନ୍ତି କ୍ରିୟାକର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଦି ମିଟେ ଗେଲେ ଇଠାଠାଇ ଏକଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ଓଂଦେର ବାଡ଼ିତେ ଆସେନ । ସକଳେ ହାତ ଦେଖେ ଭାଗ୍ୟଚର୍ଚା କରେ ତିନି ବଲେ ଯାନ, ଏ-ବଂଶେର ପୁରୁଷଦେର ଅଶ୍ରୁରୁତି ଅକାଲମୃତ୍ୟୁ ହବେ । ଏଟା ନିୟତିର ଅଭିଶାପ ।

ତାର ପରଇ ସୁନୀତେର ଜନ୍ମ ହୟ ।

ଏକ କଯେକ ବର୍ଷ ପର ବିନୋଦନାରାୟଣଙ୍କ ମ୍ୟାଲେରିଆୟ ମାରା ଯାନ । ପ୍ରମୋଦ ଆର ସୁନୀତ ତଥନ ଖୁବଇ ଛୋଟ ବିନୋଦନାରାୟଣ ଓଂଦେର କୋଲେ-ପିଟେ କରେ ଆଗଲେ ରେଖେ ବଡ଼ କରେନ । ଅଭିଶାପେର ଭାବେ ତିନି ବିଯେ କରେନନି । ସାରାଟା ଜୀବନ ସମ୍ପନ୍ତି ଦେଖାଶୋନା ଆର ଧର୍ମ-କର୍ମ ନିୟେ ଥେକେଛେନ । ମନେ-ମନେ ଭେବେଛେନ, ନିଶିଦିନ ଈଶ୍ଵର-ସାଧନାୟ ମଞ୍ଚ ଥାକଲେ ଅଭିଶାପ ଧୀରେ ଧୀରେ କେଟେ ଯାବେ । କାଳୋ ଛାଯା ସରେ ଗିଯେ ଆବାର ଆଲୋ ଦେଖେ ଦେବେ ।

‘...କିନ୍ତୁ ଏମନାଇ ଭବିତବ୍ୟ ଦେଖୁନ, ସୁନୀତ ଏଇ ଅତ୍ତୁତ ବିପଦେ ପଡ଼ିଲ ।’ ମଲିନ ମୁଖେ ବଲଲେନ ବିନୋଦନାରାୟଣ, ‘ଜାନି ନା, ଏଟା ସେଇ ଅଭିଶାପେର କୋନଓ ଛାଯା କି ନା ।’

ଆପନାର କି ମନେ ହୟ କୋନଓ ପ୍ରେତାଞ୍ଚା ସୁନୀତେର ଶରୀରେ ବାସା ବେଁଧେଛେ? ପ୍ରିୟନାଥ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲେନ ।

‘କୀ କରେ ବଲବ! ହତାଶଭାବେ ଜବାବ ଦିଲେନ ବିନୋଦବାୟ, ‘ପ୍ରମୋଦ ତୋ ବଲଛିଲ ସେଟାଇ ହଯେଛେ । ଓର ଚେନା ଏକଜନ କାପାଲିକ ଆଛେ । ତାକେ ନିୟେ ଏମେ କୀସବ ତନ୍ତ୍ର-ମନ୍ତ୍ର କରଲେଇ ନାକି ସୁନୀତ ଠିକ ହୟ ଯାବେ । ତା ଆମି

ওর কথায় রাজি হইনি।’

‘কেন?’

‘প্রমোদ বহুকাল ধরেই কেমন বাউডুলে গোছের। বাড়ির দিকে মন নেই। সুযোগ পেলেই সাধু সন্ত তান্ত্রিকদের পেছনে ছুটে বেড়াত—এখনও তাই। মাঝে-মাঝেই রাতে বাড়ি ফেরে না। যখন-তখন ছাইপাঁশ গিলে বসে থাকে। ওকে ভাই বলে পরিচয় দিতে আমার খুব লজ্জা করে।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিনোদনারায়ণঃ ‘আসলে দোষ আমারই, প্রিয়নাথবাবু—ওকে আমি শত চেষ্টা করেও মানুষ করতে পারিনি। তাই ওর প্রতি আমার কোনও অভিযোগ নেই। বরং ওর মুখোমুখি হলেই আমি কেমন একটা অপরাধবোধে ভুগি। নিজের ব্যর্থতার কথা মনে পড়ে যায়। এটা আমার...।’

বিনোদনারায়ণের গলার স্বর কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল। মাথা নীচু করে তিনি নিজেকে আড়াল করতে চাইছিলেন।

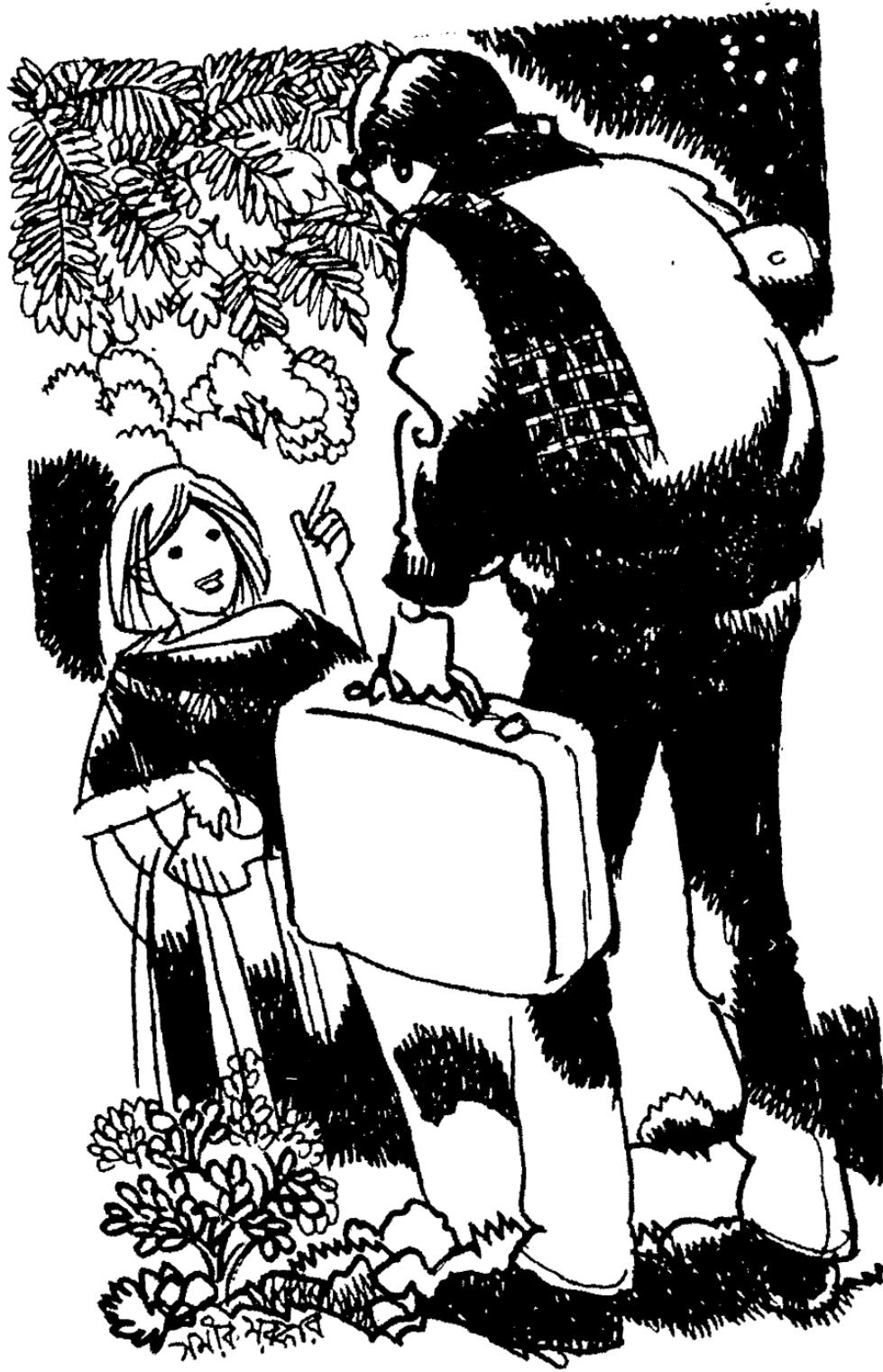
প্রিয়নাথ ওঁকে সাঞ্জন্য দিয়ে বললেন, ‘প্রিজ, আপনি আপসেট হবেন না। আমরা যা চাই সবসময় কি তা হয়!.. আচ্ছা, প্রমোদবাবু বিয়ে করেননি?’

‘না।’ একটু থেমে তারপরঃ ‘ও যদি নিজে কখনও বিয়ে করে করবে—আমি বড় ভাই হিসেবে কখনও কোনও ইনিশিয়েটিভ নিতে পারব না।’

‘ছোট ভাইয়ের ব্যাপারে প্রমোদবাবু দৃঢ় পাননি?’

‘পেয়েছে। ওকে আমরা ভীষণ ভালোবাসি। ও আমাদের গর্ব। এলাকার সবাই ওকে পছন্দ করে। লেখাপড়ায় জুয়েল ছেলে। খেলাধুলোতেও দারুণ। ওর অনেক বঙ্গ-বাঙ্বাৰ। সবাই মিলে হইহই করে টুঁৰে যায়, সোশাল ওয়েলফে-য়ারের কাজ করে—মানে, করত। সুনীতকে সবাই একডাকে চেনে। আমি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই তখন যদি কেউ বলে, ওই যে, সুনীতের বড়দা যাচ্ছে, তখন আমার খুব আনন্দ হয়।’

সাদা শার্টের পাশপকেট থেকে ঝুমাল বের করে চোখে বুলিয়ে নিলেন বিনোদবাবু। একটু কেশে গলাটা স্বাভাবিক করে নিয়ে বললেন, ‘আপনি একবার চলুন। নিজের চোখে সব দেখুন। তারপর...আপনি আমাদের শেষ ভরসা।’



প্রিয়নাথ হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বললেন, ‘আমি প্রেতসিদ্ধ বা ওঝা নই। তবে ভূত-প্রেতের খোঁজ করে বেড়ানো আমার নেশা। চেষ্টা করে দেখি আপনাকে কোনওরকম হেঁগে করা যায় কি না। আচ্ছা, সুনীত যে চিংকার করে সেটা ঠিক কী ধরনের?’

‘বলে বোঝাতে পারব না, প্রিয়নাথবাবু। আপনি বরং নিজের কানে শুনেই বিচার করবেন।’

প্রিয়নাথ লক্ষ করেছিলেন, কথাগুলো বলার সময় বিনোদনারায়ণের মুখে কেমন যেন অসহায় ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল।

এখন, সুনীতের চিংকার নিজের কানে শোনার পর, প্রিয়নাথ সেই ভয়ের কারণ বুঝতে পারলেন। এই অপার্থিব চিংকারে বুকের রক্ত যেন জমে বরফ হয়ে যায়।

‘চলুন—ওপরে চলুন।’

বিনোদনারায়ণের কথায় প্রিয়নাথ সংবিধি ফিরে পেলেন। ভাঙা ক্ষয় ধরা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওঁরা ওপরে উঠতে শুরু করলেন।

সিঁড়ির বাঁকের মুখে দেওয়ালে বসানো কারুকাজ করা জাফরি। জাফরির ওপরের দিকে তিনটে ছোট-ছোট হরিণ। সময়ের প্রকোপে জায়গায়-জায়গায় রং চটে গেছে।

জাফরির ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। বাতাসে নদীর ঘাণ প্রিয়নাথ টের পাচ্ছিলেন। একইসঙ্গে শীতের কামড়।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই উষ্ণতা ওঠা-নামা করছিল~~ৱ~~ শীত যেন লাজুকভাবে উঁকিবুকি দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু তারপর~~ৱ~~ উষ্ণতা নামতে শুরু করেছে। শীতও আনুষ্ঠানিকভাবে জাঁকিয়ে রয়েছে।

গায়ে উলিকটের গোঞ্জি ও সোয়েটার থৰু~~ৱ~~ সন্দেশ প্রিয়নাথ সামান্য কেঁপে উঠলেন।

ঘন-ঘন বাঁক নেওয়া সিঁড়ি বেয়ে ওঁরা ওপরে উঠছিলেন। প্রিয়নাথ লক্ষ করছিলেন, সরু-চওড়া নারু~~ৱ~~ ধরনের অলিঙ্গ বাড়িটার নানান দিকে চলে গেছে—অনেকটা ভুলভুলাইয়ার মতন। আলোর ব্যবস্থা বলতে বেশিরভাগই বাল্ব। দু-এক জায়গায় টিউব লাইট যে চোখে পড়ছে সেসব নতুন সংযোজন।

দেওয়ালে-দেওয়ালে ড্যাম্পের ছাপ চোখে পড়ছিল। সেইজন্যই হয়তো শীতের সঙ্গে একটা বাড়তি ঠাণ্ডা যোগ হয়ে গিয়েছিল।

তিনতলায় উঠে দুটো তালাবন্ধ ঘরের দরজা পেরিয়ে সুনীতের ঘরের দিকে এগোলেন ওঁরা দুজন। বিনোদনারায়ণ তালাবন্ধ দরজা দুটো পেরোনোর সময় বললেন, ‘এত বড় বাড়িতে তিনটে মাত্র প্রাণী। একতলায় আমি, দোতলায় প্রমোদ, আর তেতলায় সুনীত। তাই বাড়তি ঘরগুলো তালাবন্ধই পড়ে থাকে। প্রায় বিশ বছর ওগুলোর দরজা খোলা হয়নি। খুললে হয়তো দেখব ইঁদুর, বাদুড়, আর চামচিকে আস্তানা গেড়েছে।’

প্রিয়নাথ কিছু বললেন না।

‘সুনীতের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। বিনোদবাবু সামান্য ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।

ঘরের ভেতরের আলো প্রিয়নাথের চোখ ধাঁধিয়ে দিল, অলিন্দের আলো মুছে দিল। আর একইসঙ্গে ঘরের দৃশ্য প্রিয়নাথকে ধাক্কা দিল।

ঘরের এক কোণে সুন্দর ধপধপে বিছানা। মেঝানে শুয়ে আছে বছর চৰিশ-পঁচিশের এক যুবক। ফরসা রোগা চেহারা। বুকের কাছ পর্যন্ত লেপ টানা। একটা হাত লেপের বাঁকে বলেই রোগা চেহারাটা স্পষ্ট করে আন্দাজ করা গেছে।

সুনীতের মাথায় একরাশ কেঁকড়া চুল। নাক ঠোঁট সুন্দর। ঠোঁটের ওপরে চওড়া গৌঁফ। চোয়ালে দু-একদিনের দাঢ়ি।

সুনীতের চোখজোড়া প্রিয়নাথ দেখতে পেলেন না—কারণ, সাদা কাপড়ের পটি দিয়ে ওর চোখ ঢাকা।

প্রিয়নাথ বেশ অবাক হয়ে বিনোদনারায়ণের দিকে তাকালেন। বিনোদনারায়ণ ইশারায় ওঁকে অপেক্ষা করতে বললেন।

সুনীতের খাটের কাছে টুলে একজন বয়স্ক মহিলা বসে ছিলেন। রোগা ময়লা চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে চশমা, পরনে নীল পাড় সাদা শাড়ি। দেখে আঘাত বলে মনে হয়।

বিনোদনারায়ণ তাঁকে বললেন, ‘মাসি, আপনি একটু নীচে গিয়ে বসুন। ডাঙ্কারবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন—ছোড়দাকে দেখবেন।’

বদ্রমহিলা উঠে চলে যাচ্ছিলেন, বিনোদনারায়ণ জিগ্যেস করলেন, ‘ওকে ঘুমের ওষুধটা খাইয়ে দিয়েছেন?’

ছেউ করে মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলে মহিলা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই প্রিয়নাথ জিগ্যেস করলেন, ‘সুনীতের চোখ বাঁধা কেন?’

উত্তর দিল সুনীত, ‘অন্ধকারে ঘুমোতে আমার ভয় করে। তাই ঘরের আলো জ্বলে রেখে চোখ বেঁধে ঘুমোতে চেষ্টা করি।’

চোখ ফিরিয়ে সুনীতের দিকে তাকিয়েছিলেন প্রিয়নাথ। ও গায়ের লেপ সরিয়ে বিছানায় উঠে বসেছে। বাঁ-হাতে টান মেরে সরিয়ে দিয়েছে চোখের পটি।

ওর নিষ্পাপ সুন্দর চোখজোড়া প্রিয়নাথকে মুঞ্চ করল।

বিনোদনারায়ণ ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। তারপর ছেট ভাইকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘লেপটা গায়ে দে—ঠাণ্ডা লেপে যাবে।’

বসা অবস্থাতেই সুনীত লেপটা গায়ে জড়িয়ে নিল। তারপর কৌতুহলী গলায় ভূতনাথকে প্রশ্ন করল, ‘আপনি কীভোর ডাক্তার? বড়ির, না মাইন্ডের?’

ওর প্রশ্নের ধরনে প্রিয়নাথ বেশ মজার পেলেন। বিনোদনারায়ণ একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটায় না বসে আয়া-মাসির ছেড়ে যাওয়া টুলটায় গিয়ে বসলেন প্রিয়নাথ। তারপর চোখের চশমাটা সামান্য নেড়েচেড়ে মজার সুরে পালটা প্রশ্ন করলেন, ‘তোমার অসুখটা কীসের—বড়ির, না মাইন্ডের? “তুমি” করে বললাম—কিছু মাইন্ড কোরো না?’

বিনোদনারায়ণ সুনীতের পায়ের দিকটায় খাটের এক কোণে বসে পড়লেন। বললেন, ‘সুনীত, ইনি হলেন প্রিয়নাথ জোয়ারদার। অনেক রিকোয়েস্ট করে কলকাতা থেকে ওঁকে ধরে এনেছি। আমাদের বাড়িতে ক’দিন থাকবেন...তোকে হেল্প করার চেষ্টা করবেন। তোর সব কথা তুই ওঁকে খুলে বলতে পারিস।’

সুনীত বারদুয়েক কাশল। লেপটা আরও ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। তারপর মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

বিনোদনারায়ণের সঙ্গে প্রিয়নাথের চোখাচোখি হল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রিয়নাথ আগের প্রশ্নটাই আবার করলেনঃ ‘তোমার অসুখটা কীসের—বড়ির, না মাইন্ডের?’

আচমকা মুখ তুলে তাকাল সুনীত। বলল, ‘বড়িরও না, মাইন্ডেরও না। অন্য কিছু...।’

বিনোদনারায়ণকে আবাক করে দিয়ে সিরিয়াস গলায় ভূতনাথ বললেন, ‘আমি সেই অন্য কিছুর ডাক্তার।’

পলকে ঘরের আবহাওয়া যেন পালটে গেল। বিনোদনারায়ণ উস্থুস করতে লাগলেন। সুনীত কেমন চোরাচাউনিতে ভূতনাথকে দেখতে লাগল।

প্রিয়নাথ অফিসের ওপরওয়ালার সুরে বললেন, ‘শোনো, সুনীত—তোমার কী হয়েছে আমি বলছি। তুমি ভীষণ ভয় পেয়েছ। কেমন করে তা জানি না। তবে সেই ভয় তোমাকে ধীরে-ধীরে শেষ কর্ণে দিচ্ছে। তুমি যদি আমাকে সব খুলে বলো, তা হলে আমি তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করব। তোমার জন্যে দুশ্চিন্তা করে করে তোমাকে ~~বৰ্ডু~~<sup>বৰ্ডু</sup>-মেজদাও তো শেষ হয়ে যাচ্ছেন।’

সুনীত হঠাৎ কেঁদে ফেলল। কাঁদতে-কাঁদতে~~বল~~বলল, ‘কী করে বলব! সে-কথা তো কাউকে বলা বারণ। কাউকে~~বল~~বলামাত্রই সর্বনাশ নেমে আসবে।’ একটু থেমে তারপর : ‘জৰু যদি কেউ নিজে গিয়ে দেখে আসে তা হলে আলাদা কথা...।’

প্রিয়নাথ বিনোদনারায়ণের দিকে তাকালেন। বিনোদনারায়ণ ইতস্তত করে বললেন, ‘সুনীতের ফটোগ্রাফির শখ আছে। মাঝে-মাঝেই ও ফটো তোলার বেঁকে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ত। মাসদুয়েক আগে ও সমষ্টিপুরের দিকে গিয়েছিল। সঙ্গে ওর এক বন্ধু—পরেশ—ছিল। কিন্তু রওনা হওয়ার পাঁচদিন পর পরেশ বাড়ি ফিরে আসে। কারণ, বাড়িতে এস. টি. ডি. করে জানতে পেরেছিল ওর বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুনীত ফিরে আসে তার ছ'দিন পর। তারপর থেকেই ওর এই অসুখ। আমি ওকে বহুবার জিগ্যেস করেছি, কিন্তু ও স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি—অথবা, বলতে চায়নি। শুধু “নেহা” আর “সদরিয়া”—এই দুটো শব্দ ওর মুখ থেকে বারবার শুনতে পেয়েছি—তার বেশি কিছু নয়।’

বিনোদবাবু থামলেন।

সুনীত তখনও মাথা নীচ করে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল দেখে বিনোদনারায়ণ উঠে ছোট ভাইয়ের কাছে গেলেন। পাশে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে শাস্ত করতে চাইলেন।

প্রিয়নাথ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই সুনীত মুখ তুলে তাকাল বড়দার দিকে। করুণ গলায় বলল, ‘সেই ফটোটার কথা বললে না!'

‘ওহ-হাঁ। ওর তুলে আনা দু-রিল ফটোগ্রাফের মধ্যে আটটা ছবি ব্ল্যাঙ্ক। মানে, ডেভেলাপ করে কিছু পাওয়া যায়নি। তবে একটা ফটো উঠেছে ভারী অঙ্গুত। সেটা আপানাকে দেখাচ্ছ...।’ বলে বিনোদনারায়ণ ঘরের একটা তাকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সেদিকে তাকালেন প্রিয়নাথ।

সুনীতের ঘরটা বেশ আধুনিক ধাঁচে শৌখিনভাবে সাজানো। দেওয়ালে সুন্দর তাক তৈরি করে টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা, বস্টার্চারভাবে রাখা। দুটো বইয়ের ফাঁক থেকে একটা খাম বের করে পরলেন বিনোদনারায়ণ। তারপর প্রিয়নাথের কাছে এগিয়ে এসে খামজ প্রিয়নাথের হাতে দিলেন।

খামের ভেতর থেকে একটা ফটো মেঝে বের করলেন প্রিয়নাথ।

ফটোর সবটাই ঘোর কালো এবং ঘোর নীল মেশানো একটা অঙ্ককার। তারই মাঝে সরষের মাপের অনেকগুলো লাল ফুটকি এলোমেলোভাবে ছড়ানো।

এই সাদামাঠা ফটোগ্রাফের কী মানে থাকতে পারে প্রিয়নাথ ভেবে পেলেন না।

বিনোদনারায়ণ বললেন, ‘এই ছবিটার মধ্যে যে কী আছে কে জানে! এটা দেখলেই সুনীত ভীষণ ভয় পেয়ে আপসেট হয়ে যায়। ও কোথাও গিয়ে কোনও কিছুর নটা ছবি তুলেছিল। তার মধ্যে আটটা ব্ল্যাঙ্ক, আর ন’ নম্বরটা এই...।’

অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ফটোটা দেখার পর প্রিয়নাথ সুনীতকে জিগ্যেস করলেন, ‘এসব ছবি তুমি কোথায় গিয়ে তুলেছিলে?’

সুনীতের বোধহয় ঘূম পাচ্ছিল। ও ঝিম-ধরা চোখে প্রিয়নাথকে জরিপ করছিল। বোধহয় দেখতে চাইছিল ফটোটা দেখার পর প্রিয়নাথের কীরকম

প্রতিক্রিয়া হয়। সেরকম কোনও প্রতিক্রিয়া হল না দেখে একটু যেন হতাশই হল।

প্রিয়নাথের প্রশ্নে ও অস্পষ্ট গলায় বলল, ‘সদরিয়া...নেহা...।’

প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরালেন। অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ সিগারেট টান দিয়ে গেলেন।

বিনোদনারায়ণ চুপচাপ খাটের কোণে বসে পড়লেন, প্রিয়নাথকে লক্ষ করতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর প্রিয়নাথ মুখ খুললেন। গভীর গলায় বললেন ‘সুনীত, তুমি বোধহয় বাঁচতে চাও না। নইলে সব কথা আমাকে অন্তত খুলে বলতে আমি কথা দিছি—কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।’

সুনীত করঞ্চ গলায় বলল, ‘ওরা কাউকে বলতে বাধ্য করেছে। কাউকে বলা যাবে না। কাউকে নাই যদি নিজে দেখে আসে...।’

‘আমি যাব!’ জোরালো গলায় বললেন প্রিয়নাথ। আমি নিজে গিয়ে দেখে আসব। ওদের কাউকে আমি ভয় পাইতামা।’

‘আমি ভয় পাই...।’

‘তুমি বলো কী করে সেখানে ঘুটে হয়।’

‘জানি না।’ ঘুম-জড়ানো গলায় বলল সুনীত, ‘...সদরিয়া...নেহা...।’

প্রিয়নাথ হাতের ফটোটা সুনীতের চোখের সামনে মেলে ধরলেন : ‘বলো, কী আছে এই ছবিতে? বলো! ’

চোখের পলকে সুনীতের মুখ আতঙ্কে ভেঙেচুরে গেল। ও বিশাল হাঁ করে ঘটাদেড়েক আগের সেই হিমেল চিত্কার শুরু করল।

প্রিয়নাথদের কানে তালা লেগে গেল। ঘরের জানলার শার্সি ঝনঝন করে কাঁপতে লাগল। এক ভয়ক্ষর অনুনাদ ঘরের আবহাওয়াকে পাগল করে দিল।

বিনোদনারায়ণ লাফিয়ে উঠে ছেট ভাইকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। ওর মাথায় হাত বেলাতে লাগলেন।

প্রিয়নাথ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর তীব্র চোখ সারাক্ষণ সুনীতকে লক্ষ করছিল।

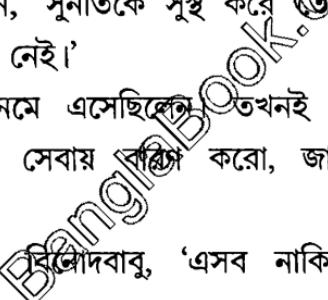
আয়া-মাসি ভেজানো দরজা ঠেলে তাড়াছড়ো করে ঘরে এসে টুকলেন। তাঁর মুখে-চোখে উদ্বেগ।

সুনীত হাঁফাছিল। ওর চোখ আধবোজা মতন হয়ে গেছে। বিনোদনারায়ণ ওকে ধীরে ধীরে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মাসিকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘মাসি, আপনি ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিন। আমরা যাচ্ছি—।’

প্রিয়নাথ আর বিনোদনারায়ণ সুনীতের ঘর ছেড়ে অলিন্দে বেরিয়ে এলেন। উজ্জ্বল আলো থেকে স্থিমিত আলোয় আসায় প্রিয়নাথের দেখতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল। তিনি বিনোদনারায়ণকে বললেন, ‘ফটোগ্রাফটা আমার কাছে থাক। কাল সকালে আমি সুনীতের সঙ্গে কথা বলব। আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?’

‘আপত্তি!’ মলিন আলোয় বিনোদনারায়ণের হাসিটা ঝোঁক যেন দেখাল। নরম গলায় তিনি বললেন, ‘সুনীতকে সুস্থ করে তোলার জন্যে কোনও কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।’

ওঁরা সিঁড়ি ঘুরে দোতলায় নেমে এসেছিলেন। তখনই কানে এল জড়ানো গুলায় গান : ‘...কারণ সেবায় পৌঁছে করো, জানতে পারি কারণটা কী...?’

‘প্রমোদ।’ চাপা গলায় বললে  বিনোদবাবু, ‘এসব নাকি ওর তন্ত্র সাধনার অঙ্গ। হঁঁ।’

প্রিয়নাথ কোনও কথা বললেন না।

‘রাত অনেক হল চলুন, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নেওয়া যাক।’

প্রিয়নাথকে একতলার খাওয়ার ঘরের দিকে নিয়ে চললেন বিনোদনারায়ণ।

জাফরির ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছিল। সেদিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথ বুঝতে পারলেন, বাইরে অঙ্ককার আর শীতের রেষারেষি শুরু হয়ে গেছে।

চিনের বাক্স লাগানো সাইকেল-ভ্যান নিয়ে যারা পাঁউরুটি আর বিস্কুট দোকানে-দোকানে জোগান দেয় তাদের কথা মনে পড়ল প্রিয়নাথের। পাঁউরুটি আর বিস্কুটের বদলে যদি বেশ কিছু কাচের মার্বেল সেই বাক্সে ভরে ভ্যানটাকে সদ্য ধান-কাটা কোনও চাষ-জমির ওপর দিয়ে চালানো

হয়, তা হলে যেরকম ঝাঁকুনি ও শব্দ হবে তার সঙ্গে এই বাসটার চলার দারুণ মিল খুঁজে পাইলেন তিনি।

সমস্তিপুরে নেমে সরু লাইনের ট্রেনে চড়ে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পথ চলার পর তিনি নেমেছিলেন কামনিতাল স্টেশনে। সেখান থেকে বাস ধরেছেন— তবে বাসটাকে দোমড়ানো-তোবড়ানো ক্যানেস্টারা বলাই ভালো। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় ছুটে চলা বাসের শব্দ আর ঝাঁকুনি প্রিয়নাথকে প্রায় কাহিল করে দিছিল। যদিও বাসের নাম ‘উড়ন খটোলা’।

আশার কথা একটাই। এই বাস তাঁকে সদরিয়া নিয়ে যাবে! তারপর... সেখানে নেমে... খুঁজে বের করতে হবে নেহাকে।

জানলার বাইরে দুপুর গড়িয়ে বিকেল এসে গেছে। স্থিমিত রোদে ছুটে চলা গম-ভুট্টা-জওয়ারের খেত আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। সামাজিক খোলা কাচের জানলার ফাঁক দিয়ে ছুটে-আসা বাতাস ক্রমে আরও গুরু হচ্ছিল। প্রিয়নাথ জ্যাকেটের চেন গলা পর্যন্ত টেনে দিলেন, মাঝেরোঁটাকে আরও ভালো করে জড়িয়ে নিলেন।

ভিড়ে ঠাসা বাসের ভেতরে অনেক ঘোন্টা বিড়ির নেশায় ব্যস্ত। বোধহয় ‘নো স্মোকিং’ কথার ‘নো’-টা বাসের দেওয়াল থেকে মুছে গেছে বলে।

খানিক ইতস্তত করে অস্বস্তি কাটিয়ে প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর সুনীত নারায়ণের সমস্যার দুশ্চিন্তায় ডুবে গেলেন।

হঠাতে তাঁর মাথায় ভেতরে সুনীত হাড়-কাঁপানো ভয়ংকর চিংকার করে উঠল।

আর প্রিয়নাথের সাতদিন আগের কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল বসিরহাটের কথা। ঘোরালো পঁচালো অলিন্দ আর সিঁড়িতে জট পাকানো প্রকাণ্ড বাড়িটার কথা।

সেদিন রাতে খাওয়াদাওয়ার পর প্রিয়নাথের চোখে ঘূম আসেনি।

দোতলার একটা ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিছানায় বসে নোটবই আর পেন দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নানান মন্তব্য লিখেছেন প্রিয়নাথ। সুনীতের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য, বিনোধনারায়ণের কাছ থেকে শোনা কিছু জরুরি কথা, আর নিজের মতামত। সেইসঙ্গে লিখে নিয়েছেন,

এরপর তাঁকে কী-কী কাজ করতে হবে।

লেখা-টেখার কাজ শেষ হলে পর প্রিয়নাথ ঘর অঙ্ককার করে কস্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। ঘরের সব জানলা-দরজা বন্ধ করে শুলে তাঁর কেমন যেন দম আটকে আসে। তাই পায়ের দিকের একটা জানলার পাল্লা অর্ধেকটা খুলে রেখেছিলেন। সেটা নিশ্চয়ই পুব দিক—কারণ, চাঁদের একটা টুকরো দেখা যাচ্ছিল।

বহু চেষ্টা করেও ঘুম আসছিল না। বিছানায় উসখুস করছিলেন। হঠাৎই জড়ানো গলায় গানের কলি শুনতে পেলেন : ‘ন্মণুমালিনী তারা/ মুণ্মালা কোথায় পেলি...’

প্রমোদনারায়ণ। দোতলার বাসিন্দা—প্রিয়নাথের প্রতিবেশী।

রাতে খাওয়ার সময় প্রমোদনারায়ণের দেখা পাননি প্রিয়নাথ। এখন ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলে নিলে কেমন হয়!

বাইরে বেরিয়ে দেখলেন চওড়া বারান্দার শেষ প্রান্তে ঝাঁকিকটা চাতাল মতো জায়গায়, একজন ছায়া-মানুষ বসে আছে। তাঁর শরীর অঙ্ককার আর চাঁদের আলোয় মাখামাখি।

পায়ে-পায়ে কাছে এগিয়ে গেলেন প্রিয়নাথ। আলতো করে ডাকলেন, ‘প্রমোদবাবু—’

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন প্রমোদনারায়ণ।

একমুখ দাঢ়ি, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, কপালে লাল তিলক—চাঁদের আলোয় কালো দেখাচ্ছে। আর গভীর চোখদুটো নিশাচর প্রাণীর মতো অস্তভোদী, উজ্জ্বল।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরদিকে তাকালেন প্রমোদনারায়ণ : ‘ও, ভূতনাথবাবু! আসুন...বসুন। মায়ের চরণ-ধোওয়া চাঁদের আলো...এর কোনও জবাব নেই।’

চাতালে সতরঞ্জি পাতা ছিল। ভূতনাথ তার ওপরে বসে পড়লেন। খোলা জায়গায় বেশ শীত করছিল। গায়ের শাল আরও ঘন করে জড়িয়ে নিলেন।

অঙ্ককারে বেশ কিছু গাছের মাথা আর দু-একটা বাড়ি চোখে পড়ছে। একটা পঁ্যাচা নিঃশব্দে উড়ে গেল। কয়েকটা জোনাকি আলোর ফুটকি

জেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রিয়নাথের মনে পড়ে গেল সুনীতের ফটোটার কথা।

শীতের বাতাস যেমন-তেমন বইছিল। প্রিয়নাথের নাকে মদের গন্ধ ভেসে আসছিল।

‘শুনেছি, আপনি সুনুকে সারিয়ে তোলার জন্যে কলকাতা থেকে এসেছেন।’ প্রমোদনারায়ণ কথা বললেন, ‘আমিও ওকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। কিন্তু দাদা এমন ঝামেলা করে! কিছুতেই বোঝে না ধর্মকর্ম এক জিনিস আর তন্ত্র আর-এক জিনিস। আমার সাধনায় বারবার বিষ্ণু ঘটায়...।’ বেশ বিরক্ত-ভাবে কথা শেষ করলেন প্রমোদবাবু।

প্রিয়নাথের কৌতৃহল হল। ওঁকে জিগ্যেস করলেন, ‘আপনি কীভাবে সুনীতকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন একটু বলবেন?’

‘বললাম যে—তন্ত্র দিয়ে। সবাই জানে, তন্ত্রশাস্ত্র চিরস্তন—প্রত্যক্ষ ফল দেয়। তন্ত্র স্বয়ং মহেশ্বরের মুখনিঃস্ত বাণী। একে ক্লেষ্টক্রিখনও অবজ্ঞা করে! একটু থেমে প্রমোদনারায়ণ বললেন, ‘সুনীতের জন্যে আমি ভূত-প্রেত ভয়নাশক যন্ত্র প্রয়োগ করেছি।’

‘সেটা কী জিনিস?’

‘চলুন—আমার ঘরে চলুন—দেখাইত্বা—

প্রমোদনারায়ণ চাতাল ছেড়ে উঠে পড়লেন। গুনগুন করে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরের দিকে রওনা দিলেন।

প্রিয়নাথ ওঁকে অনুসরণ করলেন।

ঘরটা যথেষ্ট প্রাচীন, আর মাপে বেশ বড়। মেঝে পর্যন্ত লম্বা-লম্বা জানলা। ঘরের সিলিং-এ কড়ি-বরগা।

ঘরের দেওয়ালে নানা ধরনের ছবি আর ছক আঁকা। শিব ও কালীর বড়-বড় দুটো ফটো মালা দিয়ে সাজানো। ঘরের মেঝের এককোণে বইয়ের গাদা। তার পাশে চারটে তাকও বইয়ে ঠাসা।

ঘরের ডানদিক ঘেঁষে অগোছালো ময়লা বিছানা। বিছানার পাশে টেবিলে মদের বোতল, প্লাস আর চশমা।

সব মিলিয়ে ঘরটায় কেমন যেন অগোছালো উচ্ছ্বস্থল ছাপ।

হাতওয়ালা একটা চেয়ারে প্রিয়নাথকে বসতে বললেন প্রমোদনারায়ণ।

তারপর টেবিল থেকে চশমাটা চোখে দিয়ে খাটের তলায় কী যেন খুঁজতে লাগলেন।

অবশ্যে খুঁজে পেয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে লাঠির মতো গোল করে পাকানো একটা কাগজ। সেটা ভূতনাথের সামনে মেলে ধরে বললেন, ‘এই দেখুন—ভূত-প্রেত ভয়নাশক যন্ত্র।’

ভূতনাথ দেখলেন, একটা ভূর্জপত্রে ছক কেটে কয়েকটা সংখ্যা লেখা :

৪	৫৬	১৬	৬০
৩১	৪৪	২০	৪০
৫২	৭	৩৪	১২
৪৮	২৮	৩৬	২৪

প্রমোদনারায়ণ বললেন, ‘দীপাঞ্চিতা অমাবস্যার রাতে অষ্টগন্ধ দিয়ে লিখে রেখেছি। দাদাকে লুকিয়ে সুনীতের ঘরের দেওয়ালে—খাটের নীচে—সিঁদুর দিয়ে এই যন্ত্র লেখা আছে। এ ছাড়া শাশানে গিয়ে কিছু ক্রিয়াকর্ম করার চেষ্টা করছি। একটু-একটু কাজ হচ্ছে...আরও হবে। আসলে সুন্ম যে কোনওরকম হেঁস করছে না।’

প্রমোদনারায়ণের হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে প্রিয়নাথ খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর সেটা ওঁকে ফিরিয়ে দিতে-দিতে বললেন, ‘ঝঙ্কাছা, সুনীত যে বারবার “সদরিয়া” আর “নেহা” শব্দ দুটো বলছে, তার অর্থ কী?’

প্রমোদবাবুর কপালে ভাঁজ পড়ল। ছেট প্রিয়ে ঢেকুর তুলে বললেন, ‘আমি ওকে বহুবার জিগ্যেস করেছি। তাঁর আমার যা মনে হয়েছে, সদরিয়া কোনও জায়গার নাম—সমাজিক থেকে যাওয়া যায়। আর নেহার ব্যাপারে জিগ্যেস করলে সুন্ম বলছে সেটা ওখানে গেলেই বোঝা যাবে...বলা যাবে না।’

রাতের আকাশে কুকুরের কাতর চিংকার শোনা গেল।

প্রিয়নাথ চুপ করে ছিলেন। প্রমোদনারায়ণকে দেখছিলেন।

প্রমোদনারায়ণ বললেন, ‘আপনি কাল সকালে ওকে একবার জিগ্যেস

করে দেখুন। যদি নতুন কোনও তথ্য পান...। ওর কষ্ট আর চোখে দেখা যাচ্ছে না...।'

শেষ কথাটা বলার সময় তত্ত্বসাধক মানুষটার গলা ভারী হয়ে এল। প্রিয়নাথ টের পেলেন, লোকে যা-ই বলুক না কেন, মানুষটার ভেতরে এখনও একটা মেহশীল মেজদা অবশিষ্ট আছে।

ওঁকে বিদায় জানিয়ে ঘরে ফিরে এলেন ভূতনাথ। বিছানায় গা ঢেলে দিতেই ঘুম দু-চোখে আসন পেতে বসল। ঘুমের ঘোরে সুনীতের তোলা ফটোগ্রাফটাকে স্বপ্ন দেখলেন। তবে ফটোর লাল ফুটকিগুলো জোনাকির মতো ভুলছিল-নিভছিল।

বাসের প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি প্রিয়নাথের ভাবনার সূতো ছিঁড়ে দিল। কন্ডাস্টর দেহাতি ঢঙে হাঁক পাড়ল : 'সদরিয়া! সদরিয়া!'

সিট ছেড়ে উঠে বাক্ষ থেকে সুটকেস্টা নিলেন প্রিয়নাথ। শ্রায় ধন্তাধন্তি করে ভিড় ঠেলে বাস থেকে নেমে পড়লেন রুক্ষ স্বিস্তার্য।

এটা যে সদরিয়া নয় সেটা প্রিয়নাথ খোঁজখুঁজে করে অনেক আগেই জেনেছেন। তবে এখান থেকে টাঙ্গা পাওয়া যান্তে টাঙ্গা নিয়ে যায় গণক নদীর পাড়ে। সেখান থেকে খেয়া পার হয়ে আবার টাঙ্গায় চড়ে বেশ খানিকটা গেলে তবে সদরিয়ার দেশ পোওয়া যাবে।

এতসব কাণ্ড করে প্রিয়নাথ যখন সদরিয়ার পা রাখলেন তখন অন্ধকার এবং শীত জাঁকিয়ে বসে পড়েছে। কুয়াশা ঠেলে একটা চায়ের দোকানে এসে দাঁড়ালেন।

দোকানে চার-পাঁচজন মানুষের জটলা। ওরা সব মুড়ি দিয়ে বসে কাঠের আগুন ধিরে তাপ নিচ্ছে। গায়ে চাদর অথবা কম্বল। মাথায়-গলায় মাফলার, নয় গামছা।

দোকানে চুকে উনুনের কাছাকাছি একটা ভাঙ্গা কাঠের বেঞ্চে বসলেন প্রিয়নাথ। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দিতে এক প্লাস চা আর দুটো বিস্কুট দিতে বললেন।

প্রিয়নাথ দোকানে ঢোকামাত্রই দোকানের লোকজন কথাবার্তা থামিয়ে চুপ করে ওঁকে দেখছিল। প্রিয়নাথের চেহারা ও পোশাকে ভিন্নদেশি ভাব কটকট করছে। প্রিয়নাথের মনে হল, ওরা কেমন সতর্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে

আছে। কোনও কিছুর জন্য যেন অপেক্ষা করছে।

ঠিক এইরকম সর্তক দৃষ্টি সুনীতনারায়ণের চোখেও দেখেছেন প্রিয়নাথ। প্রমোদনারায়ণের সঙ্গে কথা বলার পরদিন সকালে সুনীতের ঘরে গিয়ে আর-এক দফা চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তাতে বিরাট কিছু লাভ হয়নি। ‘সদরিয়া’ আর ‘নেহা’ শব্দ দুটো আলোচনায় এসে পড়তেই প্রিয়নাথ জানতে চেয়েছেন, ‘তুমি সদরিয়ায় গিয়েছিলে না?’

‘হ্-হ্যাঁ...মানে...।’

‘কী করতে গিয়েছিলে?’ তীব্র স্বরে আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন ভূতনাথ।

‘ফ...ফটো তুলতে...ঘুরতে...।’ কেমন যেন ঘুম-জড়ানো গলায় বলল সুনীত।

‘সমস্তিপুর থেকে সদরিয়া’ কেমন করে যেতে হয়?’

হঠাৎই ভয় পেয়ে গেল সুনীত। ওর মুখটা চোখের প্লকে রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কাঁপা গলায় ও বলল, ‘না—না—ওখানে যাইনি। ওখানে কেউ যায় না। আসল জায়গাটা আরও ভেতরে...কেউ সেখানে যায় না...আমাকে বলতে বারণ করেছে।’

‘কে বারণ করেছে?’

ভূতে-পাওয়া মানুষেণ মতো কেঁপে উঠল সুনীত। প্রায় আঁতকে উঠে বলল, ‘ওরা...ওরা বারণ করেছে। নেহা...নেহা...।’

‘নেহা মানে কী?’ সুনীতের হাত চেপে ধরে ওর মুখের ওপরে একরকম ঝুঁকে পড়লেন প্রিয়নাথ ‘কে নেহা? কী নেহা?’

সুনীত মাথা নীচু করল। ভয়ে কাঁদতে শুরু করল। গোঙানির স্বরে বলল, ‘জানি না। আর কিছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন...পিজ...পিজ...।’

প্রিয়নাথ ওর অনুনয় আর কান্নাকে পাত্তা দেননি। নাছোড়বান্দার মতো বলেছেন, ‘তুমি কাকে ভয় পাচ্ছ? এখন তো দিনের আলো...এখন কীসের ভয়?’

সুনীত কান্না থামিয়ে ভূতনাথের দিকে সরাসরি তাকিয়েছে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তারপর বলেছে, ‘না, এখন ভয় নেই। কিন্তু দিনের পর তো রাত আসবেই...তখন? তখন ওরাই সব...ওদের গোপন

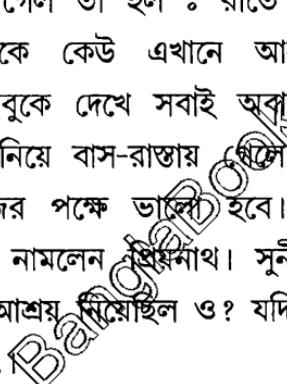
কথা আমি ফাঁস করতে পারব না। কেউ যদি নিজে থেকে জানতে পারে তা হলে ঠিক আছে। আমি কিছু বলতে পারব না—’

এরপর সুনীত মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছে।

এখন এই কুপির আলোয় বসে থাকা শীতে ঘেরা মানুষগুলোও যেন সুনীতের মতো মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। অপেক্ষা করছে।

ধোঁয়া-ওঠা চায়ের গ্লাস প্রিয়নাথের হাতে এগিয়ে দিল দোকানদার—  
সঙ্গে দুটো বিস্কুট। চায়ে চুমুক দিতে-দিতে দোকানদারের সঙ্গে একরকম জোর করেই আলাপ জুড়ে দিলেন প্রিয়নাথ। এই শীতের রাতে একটা আশ্রয় না পেলে তিনি থাকবেন কোথায়!

বহু চেষ্টা করে যেটুকু জানা গেল তা হল : রাতে থাকার জায়গা পাওয়া মুশকিল। অচেনা মানুষকে কেউ এখানে আশ্রয় দেয় না। সেইজন্যই সন্ধের সময় বাঙালিবাবুকে দেখে সবাই অবক় হয়ে গেছে। তবে এখনও সময় আছে। টাঙ্গা নিয়ে বাস-রাস্তায় ষেলে সাতটার লাস্ট বাসটা ধরা যাবে। সেটাই বাবুজির পক্ষে ভালো হবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে পথে নামলেন প্রিয়নাথ। সুনীত কি এখানে সত্যিই এসেছিল? রাতে কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল ও? যদি রাতে কোথাও থাকার জায়গা না পাওয়া যায়... 

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে প্রিয়নাথ কাঁচা সড়ক ধরে টাঙ্গা-স্ট্যান্ডের দিকে এগোচিলেন, হঠাৎই কানে এল মলের ছমছম শব্দ।

ঘুরে তাকালেন প্রিয়নাথ।

বছর তেরো-চৌদোর একটি ফুটফুটে কিশোরী। পরনে ঘাগরা, চোলি, চাদর, ওড়না। পোশাক-মলিন। তবে রূপ আছে। রাস্তার আলো কম—  
কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েটির রূপ আড়াল করা যায়নি।

প্রিয়নাথ নানা জটিল ভাবনায় ব্যস্ত ছিলেন। মেয়েটি ওঁর চোখে তাকিয়ে এমন সরল সুন্দরভাবে হাসল যে, সব দুশ্চিন্তা কোথায় মিলিয়ে গেল।

মেয়েটি বাঁ-হাতে ঝুলছে অ্যালুমিনিয়ামের একটা তোবড়ানো ক্যান।  
আর ডান হাতের মুঠোয় বেধহয় পয়সা।

ওর হাসিতে কেমন একটা ভরসা ছিল, প্রচন্দ আবাহনও ছিল যেন।

হয়তো সেই কারণেই প্রিয়নাথ ওকে জিগ্যেস করে বসলেন এখানে রাতে থাকার কোনও জায়গা পাওয়া যাবে কি না।

প্রিয়নাথের জোড়াতালি দেওয়া ভাষা মেয়েটি দিব্যি বুবতে পারল। মিষ্টি হেসে জবাব দিল, ‘কিউ নহী! জরুর মিলবে। হামার ঘর হ্যায় উধর—।’ আঙুল তুলে পশ্চিমদিকের অঙ্ককার দেখাল মেয়েটি।

দুশ্চিন্তা নিমেষে মুছে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই প্রিয়নাথ ভীষণ ক্লান্ত বোধ করলেন। ভ্রমণের ধকল তাঁকে মুহূর্তে যেন কাবু করে দিল।

মেয়েটি তাঁকে ডাকতেই প্রিয়নাথ ওর পিছু নিলেন।

মলিন আলোয় এবড়োখেবড়ো পথ ধরে শীত আর কুয়াশা ভেদ করে দুটি প্রাণী এগিয়ে চলল।

একটু এগোতেই রাস্তার আলো আর চোখে পড়ল না। ভজ্ঞ চাঁদের ঘোলাটে আলোই একমাত্র ভরসা।

গোলোকধার্ধার মতো পথ ঘুরে-ঘুরে অবশেষে একটা বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। আবছা আলো-আঁধারিতে ব্যাড়িটাকে ভৃতুড়ে অবয়ব বলে মনে হচ্ছিল।

যতটুকু বোঝা যায়, টিনের চাল দেওয়া মাটির বাড়ি। বাড়ি ঘিরে উঠোন। উঠোনে বেশ কয়েকটা কলা থাইছে, পেঁপে গাছ আর সুপুরি গাছ। উঠোনের একপাশে ধূনির আগুন ধীকধিকি জুলছে। কুয়াশার স্তর ভেদ করে আগুনটাকে ঝাপসা দেখাচ্ছে।

সামান্য বাতাস বইছিল। বাতাসে গাছের পাতা নড়ে সরসর শব্দ হচ্ছিল।

প্রিয়নাথের মনে হল, ঘুমিয়ে নিথর একটা গাঁয়ের শেষ প্রান্তের শেষ বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। বাড়িটার চারপাশে অনেকটা করে ফাঁকা জমি। আর আলো বলতে মাথার ওপরে চাঁদ, আর বাড়ির একটা জানলা দিয়ে ভেসে আসা লঠনের আলো।

প্রিয়নাথের শীত করছিল। মাফলারটা আরও ভালো করে গলায় জড়িয়ে নিলেন।

‘এই আমাদের ঘর, বাবুজি।’ মেয়েটি আলতো গলায় বলল।

প্রিয়নাথের হঠাৎই মনে হল, ওদের বাড়িতে আশ্রয় নেবেন অথচ

ଏଥନେ ଠିକମତୋ ଆଲାପ କରା ହୟନି । ମାନେ, ମେୟୋଟିର ନାମେ ଜିଗ୍ଯେସ କରା ହୟନି ।

‘ତୋମାର ନାମ କୀ?’ ପ୍ରିୟନାଥ ଜାନତେ ଚାଇଲେନ ।

ତାଁର ଦିକେ ଘାଡ଼ ତୁଳେ ତାକିଯେ ମେୟୋଟି ମିଷ୍ଟି ହେସେ ବଲଲ, ‘ନେହା—ନେହାକୁମାରୀ—’ ।

ପ୍ରିୟନାଥ ଓଇ ଶୀତାର୍ତ୍ତ ଅଁଧାରେ ଦାଁଡିଯେ ସୁନୀତନାରାୟଣେର ଭୟକ୍ଷର ଚିଂକାର ଶୁନତେ ପେଲେନ । ତାଁର ପା ଫେଲାର ଛନ୍ଦେ ଗରମିଳ ହୟେ ଗେଲ । ସୁଟକେସ୍ଟାଓ ହାତ ଥେକେ ପଡ଼େ ଯେତେ ଚାଇଛିଲ । ସମୟମତୋ ସର୍ତ୍ତକ ନା ହଲେ ସେଟାକେ ସାମଳ ଦେଓଯା ଯେତ ନା ।

କାଁଚା ଉଠୋନ ପେରିଯେ ସାମନେର ଘରଟାଯ ଢୁକତେଇ ଉଷ୍ଣତାର ଓମ ପେଲେନ ପ୍ରିୟନାଥ । ଘରେର ହ୍ୟାରିକେନେର ଆଲୋୟ ନେହାକେ ଭାଲୋ କରେ ଦେଖିଲେନ । ଏଇ ମିଷ୍ଟି ମେୟୋଟା କି ସୁନୀତେର ଭୟେ କୋନେ ହଦିସ ଦିତେ ପୋରବେ!

ଘରେ ଏକଟା ଭାଙ୍ଗ ଚେଯାରେ ଏକଜନ ବୃଦ୍ଧ ବସେଛିଲେନ । ଚାରିର୍ ମୁଡ଼ି ଦେଓଯା ଶରୀରେ ଶୁଦ୍ଧ ମାଥାର ସାଦା ଚୁଲ, ସାଦା ଗୌଫ ଆର ଛାଇ-ପଡ଼ା ଘୋଲାଟେ ଚୋଥ ନଜର ଟାନେ ।

ନେହା ପରିଚୟ କରିଯେ ଦିଲ, ବଲଲ, ଓର ବୁଝୁଜି । ତାରପର ଦେହାତି ଭାଷାଯ ଓର ବାବାକେ କୀ ଯେନ ବଲଲ । ଉତ୍ତରେ ବୁଝମୋନୁଷ୍ଟାଟି ଆଲତୋ କରେ ବାରକରେକ ଘାଡ଼ ନାଡ଼ିଲେନ ।

ନେହା ପ୍ରିୟନାଥକେ ବସିଯେ ଛୁଟେ ଭେତରେର ଘରେ ଢୁକେ ଗେଲ । ଏକଟୁ ପରେଇ ଏକଜନ ବୃଦ୍ଧା ଓ ଏକଜନ ତରଣକେ ଏକରକମ ହାତ ଧରେ ଟାନତେ-ଟାନତେ ନିଯେ ଗେଲ । ନେହାର ମା ଓ ଦାଦା ।

ବୃଦ୍ଧାର ମୁଖେର ଚାମଡ଼ାଯ ଅକାଳେ ବଡ଼ ବେଶି ଭାଁଜ ପଡ଼େଛେ । ତବେ ଚୋଥ ଦୁଟୋଯ ମାଯେର ମମତା ମାଥାନୋ । ନାକେ ରୁପୋର ନୋଲକ, କାନେ ଦୁଲ । ମାଥାଯ ଚୁଲେ ପାକ ଧରତେ ଶୁରୁ କରେଛେ ।

ନେହାର ଦାଦାର ରୋଗା କାଳୋ ଚେହାରା । ଚୋଥ ଦୁଟୋ କେମନ ଯେନ ଶୂନ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟିହିନ । କପାଳେ ଲସ୍ବା ଏକଟା କାଟା ଦାଗ । ମାବେ-ମାବେଇ କେଶେ ଉଠିଛେ—ବୋଧହୟ ଠାନ୍ଡା ଲେଗେଛେ ।

ଏକଟା ଅନ୍ତୁତ ଗଞ୍ଚ ପ୍ରିୟନାଥେର ନାକେ ଆସିଲ । ଅନେକଟା ବୁନୋ ଫୁଲେର ଗଙ୍ଗେର ମତୋ ।

আলাপের পালা শেষ হলে নেহা প্রিয়নাথের ভেতরদিকের একটা ছেট ঘরে নিয়ে গেল। বলল, ‘এ-ঘরেই আপনি থাকবেন। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন, আমি চা বানিয়ে নিয়ে আসছি।’

নেহা হাত-পা নেড়ে কথা বলছিল। ওর ভাষা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও ওর অঙ্গভঙ্গি ভূতনাথকে বুঝতে সাহায্য করছিল। নেহার সঙ্গে আলাদা কথা বলার জন্য ভূতনাথের আর তর সইছিল না।

সুটকেস খুলে দরকারি জিনিসপত্র বের করে খাটিয়ার ওপরে চাদর মুড়ি দিয়ে বসলেন ভূতনাথ। পেহার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একটু পরেই নেহা চা নিয়ে এল। প্রিয়নাথের হাতে চায়ের প্লাস ধরিয়ে দিয়ে মেঝেতে চাটাই পেতে বসে পড়ল। বুনো ফুলের গন্ধটা আবার প্রিয়নাথের নাকে এল।

‘বাবুজি এখানে কী কাজে এসেছেন?’

‘এই একটু-আধটু ঘুরে বেড়াতে...ফটো তুলতে।’ একটু থেকে আচমকা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন প্রিয়নাথ, ‘আচ্ছা, মাস দেড়-দুই অঙ্গে কোনও ছোকরা বাবু তোমাদের বাড়িতে এসেছিল? বাবুর খুব কঢ়ে তোলার শখ ছিল...।’

নেহা সরলভাবে জবাব দিল, ‘হ্যাঁ, এসেছিল। বড় রাস্তায় এদিক-ওদিক ঘুরছিল, আমিই ডেকে নিয়ে এসেছি। আমাদের বাড়িতে দু-চারদিন ছিল। এখানে আনজান আদমিকে কেউ বাড়িতে থাকতে দেয় না। কিন্তু আমরা কোনও মেহমানকে কখনও ফেরাই না। মাঝে-মাঝেই আমাদের বাড়িতে মেহমান আসে। আমি ডেকে নিয়ে আসি।’

‘সেই ছেলেটির নাম কী ছিল? সুনীত?’ প্রিয়নাথ বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাঢ় টান দিলেন।

‘নাম তো জানি না, বাবুজি।’ নেহা হাসল ফিক করে, বলল, আপনার নামও কি জানি?’

প্রিয়নাথ নিজের নাম বললেন। বললেন ফটো তোলার শখের কথা। তারপর শহরের টুকটাক গঞ্জ শোনাতে লাগলেন। চা-সিগারেট শেষ হয়ে গেল।

হঠাতে গঞ্জের মাঝে লাফিয়ে উঠে পড়ল নেহা। বলল, ‘এখন যাই, বাবুজি। দেরি হয়ে গেছে।’

ফুটফুটে প্রাণবস্ত কিশোরীটির মুখের দিকে তাকালেন প্রিয়নাথ। কীসের দেরি হয়ে গেছে! প্রিয়নাথের কপালে ভাঁজ পড়ল।

নেহা প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে থালা আর বাটিতে নিয়ে এল ঝটি ও সবজি। প্রিয়নাথের ‘ডিনার’।

মেঘেতে থালা-বাটি সাজিয়ে কাঁসার প্লাসে জল দিয়ে গেল নেহা। সঙ্গে একটা বাড়তি হ্যারিকেন। কিন্তু সেই আলোয় মলিন ঘরটা যেন আরও মলিন হয়ে উঠল। প্রিয়নাথের অস্তত তাই মনে হল।

নেহা খাওয়ার আগে বলে গেল, খাওয়া হয়ে গেলে বাসনগুলো দরজার বাইরে রেখে দিতে। আর বাবুজি যেন বাইরের উঠোনে গিয়ে হাত ধূয়ে নেন।

নেহা খুব ব্যস্তভাবে চলে গেল। বলল, ‘এখন খেতে দেয়ে শুয়ে পড়ুন—আবার কাল দেখা হবে।’

ঘড়িতে এখনও আটটা বাজেনি, অথচ শীত, অঙ্ককার, আর নির্জনতা ঘড়ির কাঁটা যেন তিন-চার ঘণ্টা এগিয়ে দিয়েছে।

খাওয়াদাওয়া সেরে হাতমুখ ধূয়ে বিছুন্ময় এসে জুত করে বসলেন প্রিয়নাথ। একটা সিগারেট ধরালেন হ্যারিকেন দুটো নিভু-নিভু করে দিয়েছেন। ফলে সিগারেটের আগুনটাই বেশ জোরালো মনে হচ্ছে।

আল্টেপৃষ্ঠে কস্বল মুড়ি দিয়ে নানান কথা ভাবছিলেন। দু-মাস আগে এখানে এসে সুনীত ঠিক কী-কী করেছিল? প্রিয়নাথ কি এখন সেই ভূমিকায় হ্বহু অভিনয় করে যাচ্ছেন? টিভিতে দেখা অ্যাকশন রিপ্লে মতো?

নেহাদের চাপা কথাবার্তা কানে আসছিল। ওরা কি এখনও শোয়নি? নেহা তা হলে অমন ব্যস্তভাবে চলে গেল কেন?

একটু পরে সিগারেট শেষ করে শুয়ে পড়লেন প্রিয়নাথ। ওঁর ক্লান্ত শরীর খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল প্রিয়নাথের।

আড়মোড়া ভেঙে দিন শুরু করতে গিয়েই বেশ অবাক হয়ে গেলেন। নেহারা কেউ বাড়ি নেই!

ওরা চারজন এই সক্কলবেলায় গেল কোথায়!

গোটা বাড়িটাই চক্র মেরে দেখলেন প্রিয়নাথ! কেউ কোথাও নেই! সবকটা দরজাই হাট করে খোলা। অথচ আসবাবপত্র, রান্নার জায়গা ইত্যাদি দেখলে মনে হয় ওরা আবার যে-কোনও মুহূর্তে ফিরে আসবে।

এককাপ চায়ের জন্য মনটা আনচান করছিল। তাই মোটামুটি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লেন প্রিয়নাথ। সঙ্গে নিলেন ক্যামেরা আর কম্পাস।

কুয়াশা কম থাকায় সূর্যের দাপট নেহাত মন্দ নয়। সামান্য ঘোলাটে দিনের আলোয় এলাকাটা আরও ভালো করে দেখলেন।

নেহাদের বাড়িটা বলতে গেলে একেবারে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে। চাষজমি আর পুরু পেরিয়ে আরও যে-দু-চারটে মাটির বাড়ি চোখে পড়ে সেগুলোতে কেউ বাস করে বলে মনে হল না। আর দুরে তাঙ্গিলে শুধু ধূ-ধূ মাঠ আর বড়-বড় গাছপালার দল। মনে হয় যেন নেহাদের বাড়িটাই লোকবসতির শেষ সীমানা।

প্রিয়নাথ আন্দাজে ভর করে এগোলেন। খানিক দুর গেলে হয়তো কাল রাতের ঘর-বাড়ি দোকানপাট চোখে পাওতে পারে।

পথে বেশ কয়েকটা ছবি তুললেন। প্রকেত থেকে কম্পাস বের করে মাঝে-মাঝেই উত্তরদিকটা দেখে নিচিতেমৈ। হঠাৎই দেখলেন, বেশ দূরে মেঠো পথ ধরে তিনজন মানুষ হেটে যাচ্ছে।

প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি পা চালাতে শুরু করলেন। একটু পরেই ওদের ধরে ফেললেন। একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। তার মধ্যে একজনের বয়েস এত কম যে, অন্যায়ে ‘মেয়ে’ বলা যায়। আর পুরুষটির হাতে একটা সুটকেস।

প্রিয়নাথ হাঁফাতে-হাঁফাতে পুরুষটিকে জিগ্যেস করলেন, ‘কোনদিকে গেলে খাবার-দাবারের দোকানপাট পাওয়া যাবে বলতে পারেন?’

লোকটি প্রিয়নাথের পোশাক-আশাক চেহারা খুঁটিয়ে মেপে নিল। তারপর বলল, ‘চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি। আমরা টাঙ্গা-স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছি—পথে দোকানপাট পড়বে।’

মেঠো পথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে লোকটির সঙ্গে আলাপ করলেন প্রিয়নাথ।

ওর নাম মহাবীর সাউ। সঙ্গে ওর বউ অম্লাদেবী, আর ছেট মেয়ে হিরাকুমারী। ও দ্বারভাঙ্গার সিধৌলি গাঁয়ে থাকে। সদরিয়ায় এসেছিল বউয়ের জড়িবুটি চিকিৎসার জন্য। এদিকে একজন ধন্বন্তরী সাধুবাবা বসেন, তাঁর কাছে। ফেরার পথে লহরিয়াসরাই-এ একটু কাজ সেরে ফিরবে—তাই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়েছে।

মহাবীরের কাছ থেকে এদিকটার খুব একটা বিশদ খবর পাওয়া গেল না। তবে ও প্রিয়নাথকে একটা চায়ের দোকানে পৌঁছে দিল। প্রিয়নাথ ওদের তিনজনের ফটো তুললেন। ওরা হাসিমুখে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

প্রিয়নাথ চায়ের দোকানে ঢুকে এক প্লাস চা নিয়ে বসলেন। ঠিক করলেন, আজ সারাটা দিন নেহাদের সম্পর্কে, সুনীতের ব্যাপারে খোঁজ নেবেন। এখানকার মানুষজন কথাবার্তায় এত সহজ সরল, অথচ অচেনা মুসাফিরকে কিছুতেই আশ্রয় দেয় না। কেন? সে কি ভয়ে? তা হলে সবাই যে-ভয় পায় নেহারা সেই ভয় প্রায় না কেমন! বরং নেহার কথা অনুযায়ী ‘আমরা কোনও মেহ্মানকে কখনও ত্যাগৰাই না। মাঝে-মাঝেই আমাদের বাড়িতে...’

সারাটা বেলা নানা জায়গায় ঘৰে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছবি তুলে কাটালেন প্রিয়নাথ। কিন্তু তাঁর অনুসন্ধান এতটুকুও এগোল না। নেহাদের কেউ চিনতেই পারল না। ওদের বাড়িটা কোন দিকে সেটা আন্দাজ করে বলা সত্ত্বেও কোনও লাভ হল না। সবাই ঠোঁট উলটে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল, আর প্রিয়নাথকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

সুতরাং, একরকম ব্যর্থ হয়েই, বেলা দেড়টা নাগাদ নেহাদের বাড়িতে ফিরলেন প্রিয়নাথ। তবে ফেরার কাজটা মোটেও সহজ হয়নি। বহু লোককে জিগ্যেস করে নানান গাছ আর বাড়ির নিশানা দেখে অবশ্যে ফিরতে পেরেছেন।

কিন্তু আশ্চর্য। নেহাদের বাড়িটা সেই সকালের মতোই একা-একা দাঁড়িয়ে আছে। ওরা এখনও বাড়ি ফেরেনি।

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা প্রিয়নাথ পথেই সেরে এসেছিলেন। এখন কোনওমতে স্নান সেরে নিয়ে নিজের ঘরে আস্তানা গড়লেন। নোটবই

বের করে তাতে আধঘণ্টা ধরে নানারকম মন্তব্য লিখলেন।

প্রিয়নাথ যখনই কোনও অভিযানে বেরোন তখনই সঙ্গে নেন তাঁর বিশেষ সরঞ্জামের থলে। এবারও সেটা সঙ্গে এনেছেন। তাতে আছে ক্যামেরা, টর্চ, প্রচুর ব্যাটারি, মোমবাতি, মার্কার, থার্মোমিটার, কম্পাস আর পেন্ডুলাম।

হঠাৎ কী মনে হওয়াতে সুটকেস খুলে থলে থেকে পেন্ডুলামটা বের করে নিলেন। সুতো ধরে ঝুলিয়ে ওটাকে দোলাতে লাগলেন। দুলুনিটা সামান্য এলোমেলো হচ্ছে বলে প্রিয়নাথের মনে হল। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ে কাঁটা দিল।

প্রিয়নাথ পেন্ডুলামটা রেখে দিলেন। দরজা বন্ধ করে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন খাটিয়ায়। মনে-মনে ঠিক করলেন, এখানে মুক্তিকদিনের বেশি তিনি আর থাকবেন না। সুনীতের ভয় পাওয়ার স্থানের কাছে হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁকে হার মানতে হবে।

সঙ্গের আঁধার নেমে আসতেই প্রিয়নাথ আরিকেন জ্বলে নিয়েছেন। মনে-মনে ভেবেছেন, নেহারা যদি নিয়ন্ত্রণে আর না ফেরে তা হলে ওদের রান্নার জায়গা হাতড়ে যা পাবেন তাই দুটো মুখে গুঁজে দিয়ে কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে দেবেন। তারপর ভোর হলেই মহাবীরের চিনিয়ে দেওয়া পথ ধরে সোজা চম্পট।

কিন্তু তার আর দরকার হল না।

সঙ্গে সাড়ে ছাঁটা নাগাদ নেহাদের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেলেন প্রিয়নাথ।

বেশ অবাক হয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাবেন, তার আগেই চঞ্চল পায়ে নেহা ঘরে এসে ঢুকল।

‘বাবুজি, ভালো আছেন?’ ওর মুখে সেই একই নিষ্পাপ হাসি।

‘তোমরা হট করে কোথায় চলে গিয়েছিলে?’

মাথা নীচ করল নেহা। তারপর অপরাধীর চোখে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বাবুজি, রাগ করবেন না। রোজ আমাদের ওরকম চলে

ଯେତେ ହ୍ୟ। ରାତ ପେରୋନୋର ଆଗେଇ ଆମରା ଚଲେ ଯାଇ...ଆବାର ଅନ୍ଧେରା ନେମେ ଏଲେ ଫିରେ ଆସି ।'

'କୋଥାଯ ଯାଓ? କୀ ଦରକାର ସେଖାନେ, ଯେ ରୋଜ ଯେତେ ହ୍ୟ!' ପ୍ରିୟନାଥ ଏକଟୁ ଯେନ ବିରଞ୍ଜନ୍ତ ହଲେନ ।

'ଆପନାର ଜନ୍ୟେ ଚା ନିଯେ ଆସି । ଏମେ ସବ ବଲଛି—' ବେଣୀ ଦୁଲିଯେ ନେହା ଚଲେ ଗେଲ ।

ମିନିଟିପାଁଚେକ ପରେଇ ନେହା ଫିରେ ଏଲ । ହାତେ ଗରମ ଚାଯେର ପ୍ଲାସ ।

ପ୍ରିୟନାଥେର ହାତେ ପ୍ଲାସଟା ଦିଯେ କାଳ ରାତରେ ମତୋଇ ମେବେତେ ବସେ ପଡ଼ିଲ । ତାରପର ଖାନିକଟା ଯେନ ବିଷଷ୍ଟ ଗଲାଯ ବଲଲ, 'ରୋଜ ଆମାଦେର ଯେତେ ହ୍ୟ, ବାବୁଜି । କେଳ ଯେତେ ହ୍ୟ ସେଟା...ଆପନି ଆଜ ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଯାବେନ ?'

ନେହାର ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଏତ ଆଚମକା ଏଲ ଯେ, ପ୍ରିୟନାଥ ସଙ୍ଗେ-ସଙ୍ଗେ କୋନ୍ତା ଜବାବ ଦିତେ ପାରଲେନ ନା ।

ନେହା ଆପନମନେ ବିଡ଼ିବିଡ଼ି କରେ ବଲେ ଚଲଲ, 'ଆମାଦେର ସଂଭାବିତେ ଯେବେ ମେହମାନ ଆସେ ତାଦେର ଆମରା ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଯାଇବା ଆମରା...ଓଥାନେ ଗେଲେ ଆପନି ଫୋଟୋ ଖିଚିତେ ପାରବେନ ।' ଶେଷ କଥାଟୀ ନେହା ବେଶ ଉତ୍ସଫୁଲ ଢାଙ୍ଗେ ବଲଲ । ଉତ୍ସାହ ନିଯେ ତାକାଳ ଭୂତନାଥେର ଦିକ୍ରି ।

ପ୍ରିୟନାଥେର ମଧ୍ୟେ କେମନ ଏକଟା ମାଝେ ଭାବ ଜେଗେ ଉଠେଛିଲ । ତିନି ଠାନ୍ଡା ଗଲାଯ ବଲଲେନ, 'ସୁନୀତବାବୁ ତୋମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଗିଯେଛିଲେନ...ଛବି ତୁଳତେ... ?'

'ହାଁ, ଗିଯେଛିଲେନ !' ଘାଡ଼ ନେଡ଼େ ବଲଲ ନେହା । କିନ୍ତୁ ପରକଣେଇ ନିଜେକେ ଶୁଧରେ ନିଯେ ବଲଲ, 'ଓହି ବାବୁର ନାମ ତୋ ଜାନି ନା—'

'ଆମି ଆଜ ତୋମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଯାବ ।'

ଚାଟାଇ ହେଡ଼େ ଉଠେ ପଡ଼ିଲ ନେହା । ଖୁଶିର ଗଲାଯ ବଲଲ, 'ଯାଇ, ମା ଆର ପିତାଜିକେ ବଲେ ଆସି । ରାତେ ଆପନାର ଖାଓଡ଼ୀ ହଲେଇ ଆମରା ବେରିଯେ ପଡ଼ିବ ।'

ଖାଓଡ଼ୀଓଡ଼ୀର ପାଟ ଚୁକିଯେ ଗାଢ଼ ଅଁଧାର ଓ ଶୀତେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରିୟନାଥ ଯଥନ ଓଦେର ସଙ୍ଗେ ବେରୋଲେନ ତଥନ ରାତ ସାଡ଼େ ନଟା ।

ଶୀତେର ସଙ୍ଗେ ଲଡ଼ାଇ କରତେ ଗିଯେ ପ୍ରିୟନାଥେର ଚେହାରା ମାପେ ପ୍ରାୟ ସୁମୋ ଯୋଦ୍ଧାଦେର କାଛାକାଛି ଗିଯେ ପୌଁଛେଛେ । ସଙ୍ଗେର ଝୋଲା ବ୍ୟାଗେ କ୍ୟାମେରା

ছাড়াও নিয়েছেন টর্চ, টর্চের ব্যটারি, কম্পাস, থার্মোমিটার, আর পেন্ডুলাম।

অঙ্ককারে কুয়াশা ভেদ করে আরও অঙ্ককার পাঁচটা ছায়া এগোচ্ছিল। সকলের আগে প্রিয়নাথ আর নেহা। পিছনে বাকি তিনজন। কারও মুখে কোনও কথা নেই। যেন শবানুগমনে চলেছে সবাই।

প্রিয়নাথ হঠাৎই হোঁচ্ট খেলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে টর্চ জ্বালিন। নেহা সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘আলো নিভিয়ে দিন, বাবুজি। আমি আপনার হাত ধরছি।’

অঙ্ককারে প্রিয়নাথের হাত ধরল নেহা।

স্পর্শে সম্মোহন করা যায় কি না প্রিয়নাথ জানেন না। আর প্রিয়নাথের যেরকম মন এবং বয়েস তাতে কিশোরী নেহাকে নিয়ে কোনওরকম অন্যায় কল্পনা তাঁর কাছে নেহাতই হাস্যকর। কিন্তু তবুও ক্ষেত্রে এক রহস্যময় কারণে নেহার হাত ছুঁতেই প্রিয়নাথ কেমন এক অলৌকিক ভরসা পেলেন।

আকাশ মেঘলা, চাঁদ দেখা যাচ্ছে না। প্রিয়নাথের ঘিরে রেখেছে গাঢ় কুয়াশার স্তর। বেশি দূর নজর চলে না। ঠাণ্ডা প্রতাস যেন বাতাস নয়—বরফ। প্রিয়নাথ জ্যাকেটের ওপরে শাল ঝুকিয়েছেন। সেটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছেন শরীরে। আড়ষ্ট সাবধানে পা ফেলছেন। অথচ নেহার চলা কত সহজ-স্বাভাবিক! এ পথ নিশ্চয়ই ওর অনেক চেনা।

বেশ কিছুক্ষণ পথ হাঁটার পর প্রিয়নাথের সময়, দিক, সবই গুলিয়ে গেল। অকারণেই একটা ভয় তাঁর মনের ভেতরে চুকে পড়তে চাইল। তিনি লড়াই করে সেটাকে চৌকাঠের বাইরে আটকে রাখলেন।

সেইরকম একটা মনের অবস্থাতেই তিনি চাপা গলায় নেহাকে জিগ্যেস করলেন, ‘নেহা, আমার কোথায় যাচ্ছি?’

‘একটু পরেই দেখতে পাবেন—’ নেহা এত অস্পষ্ট গলায় কথাটা বলল যে, বেশ চেষ্টা করে ওর কথা শুনতে পেলেন প্রিয়নাথ।

মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর নেহা আবার কথা বলল।

‘যেখান দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি, বাবুজি, বহত দিন পহেলে এখানে একটা গ্রাম ছিল। সে-গাঁয়ের নাম ছিল তিনকাহানি। তিনকাহানির শেষে ছিল বড়-বড় মাঠ, খেত। তারপরে সদরিয়া। তিনকাহানি আর সদরিয়ার

বর্ডারে আমরা থাকতাম...।'

থাকতাম! তার মনে!

'নেহা!' প্রিয়নাথ ডেকে উঠলেন। নেহার হাতটা হঠাতেই শীতের চেয়েও ঠাণ্ডা মনে হল।

'ভয় পাবেন না, বাবুজি।' বলেই নেহা প্রিয়নাথের হাতটা ছেড়ে দিল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ওর ছায়া-শরীরটা কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

'নেহা!' প্রিয়নাথ ডেকে উঠলেন আবার। পিছন ফিরে তাকালেন।

যে-তিনজন এতক্ষণ ধরে নিঃশব্দে ওঁদের অনুসরণ করছিল তারা কেউ নেই। সেখানে শুধুই কুয়াশা।

প্রিয়নাথ টর্চ জ্বাললেন। সেই আলোয় কম্পাসটা বের করে দেখলেন। উত্তরমুখী কঁটা দক্ষিণদিকে মুখ করে স্থির হয়ে আছে!

'আলোটা নিভিয়ে দিন, বাবুজি।'

নেহার গলা!

হতবুদ্ধি প্রিয়নাথ টর্চ নিভিয়ে দিলেন। কিন্তু তারপাশে কাউকে দেখতে পেলেন না।

টর্চ আর কম্পাস ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখতেই নেহা আবার কথা বলল।

'দাঁড়াবেন না, বাবুজি, চলুন—আগুন আপনার পাশে-পাশেই আছি।'

'তোমার পিতাজি-মাজি ওঁরা কোথায় গেলেন?'

অন্ধকার ভেদ করে নেহার গলা ভেসে এল : 'ওঁরা এগিয়ে গেছেন। একটু পরে আমরাও সেখানে পৌঁছে যাব।'

আন্দাজে ভর করে পা ফেলতে লাগলেন প্রিয়নাথ। তিনি পোড়খাওয়া মানুষ। তা সত্ত্বেও কিন্তু বেশ নাড়া খেয়ে গেছেন। সুনীতনারায়ণের বয়েস অনেক কম। ওর অবস্থাটা কী হয়েছিল তিনি সেটা মনে-মনে আঁচ করার চেষ্টা করলেন।

হঠাতেই শীতটা যেন বেড়ে গেল। সামনেই দেখা 'গেল একটা বিশাল পুরুর। এই গাঢ় আঁধারেও জলের কোথাও কোথাও প্রতিফলন চোখে পড়ছে। বাকি অংশটা এক অঙ্গুত কুয়াশায় ঢাকা।

পুরুরটা পেরোতেই কুয়াশা যেন ফিকে হয়ে এল। কয়েকটা ছেট-বড় গাছ চোখে পড়ল প্রিয়নাথের। গাছগুলো এপাশ-ওপাশ দুলছে। অথচ

বাতাস তেমন জোরে বইছে না। আর তখনই গাছের ওপরে গাঢ় আকাশে একটা নীল আভা দেখতে পেলেন প্রিয়নাথ। অনেকটা মা-কালীর গায়ের গাঢ়-নীল রঙের মতো।

‘নেহা—!’ ডেকে উঠলেন প্রিয়নাথ।

‘আমি আপানার পাশেই আছি, বাবুজি।’ কেমন যেন ব্যথা-পাওয়া গলায় নেহা বলল। মনে হল, ওর ভেতরে একটা কষ্ট হচ্ছে।

এমন সময় একটা শুনগুন শব্দ শোনা গেল। যেন অনেকে মিলে চাপা গলায় সুর করে গান গাইছে।

খুব নীচু পরদায় শুরু হয়ে সেই সমবেত ‘গান’ উঁচু পরদায় উঠতে শুরু করল। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও প্রিয়নাথ সেই অদ্ভুত ভাষার অর্থ বুঝতে পারলেন না। তবে সেই কোরাস ক্রমশ আকাশ-বাহুস ছেয়ে ফেলছিল।

হঠাৎই সামনে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেলেন প্রিয়নাথ।

দূরের মাঝারি গাছের মাঝে কোথা থেকে এসে যেন হাজির হয়েছে প্রকাণ এক মহীরূহ। তার ঝাঁকড়া মাথা থেকে ঝুঁটির নেমে এসেছে নীচের দিকে। কেমন অদ্ভুতভাবে হেলে গাছটা ফাঁড়িয়ে রয়েছে। আর গাছের অঙ্কার শরীরে জোনাকির মতো জুঁজে অসংখ্য লাল আলোর বিন্দু।

ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করলেন প্রিয়নাথ। অদ্ভুত গাছটা তাক করে শাটার টিপলেন। আর তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল সুনীতের তোলা ফটোগ্রাফটার কথা। এই সেই ফটোর রহস্য! কিন্তু এই গাছ দেখে ভয় পাওয়ার কী আছে!

ক্যামেরা ব্যাগে রাখতেই অদৃশ্য নেহার গলা শোনা গেল। ‘ছবি দেখে সবকুচ মালুম হবে না, বাবুজি। আরও নজরিক চলুন—।’

সন্মোহিতের মতো এগোতে লাগলেন প্রিয়নাথ। হঠাৎই একটা বাতাসের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেলেন যেন। বরফের মতো বাতাস তাঁকে ঘিরে মাথা ঝুঁড়ে মরতে লাগল। প্রিয়নাথের হাত-পা ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় যেন বুঝতে পারলেন, এখানে কম্পাস বা পেডুলাম বের করে কোনও লাভ নেই। তিনি এক অন্য জগতে অন্য ঠিকানায় পা রেখেছেন।

কোরাস গান এখনও বেশ জোরালো ঢঙে শোনা যাচ্ছিল। উঠছে, নামছে। যেন কয়েকশো মানুষ প্রাণপণে গলা মিলিয়ে সুর ধরেছে। সঙ্গে কোনও যন্ত্র-অনুষঙ্গ নেই।

হঠাৎই আকাশের নীল আভাটা নেমে এল সেই অলৌকিক গাছের গায়ে। আর তখনই প্রিয়নাথ—এতক্ষণ যা দেখতে পাননি তাই দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নাথের হাত-পা অবশ হয়ে এল। ভয়ঙ্কর শীতেও কুলকুল করে ঘেমে গেলেন। ভয়ে চিৎকার করার জন্য হাঁ করলেন, কিন্তু কোনও শব্দ বেরোল না।

অসংখ্য মানুষ জড়াজড়ি করে গাছটা তৈরি করেছে। গাছের ডালপালা নিছকই ওদের হাত-পা। নেমে আসা ঝুরি ওদের হাত, হাতের বাঁকানো আঙুল, মহিলাদের লস্বা ঝুলে পড়া চুল। উল দিয়ে বোনা স্টেয়েটারের মতো ওরা নিজেদের শরীর দিয়ে বুনে ফেলেছে এই প্রকাণ্ড শাহ। ওদের সমবেত শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে গাছটা ফুলে উঠছে, ছুঁসে যাচ্ছে। আর হাপরের মতো ফোস-ফোস শব্দে নিঃশ্বাসের ক্ষতি উঠছে। সেই বড় প্রিয়নাথের চাদর উড়ছে, চুল উড়ছে।

মানুষগুলোর চোখের কোটরে ভয়ঙ্কর হীন এক লাল আলো জুলছে— যেন জুলন্ত কয়লার টুকরো। এই চোখগুলোকেই দূর থেকে লাল আলোর বিন্দু বলে মনে হচ্ছিল। সুনীতের তোলা ফটোয় যেমন উঠেছে।

প্রিয়নাথ কখনও ভয়ের এত কাছাকাছি আসেননি। তাঁর শরীরের ভেতরটা কেমন করছিল। মাথা টলে যেতে চাইছিল বারবার।

কোরাস আর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল। সেই সঙ্গে গাঢ় নীল আলোর আভা, আর তার মাঝে উজ্জ্বল লাল বিন্দুর বাঁক যেন অলৌকিক এক সম্মোহন।

বহুদূর থেকে ভেসে এল নেহার গলা : ‘গাঁয়ে মড়ক লেগেছিল, বাবুজি। তাতে তিনকাহানির সবাই খতম হয়ে গেল। সব কাহানি খতম হয়ে গেল। সে বহুত সাল পহেলে কি বাত। তারপর থেকে আমরা...ওই গাছেই একজোট হয়ে থাকি। রোজ রাতে এসে এই গাছটা আমরা তৈরি করি। দিনের বেলা আমাদের কেউ দেখতে পায় না। আর, রাতে আমরা ইচ্ছেমতন কাউকে দেখা দিই, কাউকে দিই না। মেহমানদের সেবা করতে

আমরা ভালোবাসি। তাই পরদেশিবাবুদের মদত করি, দেখা দিই। আমরা যে রাতে এখানে এসে এমন করে থাকি সে কথা কাউকে বোলো না, বাবুজি। কিসিকো নহি বাতানা...।'

সমবেত কঠস্বর নেহার কথায় সুর মিলিয়ে ফিসফিসে গলায় বলে উঠল, 'কিসিকো নহি বাতানা...কিসিকো নহি বাতানা...।'

সে-কথায় অলৌকিক শব্দের ঝড় বয়ে গেল যেন।

'আমি এবার ওখানে যাই, বাবুজি? আমার মাজি, পিতাজি, বড়ে ভাইয়া, সবাই ওখানে ডালপালা হয়ে আছে। আমি যাই? ফির কভি মিলেঙে...।'

ফিসফিসে কোরাস আকাশ-বাতাস মাতিয়ে বলে উঠল, 'ফির কভি মিলেঙে...ফির কভি মিলেঙে...।'

প্রিয়নাথ আতঙ্কের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাহু দমবন্ধ হয়ে যেতে চাইছিল, কোনও ইন্দ্রিয়ই যেন আর কাজ কৰুছিল না। সেই অবস্থায় তিনি যে কেমন করে ছুটতে শুরু কৰুমেন কে জানে!

দিগ্ভাস্ত অবস্থায় পাগালের মতো ছুটছিলেন কখনও হোঁচট খেয়ে পড়ছিলেন। কখনও ধাক্কা খাচ্ছিলেন গাছের গুড়িতে। চশমা ছিটকে পড়ল কোথায়। হাতঘড়িটাও বোধহয় হেঁচে গেল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিলেন সদরিয়ায়।

সমস্তিপুর থেকে ট্রেনে কলকাতা ফেরার সময় প্রিয়নাথ ভাবছিলেন, এবার সুনীতনারায়ণকে সারিয়ে তোলার কাজটা অনেক সহজ হবে।





## মনের মতো বউ

‘পা’ ওয়া ভারী দুষ্কর।’ পান চিবোতে-চিবোতে মস্তব্য করলেন বরেন মল্লিক।

‘কেন, মনের মতো বউ পাওয়া দুষ্কর কেন?’ চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে জানতে চাইলেন প্রিয়নাথ।

সুপ্রকাশ পালিতের বৈঠকখানায় বসে কথা কঢ়িল। সময়টা চৈত্র মাস। সামনের বৈশাখে বরেন মল্লিক তাঁর মৃত্যু হলের বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন। তাই রোজই আনন্দবাজারের পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের পাতায় হমড়ি খেয়ে পাত্রী খুঁজছেন। আর চেনা-জানা লোকজনকেও একটি ‘ফরসা, সুন্দরী, গ্র্যাজুয়েট, গৃহকর্মে নিপুণা, বছর তেইশ-চবিশের সম্পন্ন ঘরের’ সুপাত্রী খোঁজ করার জন্য বলেছেন।

বরেন মল্লিক আড়মোড়া ভেঙে হাতের পিঠ দিয়ে গলার ঘাম মুছে বললেন, ‘এই তো একমাস ধরে হন্ত্যে হয়ে খুঁজছি। মনের মতো বউ পেলাম কই!'

বৃদ্ধ জগৎ শ্রীমানী খিকখিক করে হেসে উঠলেন, বললেন, ‘বাবা বরেন, তুমি বউ খুঁজছ, না বউমা খুঁজছ?’

এ-কথায় গন্তীর প্রকৃতির সুপ্রকাশ পালিতও হেসে ফেললেন : ‘না,

না, জগৎবাবু, বরেনবাবু বউমা খুঁজছেন—বউ নয়। তাই তো, বরেনবাবু?’

প্রশ্নটার ভেতরে একটা চাপা ঠাট্টা ছিল। বরেন মল্লিক সেটা সহজেই টের পেলেন। খানিকটা উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে জবাব দিলেন, ‘আমি রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে থাকি, রাজা নবকেষ্ট নই। দুটো বউ খোঁজার আমার মুরোদ কোথায়! আমি বলছি, ইন জেনারেল, মনের মতো বউ খুঁজে পাওয়া খুব দুঃক্ষর। সে নিজের বউই হোক, বা ছেলের বউই হোক।’

ভূতনাথ বললেন, ‘আপনার যা চাহিদা তাতে হয়তো সুপাত্রী খুঁজে পেতে আপনাকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। তবে এটা জেনে রাখুন, কেউই নিখুঁত নয়। সংসার করার সময় খুঁতগুলোকে মানিয়ে নিতে হয়।’

‘আপনি নিজে সংসারী না হয়েও সংসারের অনেক সিক্রিট খবর রাখেন দেখছি।’

ভূতনাথ খোঁচাটা গায়ে না-মেখে বললেন, ‘একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দিই, মল্লিকমশাই। মনে-মনে কারও যদি নিখুঁত মনের মতো বউয়ের চাহিদা থাকে, তা হলে তার কপালে অলৌকিক দুঃখ আছে।’

‘কেন, হঠাৎ এ-কথা বলছেন কেন?’ দুঃকাশ পালিতের চোখে কোতুহল ফুটে উঠল।

চায়ের পালা শেষ করে একটা সিগারেট ধরালেন প্রিয়নাথ। একটু সময় নিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, ‘আপনাদের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কথা হচ্ছিল...শুভ ব্যাপার। আর আমি যা বলব সেটা ঠিক শুভ নয়। এমনিতেই তো আমার বদনাম আছে, যে-কোনও আলোচনাতেই আমি ভূত-প্রেত-অলৌকিক এসব ব্যাপার টেনে আনি। আসলে আমি যা নিয়ে পড়াশোনা করেছি সেই সিলেবাসে শুধু এগুলোই ছিল। আর যে-ঘটনার কথা বলব বলে ভাবছি তার মধ্যেও আপনাদের অপছন্দের ওইসব ব্যাপার রয়েছে...।’

ভূতনাথের কথায় সবাই কেমন চুপচাপ হয়ে গেলেন। মাথার ওপরে কাঠের ব্লেডওয়লা একটা সিলিং পাখা যথাসাধ্য জোরে ঘূরছিল। শুধু তাই ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শোনা যেতে লাগল।

প্রিয়নাথের সিগারেটের ধোঁয়া পাখার বাতাসের ঘূর্ণিপাকে এলোমেলো ছুট লাগিয়ে মিলিয়ে গেল।

জগৎ শ্রীমানী শব্দ করে শ্বাস টানলেন। বরেন মল্লিক পান চিবোনো আপাতত বন্ধ করলেন। আর সুপ্রকাশ পালিত অপেক্ষা করছিলেন। ভূতনাথের কাহিনি তাঁর কাছে মদের নেশার মতো।

বরেন মল্লিক ইতস্তত করে জানতে চাইলেন, ‘ব্যাপারটা কি বউ নিয়ে?’

‘বউ নিয়ে নয়—মনের মতো বউ নিয়ে।’ আবার সিগারেটে টান দিলেন প্রিয়নাথ।

জগৎ শ্রীমানীর মুখ থেকে মজা মিলিয়ে গিয়েছিল। বেশ সিরিয়াস গলায় তিনি বললেন, ‘ব্যাপারটা কি আমরা শুনতে পারি? বরেন, তোমার নিশ্চয়ই গল্প শোনার ব্যাপারে কোন ছুচিবাই নেই?’

অন্য সবাই যখন চাইছেন তখন অ-রাজি হওয়ার কোনও ক্ষেত্রে হয় না। মুখে অনেকটা এইরকম ভাব ফুটিয়ে বরেন মল্লিক বললেন, ‘না, না, আপত্তির কী আছে?’

প্রিয়নাথ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা আশ্চর্যে গুঁজে দিলেন। তারপর চোখের চশমাটা সামান্য ঠিক করে ছুঁট করে কাশলেন। এবং বলতে শুরু করলেন।

‘ভদ্রলোকের নাম, ধরা যাক, বিশ্বাসগ্রস্তিবাবু। পদবি নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না। ওঁর সঙ্গে যখন আমার দেখা হয় তখন একটা অস্তুত ব্যাপার আমার নজরে পড়ে। ওঁর চোখের পাতা দুটো একসঙ্গে ওঠা-নামা করে না। নিজের খুশিমতো চোখের পাতা দুটো পড়ে। অর্থাৎ, আমাদের চোখের পাতাজোড়া যেমন সবসময় একসঙ্গে একই ছন্দে পড়ে, ওঁরটা একেবারেই তেমন নয়। আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সিনক্রোনাস—আর, ওঁর বেলায় অ্যাসিন্ক্রোনাস। ওঁর জীবনে একটা বাজে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তারপর থেকেই ওঁর চোখের ব্যাপারটা ওরকম হয়ে গেছে। প্রথম-প্রথম ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়ে চেষ্টাচরিত্র করেছেন। পরে শরীরের এই খুঁতুকু মেনে নিয়েছেন।’ একটু থেমে ভূতনাথ বললেন, ‘অবশ্য...মানতে ওঁর বেশ কষ্ট হয়েছে। কারণ, বিধানপতিবাবু এমনিতে আগাপাস্তালা নিখুঁত মানুষ। অস্তুত উনি তাই মনে করতেন। উনিও মনের মতো বউ চেয়েছিলেন...।’

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রিয়নাথ জোয়ারদার।

বিধানপতিবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই মুখটা বিকৃত করে ফেললেন। বিরক্তির একটা শব্দ করে বিছিরিভাবে চেঁচিয়ে বললেন, ‘চায়ে কেউ এত চিনি দেয়! চিনি তো বাজে খরচ হলই, চা-টাও মুখে দেওয়া গেল না। এরপর আবার ডায়াবেটিস হলে খরচের ফর্দ আরও লম্বা হবে। এত বছর ধরে চা করছ, চিনির আন্দাজটাও ঠিক করতে পারোনি!’

কথাগুলো এতটা চেঁচিয়ে না বললেও চলত। কারণ, বিধানবাবুর শ্রী শ্রীরাধা ডাইনিং স্পেসের লাগোয়া রান্নাঘরে তখন রান্না চাপিয়েছেন।

শ্রীরাধা কোনও জবাব দিলেন না। গত সাত বছরের অভিজ্ঞতায় শ্রীরাধা জেনে গেছেন স্বামীর এই ধরনের অভিযোগের সাফাই দিতে গেলে ওঁর বিরক্তি বেড়ে যায়—ব্যাপারটা আরও খারাপ দিকে গড়ঘূঢ়া তাই ছেট করে জবাব দিলেন—‘অখেয়ালে ভুল হয়ে গেছে।’

বিধানবাবু আরও কিছুক্ষণ চাপা গলায় গজুর-গজুর করলেন। মনে হল, ব্যাপারটা আরও খানিক গড়ালে তিনি ভিস্ট পেতেন।

চা খেতে খেতে টিভি দেখছিলেন বিধানপতি। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। টিভির দিকে চোখ রেখেই হাত বাড়ালেন কর্ডলেস ফোনের কালো হাতলটার দিকে।

এবং সঙ্গে-সঙ্গেই থমকে গেলেন।

‘এ কী! টেলিফোনের কভারটা এরকম উলটোপালটা করে কে রাখল!

শ্রীরাধা রান্না ছেড়ে ব্যস্ত পায়ে চলে এলেন ডাইনিং স্পেসে : ‘কেন, কী হয়েছে?’

‘কী আবার হবে!’ ঝাঁঝিয়ে উঠলেন বিধানপতি, ‘কভারটা কীভাবে রাখা আছে দেখেছ?’

ফোন তখনও একনাগাড়ে বেজে চলেছে।

শ্রীরাধা নরম গলায় বললেন, ‘এখনি ওটা ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি আগে ফোনটা ধরো...।’

বিধানবাবু ফোন তুলে ‘হ্যালো’ বললেন। ওঁর অফিসের বক্স সুজন

नाम न सहित



ফোন করেছে। তিনি টেলিফোনে হেসে-হেসে কথা বলতে লাগলেন। অসুবিধে হওয়াতে টিভির রিমোটটা ডাইনিং টেবিল থেকে তুলে নিয়ে টিভির ভলিউম কমিয়ে দিলেন। তারপর কর্ডলেস ফোনের হাতল নিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে টেলিফোনে কথা চালিয়ে গেলেন।

শ্রীরাধা রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিলেন আবার। রান্না করতে-করতে নিজের কপালের কথা ভাবছিলেন।

শ্রীরাধার স্বামীকে দেখে অনেকেই ওঁকে হিংসে করে। কারণ, বিধানপতির চেহারা সত্যিই পুরুষের মতো। টকটকে ফরসা গায়ের রং, সুঠাম স্বাস্থ, সুন্দর নাক-মুখ-চোখ। বয়েস বিয়ালিশ হলেও দেখে মনে হয় পঁয়তিরিশ ছেঁননি।

বিধানবাবু কোনও কাজের ভার নিলে সেটা নিখুঁতভাবে শেষ করেন। কথা দিয়ে কথা রাখতে ভালোবাসেন। সময় ও নিয়ম মেনে চলাফেরা করা ওঁর আদর্শ।

বিয়ের সময় বিধানপতির সবকিছুই ভালো জেগেছিল শ্রীরাধার। কিন্তু তারপর ধীরে-ধীরে জানতে পেরেছেন ওঁচবিশ ঘণ্টা অভিযোগের স্বভাব, আর খুঁটিয়ে জরিপ করে দেখতে পেয়েছেন ওঁর ফরসা কপালে তিনটে বিরক্তির ভাঁজ।

এমনিতে দোষটা হয়তো খুব মারাঞ্চক নয়, কিন্তু শ্রীরাধা যেন মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে ওঠেন। ওঁর দম বন্ধ হয়ে আসে। শরীরটা হাঁসফাঁস করতে থাকে।

ইদানীং শ্রীরাধার ব্লাড প্রেসারও খুব মাথাচাড়া দিয়েছে। প্রথমবার স্বামীকে যখন হাই প্রেসারের ব্যাপারটা আঁচ করার কথা বলেন, তখন যথেষ্ট যত্ন করে তাঁর মেডিকেল চেক-আপের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন বিধানপতি। তবে পথে যেতে যেতে ওঁকে আলতো গলায় বলেছেন, ‘তোমাদের ফ্যামিলিতে নিশ্চয়ই হাই প্রেসারের ধাত আছে। তোমারটাও হয়তো বিয়ের আগে থেকেই ছিল।’

মাথায় আগুন জলে গিয়েছিল, কিন্তু শ্রীরাধা কোনও জবাব দেননি। রাস্তার মাঝে বিশ্রী তর্কে ঢুকে পড়তে ওঁর মন চাইছিল না।

এরকম ছোট-ছোট ঘটনার চাপে শ্রীরাধা দিনকে-দিন যেন কাহিল হয়ে পড়েছেন। মাথাটা সবসময় কেমন পাগল-পাগল লাগে।

এই তো, একটু আগেই যে-মানুষটা চায়ের চিনি আর টেলিফোনের কভার নিয়ে অমন বিছিরিভাবে অভিযোগ করল এখন সেই মানুষটাই টেলিফোনে দিব্যি হেসে-হেসে কথা বলছে!

মানসিক চাপে অবসন্ন হয়ে কখনও কখনও আত্মহত্যার কথাও ভেবেছেন শ্রীরাধা। কিন্তু তখনই ওঁর মায়ের মুখটা ভেসে উঠেছে ঢোকের সামনে, তার পাশে অসহায় ছোট বোনের মুখ। শ্রীরাধা আর এগোতে পারেননি।

একদিন রাতে তর্ক অনেকটা এগিয়েছিল। কারণ শ্রীরাধা ওঁর মা-হতে না-পারা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই একটা ব্যাপারে বিধানপত্রিকা কখনও কোনও অভিযোগ করেননি। শ্রীরাধার ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য জেদও ধরেননি। কাবণ, তিনি বোধহয় ভেতরে-ভেতরে জনতেন গোলমালটা কোথায় হতে পারে। তাই তীব্র কোণঠাসা হয়ে পড়লে শ্রীরাধা কখনও-কখনও এই অস্তিকর প্রসঙ্গ তুলে বিধানপত্রিকার খোঁটা দিতে চাইতেন।

এইরকম টালমাটাল দিনযাপনের মাঝে একদিন দেওয়ালে মাথা ঠুকে কাঁদতে-কাঁদতে শ্রীরাধা বলেছেন, ‘তুমাঙ্গি এই নিত্য অভিযোগের ঠেলায় কোনদিন অফিস থেকে ফিরে দেখবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে আছি।’

উত্তরে বিধানপতি ঠাণ্ডা গলায় বলেছেন, ‘আলমারির ওপরে রাখা আমার ওই নাইলনের দড়ির বাণিলে যেন হাত দিয়ো না! আর সিলিং ফ্যানের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলে পোড়ো না—পাখার ব্রেড ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। তারপর তো আবার থানা-পুলিশের ঝঝঝাটে দু-চারদিন অফিস কামাই হয়ে যাবে।’

স্বামীর এই নির্লিপ্ত উত্তরে শ্রীরাধা খুব ধাক্কা খেয়েছিলেন। তর্ক থামিয়ে একেবারে চুপ করে গিয়েছিলেন।

বিধানপতির অভিযোগের স্বেচ্ছা অবিরাম চলতে থাকল। সোয়েটারটা তিনদিন ধরে কাচা হচ্ছে না কেন? জুতোর কালি জায়গা মতো নেই কেন? বাথরুমের কল ঠিকমতো বন্ধ করা হয়নি কেন? সরবের তেল তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল কেন? ইস্টিরির তারটা ঠিকমতো গুছিয়ে রাখা

হয়নি কেন? ফ্রিজের গায়ে এই দাগ কোথা থেকে...। ওঁর খুঁত ধরার আর শেষ নেই!

একদিন শ্রীরাধা মাথা গরম করে বলে বসলেন, ‘খুঁত তো তোমারও আছে! আমি বললেই তুমি সেটা সারিয়ে ফেলতে পারবে? আমারগুলো আমি কিন্তু চেষ্টা করলেই সারাতে পারি। হঁ...’ শেষের শব্দটার মধ্যে এমন তীব্র এক তাছিল্য আর ঘৃণা মেশানো ছিল যে, বিধানপতি স্তুতিত হয়ে গেলেন। কয়েক সেকেন্ড কোনও জবাব দিতে পারলেন না।

তারপর কোনওরকমে থতিয়ে থতিয়ে বললেন, ‘আমার ডিফেন্টের ব্যাপারটা তো এখনও মেডিক্যাল কনফার্মড হয়নি। তা ছাড়া এই ডিফেন্ট কি বাইরে থেকে দেখা যায়?’

শ্রীরাধা উত্তরে বিধানপতির কানে গরম সীসে ঢেলে দিলেন। মুখে আনা যায় না এমন নোংরা ভাষায় জবাব দিলেন স্বামীকে। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, ‘গোপন খুঁত হলেই তাৰ স্বাত খুন মাপ!’

বিধানপতি এ-অপমান ভুললেন না। তাই পরদিন থেকে স্ত্রীকে কথায়-কথায় অভিযোগ আর অপমানে ক্ষতবিক্ষত ক্ষমতে লাগলেন। শ্রীরাধার মনে হল, ওঁর শরীরের দগদগে ঘায়ের ক্ষতিগ্রস্ত গরম লোহার শিক গুঁজে দিয়ে কেউ যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কিছু ঘুঁজেছে। যন্ত্রণায়-যন্ত্রণায় তিনি পাগল হয়ে গেলেন। যা-নয়-তাই করতে মন চাইল বারবার। মায়ের মুখ, ছোট বোনের মুখ মুছে যেতে চাইল চোখের সামনে থেকে।

একদিন সন্ধের আগে অফিস থেকে ফিরে বারবার কলিং বেল বাজিয়েও বিধানপতি শ্রীরাধার কোনও সাড়া পেলেন না। তখন পকেট থেকে চাবি বের করে সদর দরজার নাইটল্যাচে গুঁজে মোচড় দিলেন। দরজা তাও খুলল না।

বিধানবাবু বেশ অবাক হয়ে গেলেন। কারণ, শ্রীরাধা এ-সময়ে কখনও বাইরে যায় না।

দরজায় আবার ধাক্কা দিলেন। তবুও কেউ দরজা খুলল না।

যখন বিধানবাবু ভাবছেন দরজা ভাঙার জন্য লোকজন ডাকবেন কি না, ঠিক তখনই ভেতর থেকে কেউ দরজা খুলে দিল।

শ্রীরাধাকে দেখতে পেলেন বিধানপতি। কিন্তু শ্রীরাধা কোনও কথা না

বলে ঘুরে চলে গেল বাড়ির ভেতর দিকে।

ভেতরে চুকে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলেন বিধানবাবু। তারপর শ্রীরাধার ওপরে বিরক্ত হয়ে শোওয়ার ঘরে চলে গেলেন। অফিসের জামাকাপড় ছাড়তে শুরু করলেন।

সেখান থেকেই রান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি। শুনে একটু অবাক হলেন; এত তাড়াতাড়ি তো রান্না শুরু করেন না শ্রীরাধা!

ডাইনিং স্পেসের বেসিনে হাত-মুখ ধূতে এসে বিধানপতি দেখলেন, ডাইনিং টেবিলে ধোঁয়া-ওঠা গরম চা আর তার পাশেই প্লেটে দুটো বিস্কুট। এটা ঠিকই, তিনি অফিস থেকে ফিরে এসে রোজ চা-বিস্কুট খান। কিন্তু চোখের পলকে চা তৈরি হল কেমন করে!

হাত-মুখ ধূয়ে রান্নাঘরে উঁকি মেরে তিনি সে-কথাই জিগেছেন করলেন শ্রীরাধাকে।

শ্রীরাধা একটা গোলাপি শাড়ি পরে রান্না করছিলেন স্বামীর কথায় ফিরে তাকালেন না। শুধু অস্পষ্টভাবে বললেন, ‘তার যখন হয়ে গেছে তখন খেয়ে নাও।’

বিধানপতি আন্দাজ করলেন, কোনও ক্ষয়ে শ্রীরাধা রেগে আছেন। তাই কথা না-বাড়িয়ে চা খেতে ক্ষয়ে গেলেন।

চায়ের কাপে দু-চার চুমুক দেওয়ার পরই হঠাৎ ওঁর মনে হল কলতলায় কাপড় কাচার শব্দ হচ্ছে। এ-বাড়িতে কোনও কাজের লোক নেই। শ্রীরাধা রান্নাঘরে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। তা হলে কাপড় কাচছে কে!

চায়ের কাপ ফেলে রেখে উঠে পড়লেন বিধানবাবু। ভুরু কুঁচকে এগোলেন কলতলার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে দেখেন একটা আকাশি শাড়ি পরে শ্রীরাধা স্বামীর জামাকাপড় কাচছেন।

বিধানবাবু অবাক হয়ে বলে উঠলেন, ‘কী ব্যাপার! তুমি না এক্ষুনি গোলাপি শাড়ি পরে রান্না করছিলে!?’

কলতলার মেঝেতে উরু হয়ে বসে শ্রীরাধা কাপড় কাচছিলেন। ঘাড়-কাত করে তাকালেন স্বামীর দিকে। হেসে বললেন, ‘রান্না তো এখনও করছি।’

বিধানপতি কেমন যেন বিমুচ্ছাবে ছুটে এলেন ডাইনিং স্পেসে। রামাঘরে উঁকি মারতে সাহস পেলেন না। কিন্তু শুনতে পেলেন শ্রীরাধা কড়াইয়ে খুন্তি নাড়ছেন।

কী করবেন ভাবছেন, ঠিক তখনই বিধানবাবু দোতলার ছাদে পায়ের শব্দ পেলেন। ছাদে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাতে এত জোরে-জোরে শব্দ হচ্ছে কেন!

পাগলের মতো ছাদে ছুটে গেলেন বিধানপতি। গিয়ে যা দেখলেন তাকে কোনও কিছু দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না।

শ্রীরাধা ভেজা জামাকাপড় তারে ছড়িয়ে ক্লিপ আঁটছেন। পরনে একটা সবুজ ছাপা শাড়ি।

হতবাক বিধানপতি বউকে জিগ্যেস করলেন, ‘এর মধ্যেই তোমার কাচাকুচি হয়ে গেল! শাড়িটাই বা বদলে নিলে কখন?’

স্বামীর দিকে চেয়ে হাসলেন শ্রীরাধা : ‘আকাশি শাড়ি পরে কাপড় তো এখনও কাচছি! তোমাকে খুশি করতে হলে একটা নয়—চার-চারটে শ্রীরাধা দরকার।’

‘কীসব বলছ তুমি। চারটে শ্রীরাধা দরকার! তার মানে! এসব কী ব্যাপার! আমি তো কিছুই বুঝতে পারুঁ না!’

উত্তরে তিনি নম্বর শ্রীরাধা হাসলেন আবার। বললেন, ‘চার নম্বর শ্রীরাধা ছাদের ওই কোণের দিকটায় আছে। ওকে দেখলেই সব বুঝতে পারবে।’

তৃতীয় শ্রীরাধার কথা মতো ছাদের কোণের দিকটায় এগিয়ে গেলেন বিধানপতি। সেখানে চতুর্থ শ্রীরাধাকে দেখতে পেলেন। ওঁকে দেখামাত্রই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেল।

এই শ্রীরাধার দেহটা অগোছালোভাবে পড়ে রয়েছে। গলার নলী ফাঁক হয়ে সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। কয়েকটা মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। ওঁর পরনের হালকা হলুদ শাড়িতে রক্তের বিশ্রী ছোপ। অথচ ছাদে কোথাও রক্ত নেই। কারণ, মৃতদেহের চারপাশটা কেউ সুন্দর করে ধূয়ে-মুছে সাফ করে দিয়েছে।

সুতরাং, অভিযোগ করার মতো কিছুই পেলেন না বিধানপতি।

হঠাতেই শ্রীরাধার মৃতদেহ চোখ খুলে তাকাল বিধানবাবুর দিকে। ফ্যাকাসে ঠোঁট ফাঁক করে কথা বলল, ‘ছুরিটা ধুয়ে মুছে আলমারিতে আগের মতো সাজিয়ে রেখে দিয়েছি। আলমারির চাবি আমার কোমরে গেঁজা আছে।’

বিধানপতি একটা ভয়ঙ্কর চিংকার করে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন।

তখন সঙ্গের অঁধার গুড়ি মেরে নেমে আসছিল। বাতাস যেন হঠাতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আশপাশের গাছ-গাছালির একটা পাতাও নড়ছিল না।

আর, তৃতীয় শ্রীরাধা তখনও কাপড় শুকোতে দিচ্ছিলেন।

প্রিয়নাথ থামলেন।

ঘরে কোনও কথা নেই। আড়তার পরিবেশ কেমন ~~হল্কা~~ নষ্ট হয়ে গেছে।

প্রায় ফিসফিসে গলায় সুপ্রকাশ পালিত জিগলে করলেন, ‘তারপর কী হল?’

বিষম হাসলেন প্রিয়নাথ। মাথা নীচু করে আঙুলের নখ খুঁটলেন কয়েকবার। তারপর সামান্য কেশে বললেন, ‘শ্রীরাধার মৃত্যুর তদন্ত করতে পুলিশ এসেছিল। তারা বিধানপতিকে জেরা করে-করে একেবারে জেরবার করে দিল। পুলিশের বক্তব্য খুব পারস্কার ছিল। শ্রীরাধা মোটেই আত্মহত্যা করেননি। কারণ, ওইভাবে গলা কেটে দু-ফাঁক করার পর কেউ একমিনিটও বেঁচে থাকতে পারে না। তা ছাড়া সুইসাইডের অস্ত্রটা তো বড়ির কাছেই পড়ে থাকবে। ওটা তো আর ডানা মেলে আলমারিতে ঢুকে পড়তে পারে না! তার ওপর ছাদের রক্ত কে ধুয়ে-মুছে সাফ করল? ছুরিটাই বা কে ধুয়ে রাখল? আলমারিতে চাবি দিয়ে সেই চাবি শ্রীরাধার কোমরেই বা কে গুঁজে রাখল?

‘বিধানবাবু পুলিশকে পুরো ঘটনাটা জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই পুলিশ ওঁর কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। বাড়িতে ওঁরা স্বামী-শ্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না। তা হলে তৃতীয় কোনও মানুষ শ্রীরাধাকে

এইরকম রহস্যময়ভাবে খুন করে চম্পট দিয়েছে—একথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।

‘কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিধানবাবুকে ছেড়ে দিল দুটো কারণে। এক : সারা বাড়িতে তন্ত্র করে খুঁজেও বিধানবাবুর কোনও রক্তমাখা জামাকাপড় পাওয়া যায়নি। দুইঃ ঘটনার দিন রাত নটা নাগাদ পাড়ার লোকজন যখন দরজা ভেঙে বিধানবাবুর বাড়িতে ঢেকে তখনও তিনি ছাদে মৃতদেহের কাছে অঙ্গান হয়ে পড়েছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত পুলিশ কেসটাকে “আনসল্ভড” হেডিং দিয়ে ফাইল বন্ধ করে দেয়।

‘ওই দুঘটনার পর থেকে বিধানপতিবাবুর মাথাটা একটু-আধটু গোলমেলে হয়ে যায়। আর চোখের পাতার ওঠা-পড়া ওরকম এলোমেলো হয়ে যায়। ওঁর এই খুঁতটা কিন্তু আর গোপন নয়—বরং সবসময় সকলেই চোখে পড়ে। বহু ডাক্তার এই খুঁত সারানোর চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে। বিধানপতি মনে করেন, এটা শ্রীরাধার অভিযন্ত...’

প্রিয়নাথ একটু থমতেই বরেন মল্লিক প্রশ্ন করলেন, ‘বাকি তিনজন শ্রীরাধার কী হল?’

প্রিয়নাথ সঙ্গে-সঙ্গে কোনও জবাব না দিলেও একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রহস্যময় হেসে বললেন, ‘আমি কী জানি! আপনারাই বলুন—।’





## আঁধারে মায়ার খেলা

**প্রিয়নাথ** বসবার ঘরে চুকতেই ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা সোফা ছেড়ে  
উঠে দাঁড়ালেন।

সৌজন্য দেখিয়ে হাতজোড় করে প্রিয়নাথ বললেন, ‘সঁরি, আপানাদের  
অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। আসলে এ-সময়টা আমি পুজো করি।’

‘না, না—তাতে কী আছে?’ ভদ্রলোক হেসে বললেন, ‘আমরাই আধঘণ্টা  
আগে চলে এসেছি।’

ওঁরা সোফায় বসে পড়লেন আবার। প্রিয়নাথও বসলেন।

ভদ্রমহিলা খানিকটা কৌতৃহল নিয়ে জানতে চাইলেন, ‘আপনি...আপনি  
ঠাকুর মানেন?’

হাসলেন ভূতনাথ। পকেট থেকে সিগারেট অর্থাৎ লাইটার বের করে  
বেশ সময় নিয়ে সিগারেট ধরালেন। তারপর লাইটার পকেটে রেখে জড়ানো  
গলায় বললেন, ‘দুটোতেই বিশ্বাস করি, ঘ্যাঙ্গাম।’

‘দুটো মানে?’ এবার ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

‘বুঝে নিন—।’ রহস্যময় হাসলেন ভূতনাথ।

আজ সকালে ওঁরা—মানে এই ভদ্রলোক—প্রিয়নাথকে ফোন করেছিলেন।  
ওঁদের বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, তাই ভূতনাথের পরামর্শ চান।

রেফারেন্স হিসেবে ভদ্রলোক এ-পাড়ার শান্তি কমিটির সেক্রেটারি বিজন সরকারের নাম করেছিলেন।

প্রিয়নাথ ওঁকে সঙ্গে সাতটায় আসতে বলেছিলেন। কিন্তু ওঁরা সাড়ে ছ'টা নাগাদ এসে পড়েছেন। প্রিয়নাথ তখন পুজো করেছিলেন। রোজ সকাল-সঙ্গে ঠাকুরের আসনের সামনে বসে পুজো করা ওঁর বহু বছরের অভ্যেস।

দরজা খুলে ওঁদের বসতে বলে প্রিয়নাথ আবার অসমাপ্ত পুজোয় ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর পাজামার ওপরে একটা শার্ট চাপিয়ে ওঁদের সামনে এসেছেন।

ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা নিজেদের পরিচয় দিলেন।

ভদ্রলোকের নাম প্রমথেশ নাহা, সঙ্গে ওঁর স্ত্রী মাধুরী। এঁর দমদম স্টেশনের কাছে ঘূঘুডাঙ্গায় থাকেন।

কিছুদিন ধরে ওঁরা ওঁদের এক বছরের মেয়েকে নিয়ে অদ্ভুত এক সমস্যায় পড়েছেন।

প্রিয়নাথ ওঁদের দেখেছিলেন।

পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েসি প্রমথেশের মাঝায় কোঁকড়ানো চুল। তাতে কোথাও-কোথাও পাক ধরেছে। সোনালি মেটাল ফ্রেমের চশমা। ফরসা কপালে-দু-তিনটে ভাঁজ। গেঁফ কলপী করা। পোশাক-আশাকে উচ্চবিন্দুর ছাপ। জামার বুকপকেট থেকে মোবাইল ফোন উঁকি মারছে।

মাধুরী দেখতে সাধারণ হলেও রুচিসম্মত পোশাক পরেছেন। সাজগোজ চড়া মাপের নয়। বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলে চকোলেট রঙের নেলপালিশের ছোঁয়া। কপালে-সিঁথিতে প্রথাগত সিঁদুর—যা আজকাল খুব কম চোখে পড়ে।

হালকা পারফিউমের গন্ধ প্রিয়নাথের নাকে আসছিল। কিন্তু সেটা প্রমথেশ না মাধুরীর শরীর থেকে—সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

প্রিয়নাথ বুঝতে পারছিলেন, বাইরে ওঁরা শান্ত ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করলেও ভেতরে-ভেতরে বেশ উদ্বিগ্ন। হয়তো মেয়েকে নিয়েই।

সিগারেটে টান দিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, ‘আপনাদের কথা শুনছি। আগে দোকানে একটু চা বলে আসি—’ উঠে দাঁড়ালেন, হেসে যোগ করলেন,

‘আমার চা-পাতা ফুরিয়ে গেছে।’

প্রমথেশ হাত নেড়ে ভূতনাথকে বাধা দিলেন : ‘কোনও প্রয়োজন নেই, মিস্টার জোয়ারদার। আমরা চা খেয়েই এসেছি। আপনি নিশ্চিন্তে বসুন। বসে আমাদের প্রবলেমটা কাইভলি শুনুন।’

মাধুরীর চোখ ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সর্বত্র ছফছাড়া ছাপ। বোৰাই যায়, এ-আন্তানার মহিলার ছোঁয়া পড়ে না। সোফা-টেবিল-চেয়ার সবই বেহাল। একপাশে দেওয়াল-তাকে গাদা-গাদা বই। সেই বইয়ের ঢল বর্ষার জলের মতো এলোমেলোভাবে নেমে এসেছে টেবিলে, সেখান থেকে গড়িয়ে মেঝেতে। তারপর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে গেছে। বইগুলোকে বাঁচাতে মেঝেতে অবশ্য একটা পুরোনো বেডশিট ভাঁজ করে পাতা আছে।

মাধুরী অবাক চোখে মাঝবয়েসি প্রিয়নাথকে দেখছিলেন। এই সাধারণ মানুষটা কি ওঁদের অসাধারণ সমস্যা থেকে বাঁচাতে পারবে?

হঠাতে কী মনে হওয়াতে প্রিয়নাথ প্রমথেশবাবুকে সিগারেট আঞ্চলির করতে গেলেন। কিন্তু স্থিত হেসে প্রমথেশ বললেন, ‘ব্যস্ত হুন মুস। আমার কাছে আছে—তবে আমি আজকাল একটু কম শ্বেক করছি।’ মাস আস্টেক আগে আমার একটা ছোট স্ট্রোক মতন হয়ে গেছে।

‘যাকগে, এবার কাজের কথায় আমি আমার কম্পিউটারের ব্যবসা আছে। “এন-কম্পিউটার” নামে একটা ব্র্যান্ডও চালু করেছি। ক্যামাক স্ট্রিটে আমার অফিস। আর ফ্যান্টির দ্বিতীয়—বাড়ির কাছাকাছি। রিসেন্টলি আমি সফটওয়্যার ডেভেলাপমেন্টেও হাত দিয়েছি। আমার কোম্পানিতে সাতজন বি. ই., বি. টেক., এন্জিনিয়ার কাজ করে।

‘এতসব কথা বলার কারণ—আমি টেকনোলজির লোক, ভূত-প্রেতে এক ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বাস আমার নেই। যে-জিনিসের অস্তিত্বই নেই তার ওপর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নাই তো হাস্যকর। কিন্তু...’ প্রমথেশের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, ‘কিন্তু গত একমাস ধরে আমার ধরণটা চিড় খেয়ে গেছে। আমি পাজল্ড হয়ে গেছি।’

প্রিয়নাথ আগ্রহ নিয়ে শুনছিলেন। পাশের ঘরের ঠাকুরের আসন থেকে ধূপের গন্ধ ভেসে আসছিল। ঠুনঠুন ঘন্টি বাজিয়ে সামনের রাস্তা দিয়ে একটা টানা-রিকশা চলে গেল। তারপরই মালাইবরফওয়ালার সুরেলা হাঁক

শোনা গেল।

‘ব্যবসা দাঁড় করাতে গিয়ে আমি বিয়ে করার ব্যাপারে বেশ লেট করে ফেলেছি, মিস্টার জোয়ারদার। তাই এ-বয়েসে পৌঁছেও আমাদের একটিমাত্র ইস্যু—মাত্র এক বছরের একটি মেয়ে। নাম প্রথম। তবে আমরা মাস্পি বলে ডাকি।

‘আমাদের প্রবলেমটা মাস্পিকে নিয়েই...।’ ঘরের সিলিংয়ের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে শেষ কথাটা বললেন প্রমথেশ। তারপর : ‘আমাদের নিজের বাড়ি। বাবা প্রায় ন’বছর আগে এক্সপায়ার করেছেন। আর মা মারা গেছেন মাত্র মাসতিনেক আগে। বাড়িতে এখন আমরা তিনজন—আর আমার একমাত্র বোন সাবিত্রী আমাদের কাছে থাকে। সাবিত্রী উইডো। ওর হাজব্যান্ড আর্মিতে ছিল—এনকাউন্টারে বছর চারেক আগে মারা গেছে।

‘আমি বিজনেসের কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকি। মাধুরী আর সাবিত্রীই সবকিছু দেখাশোনা করে। মাস্পি ওদের দু-চোখের মুখে মাধুরী মা—ওর তো টান থাকবেই। তবে সাবিত্রীর টান ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি—’ আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন প্রমথেশ।

প্রিয়নাথের মনে হল না স্বামীর কথায় মাধুরী অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

একটু থেমে প্রমথেশ আবার বললেন মাস্পিকে সারাটা দিন ওরা দুজনে আগলে-আগলে রাখে। কিন্তু এত আগলে রেখেও শেষ রক্ষা হয়নি। মাস্পি মনে হয় কোনও বিপদে জড়িয়ে গেছে। আর সেই সঙ্গে আমাদের প্রত্যেককেও জড়িয়ে ফেলেছে।’

‘এইটুকু মেয়ে আবার বিপদে জড়াবে কেমন করে! অবাক হয়ে বললেন ভূতনাথ।

চোখ নামালেন প্রমথেশ। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে তারপর স্ত্রীর দিকে তাকালেন : ‘এবারে তুমি বলো—আমি একটু আনইজি ফিল করছি...।’

মাধুরী একটু কেশে নিলেন, প্রিয়নাথ এবং স্বামীকে একপলক করে দেখলেন, তারপর বেশ নীচু গলায় বলতে শুরু করলেন, ‘আমাদের মেজের প্রবলেম হল মাস্পি হঠাতে কথা বলতে শুরু করেছে। আপনি তো জানেন, এক বছর বয়েসের বাচ্চার পক্ষে কথা বলাটা কীরকম অস্বাভাবিক! মাসখানেক আগে একদিন হঠাতে মাস্পি কথা বলতে শুরু করে। তখন প্রায়



মাঘরাত্তির। আচমকা এক অস্থিতিতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, আর তখনই শুনি মাস্পি কথা বলছে।'

'কার সঙ্গে?'

'প্রথমটা মনে হয়েছিল বোধহয় আপনমনে কথা বলছে। আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ওর ঘুম ভাঙ্গই—' ইশারায় স্বামীর দিকে দেখালেন মাধুরীঃ 'তারপর অঙ্ককারে চুপটি করে আমরা মাস্পির কথা শুনতে থাকি। কিছুক্ষণ শোনার পর বুঝতে পারি, ও আপনমনে কথা বলছে না—কারও সঙ্গে কথা বলছে।

'একটু পরে আমি ভয় পেয়ে গিয়ে ঘরের আলো জ্বলে দিই। আলো জ্বালতেই দেখি মাস্পি চোখ বুজে আঘোরে ঘুমোচ্ছে। সেই অবস্থাতেই ওর ঠোট নড়ে উঠল। ও বলল, 'আলো নিভিয়ে দে—অসুবিধে হচ্ছে' তক্ষুনি আমি আলো নিভিয়ে দিই। তার মিনিটকয়েক পর মাস্পির ক্ষয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর পরদিন সকাল থেকেই ও আবার স্বাভাবিক সেই দু-একটা আধো-আধো কথাঃ মা...বা...পিচি...এইরকম। তাস্পৰ...।'

হঠাৎই পাখির ডাকের শব্দে প্রমথেশের ফ্রেন্টাল ফোন বেজে উঠল।

প্রমথেশ পকেট থেকে ফোন বের করে ক্ষয়া বললেন। ব্যবসার কাজের ফোন। সংক্ষেপে কথা শেষ করে প্রতিশ্রুতি বললেন, 'এখন আমাকে ফোন করে ডিস্টার্ব কোরো না। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে জরুরি কথা বলছি।'

প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে আলতো গলায় 'সরি' বলে সেলফোনটা বুকপকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

আগের কথার খেই ধরে মাধুরী আবার বলতে শুরু করলেন।

'তারপর—দু-চারদিন সবে কেটেছে—মাস্পি আবার ওইরকম কথা বলল। সেদিকের কথায় স্পষ্ট বোৰা গেল ও কারও সঙ্গে কথা বলছে। আর মাঝে-মধ্যেই প্রথমদিনের মতো তুই-তোকারি করে মন্তব্য করতে লাগল। তখনও আমরা বুঝতে পারিনি মাস্পি ঠিক কাকে তুই-তোকারি করছে—ওকে, না আমাকে। সেটা বোৰা গেল আরও কিছুদিন পর।

'একদিন রাতে ওইরকম কথা বলতে-বলতে হঠাৎই ও বলল, 'পিনু যে লুকিয়ে নন্দা নামে ইঙ্গুলের ওই দিদিমণির সঙ্গে প্রেম করে সে আমি বহু আগেই টের পেয়েছি।' এ-কথা শুনে ও একেবারে চমকে

উঠল—’ প্রমথেশের দিকে ইশারা করলেন মাধুরী। তারপর মাথা সামান্য হেঁট করে বললেন, ‘পিনু আমার হাজব্যাণ্ডের ডাক নাম।’

প্রিয়নাথ সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন। কয়েকবার ঘন-ঘন টান দিয়ে সিগারেটটা শেষ করে ফেললেন। সিগারেটের টুকরোটা টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে ভুক্ত কুঁচকে জিগ্যেস করলেন, ‘মাস্পি কি তা হলে ওই ঘোরলাগা অবস্থায় আপনার শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলে?’

উত্তরে শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রমথেশ। বেশ হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, ‘হ্যাঁ—ঠিকই ধরেছেন। কারণ, বয়েসকালে নন্দা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ইয়ে—মানে, একটা অ্যাফেয়ার ছিল। মেয়েটি পাড়ার করপোরেশন স্কুলে পড়াত। একেবারেই ছেলেমানুষি ব্যাপার।’ বিষণ্ণ হাসলেন প্রমথেশ : ‘কী বলব বলুন! মাস্পি এই টাইপের আরও প্রিয়ে এমন-এমন কথা বলছে যে, মাধুরীর সঙ্গে আমার রিলেশানটাই বিস্তার যাচ্ছে। আপনিই বলুন, এইসব পুরোনো ইস্যুর জের টেনে অশাস্ত্র করার কোনও মানে হয়! নিজেকে আমার ভীষণ অকওয়ার্ড লাগছে। একে তো বিজনেসের টেনশান—তার ওপরে এই বাড়তি অশাস্ত্র। বুলন্তি তো কার ভালো লাগে!’

এ-ধরণের কথায় প্রিয়নাথ অস্বস্তির মধ্যে প্রচলিত যাচ্ছিলেন। তাই লৌকিক ব্যাপার থেকে অলৌকিক প্রসঙ্গ ফিল্মজগ্নে নিয়ে এলেন।

‘তার মানে আপনার মায়ের প্রেতাত্মা আপনার মেয়েকে ডিস্টাৰ্ব করছে?’ প্রমথেশকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন প্রিয়নাথ।

‘এ ছাড়া আর কী বলব বলুন! অস্বীকার করার তো কোনও পথ নেই...।’

‘আপনার মা মাস্পিকে খুব ভালোবাসতেন?’

উত্তর দিলেন মাধুরী : ‘প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। বলতেন, ‘মাধুরী, ও তোমারও মেয়ে, আমারও মেয়ে। ভাগ্যচক্রে আমার নাতনি হয়ে জমেছে।’ মাস্পিকে ছেড়ে মা একটা মিনিটও থাকতে পারতেন না। প্রায়ই বলতেন, ‘মায়ার টান বড় সাংঘাতিক। কিছুতেই ছেড়ে যেতে দেয় না।’’ শেষ দিকটায় মা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। উনি বুঝতে পেরেছিলেন, সময় ফুরিয়ে এসেছে। তাই এ-কথাটা আরও বেশি করে বলতেন। আর...আর মারা যাওয়ার ঠিক আগে মা বলেছিলেন...।’

মাধুরী কথা শেয় না-করে চুপ করে গেলেন।

‘কী বলেছিলেন?’ প্রিয়নাথ আগ্রহ চেপে রাখতে পারছিলেন না। শিকারের গন্ধ-পাওয়া চিতাবাঘের মতো ভেতরে ভেতরে ছটফটিয়ে উঠেছিলেন।

মাধুরী আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন! নীরব প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন যেন : বলব, নাকি বলব না?

প্রমথেশ আবার একটা দীর্ঘশাস্ত্র ফেললেন। তারপর ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘তুমি বলো—আমি কিছুই মাইন্ড করব না। বাচ্চাটাকে তো যে-করে-হোক বাঁচাতে হবে! ’

শাড়ির অঁচলটা সামান্য ঠিক করে নিয়ে মাধুরী বললেন, ‘মারা যাওয়ার ঠিক আগে মা বলেছিলেন, “মাস্পিকে ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে। দেখো, মাধুরী, এই মায়ার টান আমাকে কিছুতেই তোমাদের ছেড়ে দেওতে দেবে না। আবার আমাকে ফিরিয়ে আনবে...মায়ার টান আবার আমাকে ফিরিয়ে আনবে...তোমারা দেখো...” ’

মাধুরী হঠাৎই ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

প্রমথেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, মাধুরী ছেউক্ষেক্ষণে রঙিন রুমাল চোখে চেপে ধরে হাত তুলে স্বামীকে ব্যস্ত নাহিন্তে ইশারা করলেন।

প্রিয়নাথ আর প্রমথেশ অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাধুরী চোখ মুছে সহজ হলেন! দু-একবার নাক টেনে তারপর সামান্য ধরা গলায় অনুনয় করে বললেন, ‘আমাদের বাচ্চা মেয়েটাকে আপনি বাঁচান, প্রিয়নাথবাবু। অনেক আশা নিয়ে আমরা আপনার কাছে এসেছি।’

প্রিয়নাথ গভীর হয়ে খানিকক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বললেন, ‘দেখি চেষ্টা করে। আচ্ছা, আপনারা কি মাস্পির কথাবার্তা টেপ করেছেন?’

‘হ্যাঁ, করেছি—’ উত্তর দিলেন প্রমথেশ, ‘ঘটনাটা শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরেই টেপ করার চিন্তাটা আমার মাথায় আসে। তখন আমি একটা ক্যাসেটে মাস্পির কথাবার্তা টেপ করি—মানে, একটানা পারিনি—একটু স্ক্যাটার্ডভাবে টেপ করতে পেরেছি। তাতে মাস্পির দু-চারদিনের কথাবার্তার টুকরো ধরা আছে। স্ক্যাটার্ড হলেও ব্যাপারটা বেশ বোৰা যায়। আর...আর টেপটা প্লে-ব্যাক করে শুনলে কেমন যেন ভয়-ভয় করে। মাধুরী তো

একদিন চিৎকার করে উঠেছিল।'

'মাস্পিকে আমার দেখা দরকার...ওর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।'

'অফ কোর্স!' জোর দিয়ে বললেন প্রমথেশ, 'আপনি চাইলে এখনই আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন—আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

একপলক ভেবে প্রিয়নাথ বললেন, 'না, এক্ষুনি হবে না। আমি বরং কাল বিকেলে আপনাদের বাড়িতে যাব। আপনি অ্যাড্রেসটা আমাকে দিয়ে যান—।'

'তার কোনও দরকার নেই। কাল পাঁচটায় আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। তাতে কাজটা সহজ হয়ে যাবে।'

প্রিয়নাথ মাথা নাড়লেন : 'ঠিক আছে। আমি তৈরি হয়ে থাকব।'

মাধুরী ঢোকের ইশারায় স্বামীকে কিছু বলতে চাইছিলাম। শ্রী লক্ষ করে প্রমথেশ একটু ইতস্তত করে প্রিয়নাথকে বললেন, মিস্টার জোয়ারদার, আপনাকে কী...মানে, আপনার ফিজ্টা...অ্যামাউন্টটা যদি ক্রেতেন্ডলি বলেন...।'

হাসলেন প্রিয়নাথ। বললেন, 'ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। যদি মাস্পিকে নরমাল করে দিতে পারি তা হলে দু-হাজার টাকা দেবেন।'

প্রমথেশ প্যান্টের পক্কেটে হাত ঢোকাতে ঝাঁচিলেন, প্রিয়নাথ বললেন, 'উঁহ, পেশেন্টকে সারাতে না পারলে তোম টাকা নিই না।'

অপ্রস্তুত হাসলেন প্রমথেশ আর মাধুরী। তারপর আরও বারকয়েক অনুরোধ-অনুনয় করে উঠে পড়লেন।

ওঁদের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন ভূতনাথ। সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস ওঁর মুখ-চোখ ছুঁয়ে গেল। বুঝতে পারলেন, শীত বেশ কিছুদিন হল চলে গেলেও এখনও পুরোপুরি মায়া কাটাতে পারেনি।

মায়া বড় অন্তুত জিনিস।

'ঠাস্মা—।'

'কী বল।'

'তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।'

'পাগল!' অন্তুত খলখল হাসি : 'তোকে ছেড়ে কখনও যেতে পারি।'

‘তুমি কোথায়?’

‘সোনামণি আমার, আমি তো তোর ভেতরেই আছি। তোর আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে আছি। শঙ্খ-লাগা সাপ যেমন একটা আর-একটাকে জড়িয়ে থাকে, আমি ঠিক সেরকম করে তোর আত্মাকে জড়িয়ে আছি।’ আবার আকুল অট্টহাসি। যেন কেউ হেসে কুটিকুটি হয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

তারই মধ্যে শোনা গেল এক ভয়ের আর্তচিকার। তারপরই কান্না। কান্না-ভাঙ্গা গলায় মাধুরী চেঁচিয়ে বললেন, ‘মা! মা! আপনি মাস্পিকে ছেড়ে দিন! আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমার মেয়েটাকে বাঁচান! দোহাই আপনার...’

উন্নরে রক্ত-হিম-করা হাসি শোনা গেল। যেন বহু উঁচু জলপ্রপাত থেকে জলের বদলে রাশি-রাশি ভাঙ্গা কাচের টুকরো গড়িয়ে পড়ছে।

তারপর আর কোনও শব্দ নেই।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার টেপ রেকর্ডার বন্ধ করলেন। সামনমনেই নানা কথা ভাবছিলেন তিনি। টেপের সব কথাবার্তাই মাস্পির গলায়। তবে ঠাকুমার সংলাপগুলো বলার সময় অন্তুত এক ঝুঁড়োটে ঢং ফুটে উঠেছে। আর হাসিটা? একটা বাচ্চা কি সত্যিই ওভাবে হাসতে পারে?

প্রিয়নাথের মুখোমুখি বসে ছিলেন প্রমথেশ আর মাধুরী—প্রমথেশ একটি সুদৃশ্য মোড়ায়, আর মাধুরী বিছানায়। বিছানার একপাশে দাঁড়িয়ে সাবিত্রী। পরনে রঙিন শাড়ি। গায়ের রং ময়লা। বয়েস পঁয়তিরিশ-ছত্তিরিশ হবে। লম্বাটে মুখ, গাল সামান্য বসা, চোখের নজরে সতর্ক ভাব।

ওঁরা গেস্টরুমে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। সামনের টেবিলে প্রমথেশদের একশো ওয়াট বিপিএল টেপরেকর্ডার।

প্রিয়নাথ ওঁর ঝোলাব্যাগ নিয়ে ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছেন। ঝোলাব্যাগে রয়েছে প্রেত-পিশাচ ইত্যাদির তদন্তের নানারকম যন্ত্রপাতি আর হাতিয়ার। মাধুরী জানিয়েছেন, মাস্পি এখনও ঘুমোচ্ছে—তবে একটু পরেই উঠে পড়বে। তখন প্রিয়নাথ ওকে দেখতে পারবেন। সেইজন্যই প্রিয়নাথ শুরুতেই প্রমথেশের রেকর্ড করা ক্যাসেট শুনতে বসে গেছেন।

ক্যাসেটের প্রথম অংশটা শোনার পর প্রিয়নাথ ভাবতে বসলেন।

ব্যাপারটাকে কি ‘ভূতে-ধরা’ গোছের বলা যায়? ইংরেজিতে এ-ধরনের

ব্যাপারকে ‘পোল্টাৰগাইস্ট ফেনোমেনন’ বলে। মাস্পিৰ ঠাকুমা তো মাস্পিকে খুব ভালোবাসতেন। তা হলে বাচ্চাটাকে তিনি এ-ভাবে কষ্ট দিছেন কেন? এমন কি হতে পারে যে, বাচ্চাটার কষ্ট তিনি বুঝতে পারছেন না! তা নইলে বাচ্চাটার আত্মার সঙ্গে নিজের প্রেতাত্মাকে তিনি কেন জড়িয়ে রাখতে চাইছেন?

‘আপনার মায়ের কোনও ফটো থাকলে আমাকে দিন।’ প্রমথেশকে লক্ষ্য করে বললেন ভূতনাথ।

প্রমথেশ তাকালেন সাবিত্রীর দিকে : ‘সাবি, বেড়ুমের বড় বাঁধানো ফটোটা নিয়ে আয়।’

সাবিত্রী চলে গেলেন।

এবং ফিরে এলেন একটু পরেই। হাতে প্রমাণ মাপের বাঁধানো একটা ফটো।

ফটোটা টেবিলে চিত করে নামিয়ে রাখতেই ভূতনাথের সেদিকে চোখ গেল। তিনি যেন সম্মোহিতের মতো ফটোটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফটোর নীচে নাম লেখা : নয়নপ্রভা নাহ। আৰু তার দু-পাশে জন্ম ও মৃত্যুৰ তারিখ।

বছৰ সত্ত্ব-বাহাত্ত্বের এক বৃক্ষ উজ্জ্বল চোখে প্ৰিয়নাথকে দেখছেন। তাৰ মাথায় শোনপাপড়িৰ মতো ধৰণৰ সাদা অঢেল চুল। ফৱসা কপালে বাঁদিকে একটা কালো আঁচিলেৰ মতন। ঠোঁটেৰ কোণে এক চিলতে হাসি।

সব মিলিয়ে বৃক্ষকে কেমন যেন জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল।

ঝোলাব্যাগ থেকে আতসকাচ্চটা বেৰ কৰে ফটোটার ওপৰে ঝুঁকে পড়লেন প্ৰিয়নাথ। ওটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পৰ মুখ তুলে আতসকাচ্চটা ঝোলাব্যাগে চুকিয়ে মাধুৱীকে জিগ্যেস কৱলেন, ‘এই ফটোটা আপনাদেৱ বেড়ুমে থাকে?’

মাধুৱী মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বললেন।

প্ৰিয়নাথ ফটোটা সাবিত্রীৰ দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘এটা আবাৰ জায়গামতো টাঙিয়ে দিন।’

সাবিত্রী ফটো নিয়ে চলে গেলেন।

প্ৰায় সঙ্গে-সঙ্গেই পাশেৱ কোনও ঘৰ থেকে বাচ্চাৰ কানা ভেসে এল।

মাধুরী উঠে দাঁড়ালেন : ‘আমি যাই। মাস্পি উঠে পড়েছে। ওকে খাওয়াতে হবে।’

মাধুরী চলে যেতেই প্রিয়নাথ আবার টেপ চালু করলেন। কিছুক্ষণ খালি টেপ চলার ঘসঘস শব্দ হল। তারপরই মাস্পির গলা পাওয়া গেল।

‘ঠাম্বা, ঠাম্বা, তুমি কী করছিলে?’

‘অঙ্ককারে একা-দোকা খেলছিলাম?’

‘কার সঙ্গে?’

‘তুই চিনবি না—অঙ্ককার-অঙ্ককার সব লোকজনের সঙ্গে।’

‘আমি মায়ের সঙ্গে খেলা করি।’

‘তোর মা বাজে।’

‘কেন?’

‘তোর বাবাকে নিয়ে সবসময় দরজা বন্ধ করে দেয়। তারে আমি কিছু বুঝি না! আমার দিকে কোনও খেয়াল নেই, শুধু নিজেসের ফুর্তি। দিন-রাত শুধু ওই নিয়েই ব্যস্ত। পিনুকে আমি চিনি সামান ওর জীবনে অনেক নোংরা-নোংরা ব্যপার আছে। সেই যে ওই স্তুপের দিদিমণি...।’

‘না, আমার মা-বাবা ভালো।’

‘মোটেই না! তোমার মা-বাবা বাজে, বাজে! তোমার ঠাম্বা খুব ভালো। সোনামণি লক্ষ্মীটি আমার। তোমার ঠাম্বা খুব ভালো, খুব ভালো খুব ভালো...।’

‘হ্যাঁ-হ্যাঁ। ঠাম্বা ভালো। মা বাজে। বাবা বাজে। পিসি বাজে। সবাই বাজে। শুধু ঠাম্বা ভালো।’

‘ভালো...ভালো...ভালো।’

তারপরই মাস্পির গলায় কান্না শোনা গেল। তবে শুনে মনে হচ্ছিল, কোনও বৃদ্ধা যেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

তারপর সব চুপচাপ।

প্রমথেশ মাথা নীচু করে বসেছিলেন। প্রিয়নাথ টেপ বন্ধ করে বললেন, ‘আরও যে রেকর্ড করেছেন সেসব কথাবার্তা কী টাইপের?’

হতাশ ভঙ্গিতে হাত উলটে প্রমথেশ বললেন, ‘ওই একই টাইপের। ছলচুতো পেলেই আমাকে আর মাধুরীকে অপদস্থ করার চেষ্টা। অথচ বিশ্বাস

করুন, মায়ের জন্যে আমরা কী না করেছি!

প্রিয়নাথ হাত নেড়ে প্রমথেশকে শাস্ত করতে চাইলেন : ‘আঢ়া আর প্রেতাঞ্চায় অনেক তফাত আছে, প্রমথেশবাবু। কেউ লোক ভালো হলেই তার প্রেতাঞ্চ ভালো হয় না। এরকম বহু গরমিল আমি দেখেছি। আপনার মায়ের প্রেতাঞ্চা কিন্তু আপনার মা নন—এটা মনে রাখবেন! ’ টেপরেকর্ডারের বোতাম টিপে ক্যাসেটটা বের করলেন : ‘এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। কাজ হয়ে গেলে ফেরত দেব। এবারে চলুন, মাস্পির সঙ্গে একটু দেখা করি—।’

প্রমথেশদের বেডরুমের দরজায় পা দিয়েই প্রথমাকে এই প্রথম দেখলেন প্রিয়নাথ।

বিছানার ওপরে মায়ের কোলে বসে ছিল মাস্পি। পশ্চিমে জানলা দিয়ে অবাধ্যভাবে ঢুকে পড়া মরগাপন সূর্যের কমলা রং ওর মুখে-গালে-মাথায় মাথামাথি। ওর মিষ্টি মুখ, ডাগর চোখ, আবু-ফুলো-ফুলো গাল যে-কোনও রত্নাকরকে পলকে বাল্মীকি করে দিত্তে পারে। এক বছরের এই ফুটফুটে বাচ্চা মেয়েটিকে দেখে প্রিয়নাথ তক্ষুনি প্রেমে পড়ে গেলেন। এই মেয়েটির আঢ়ার সঙ্গে ওর ঠাকুমার প্রেতাঞ্চা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে এ-কথা ভাবলেই কেমন গা শিরশির অবৈ ওঠে। সন্ধ্যা ছুই-ছুই গোধূলির আলোয় প্রিয়নাথ হঠাতে শিউরে উঠলেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে মাস্পিকে আদর করে ডাকলেন, ‘মাস্পি সোনা...মাস্পি...প্রথমা...।’

বাচ্চাটা মায়ের কোলে বসে-বসেই ঘাড় ফেরাল প্রিয়নাথের দিকে। আর ঠিক তখনও ওর মাথায় একটা অস্তুত জিনিস প্রিয়নাথের নজরে পড়ল। সূর্যের আলো মরে এলেও ভূতনাথের দেখতে কোনও ভুল হল না।

মাধুরীকে ইশারা করে তিনি মেয়েটাকে কাছে নিয়ে আসতে বললেন। মাধুরী বসে-বসেই মেয়েকে নিয়ে এগিয়ে এলেন বিছানার কিনারায়।

প্রিয়নাথ বাচ্চাটার মাথা বেশ ভালো করে দেখলেন।

না, তিনি ভুল দেখেননি। মাস্পির মাথায় দু-গাছা শনের মতো সাদা চুল চিকচিক করছে। এরকম লম্বা সাদা চুল ওর মাথায় কেমন করে এল!

‘ওর মাথার এই পাকা চুল দুটো আপনারা খেয়াল করেননি?’

প্রিয়নাথের প্রশ্নের উত্তরে মাধুরী মেয়ের মাথার ওপরে ঝুঁকে পড়লেন। প্রমথেশ আর সাবিত্রী তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে এলেন মাস্পির কাছে। ওঁরা তিনজনে অবাক হয়ে লম্বা সাদা চুল দুটো দেখতে লাগলেন।

মাধুরী ভয়ার্ট গলায় বললেন, ‘কখন এই চুল দুটো এল?’

তারপর সবাই চুপচাপ। শুধু মাস্পি হাত-পা নেড়ে অথবাইন সব শব্দ করছিল।

ঘর অঙ্কুকার হয়ে আসছিল। সাবিত্রী আলো জেলে দিলেন। ঠিক তখনই ঘরের ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি মিষ্টি শব্দ করে জানিয়ে দিল ছুটা বাজে।

মাস্পির তিনজন অভিভাবক ফ্যাকাসে মুখে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বিভাস্তভাবে অপেক্ষা করছিলেন। প্রিয়নাথের চোখ একবার মাস্পিকে দেখছিল, আর-একবার দেওয়ালে টাঙ্গামো নয়নপ্রভার ফটোর দিকে। শব্দ করছিল। বৃদ্ধা কি চাইছেন তাঁর শরীরের ছায়া মাস্পির ওপরে পড়ক! দু-গাছা সাদা চুল দিয়েই কি তার শুরু?

সাবিত্রী প্রায় ফিসফিস করে উচ্চারণ করলেন, ‘কী হবে এখন?’

প্রিয়নাথ যেন আপনমনেই বিড়বিড় করে ঝুঁকে উঠলেন, ‘আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। আজ রাতেই একবার চেষ্টা করে দেখি...।’

মাধুরী প্রিয়নাথকে জিগ্যেস করলেন, ‘পাকা চুল দুটো তুলে দেব?’

প্রিয়নাথ তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, ‘না, না—একদম না! আমাদের কপাল ভালো হলে ওগুলো নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে।’

তারপর প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ সময় কাটালেন মাস্পির সঙ্গে। ওকে আদর করলেন, ওর সঙ্গে কথা বললেন।

ওঁরা তিনজন ভূতনাথের এই আচরণে একটু অবাক হলেন। কিন্তু প্রিয়নাথ আসলে নিজের ভেতরের টেনশানটা কাটাতে চেষ্টা করছিলেন।

একটু পরে তিনি বললেন, ‘আজ রাতে আমরা সবাই এ-ঘরে থাকব। একটা টেবিল আর চারটে চেয়ারের ব্যবস্থা করুন। তারপর আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা আছে।’

প্রমথেশ সাবিত্রীকে বললেন সব ব্যবস্থা করতে।

এমন সময় বেডরুমের দেওয়াল-তাকে রাখা টেলিফোন বেজে উঠল। প্রমথেশ তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরলেন, কথা বললেন।

প্রিয়নাথ মাধুরীকে জিগ্যেস করলেন, ‘মারা যাওয়ার পর নয়নপ্রভাকে আপনারা কখনও দেখেছেন?’

মাধুরী মাস্পিকে মেঝেতে ছেড়ে দিয়ে স্বামীর দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন। প্রমথেশের কথা বলা হয়ে গিয়েছিল। রিসিভার নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, ‘একবারই মাত্র দেখেছিলাম। দিন-দশ-বারো আগে মাঝরাতে হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। কিছুতেই আর ঘুম আসছিল না। তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে ওই জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎই মাকে দেখতে পেলাম। সাদা থান-পরা একটা ছায়া যেন অঙ্ককারে শুন্যে ভাসছে। তবে স্পষ্ট করে দেখতে পাইনি। একটা কালো রঙের বিশাল ফ্যানের ব্রেড যেন মায়ের সামনে ধীরে-ধীরে ঘূরছিল। তার আড়াল দিয়ে আমি মাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। মায়ের ধৰ্বধৰে সাদা চুল বাতাসে উড়েছিল। হঠাৎই মা দু-হাত সামনে বাড়িয়ে দিল—যেন কোনও বাচ্চাকে ঢেকালে নিতে চাইছে। তারপরই ছবিটা মিলিয়ে গেল। সেটাও বেশ কিন্তু উলিয়ারভাবে। যেন পাউডার দিয়ে কেউ মায়ের ছবিটা তৈরি করেছে। হঠাৎ করে জোরে ফুঁ দিয়ে পাউডারের গুঁড়োগুলো উড়িয়ে দিল আতাসে’

প্রমথেশ থামলেন।

মাস্পি টলোমলো পায়ে মেঝেতে হাঁচিতে চেষ্টা করছিল। থেকে-থেকেই মায়ের শাড়ি খামচে ধরছিল।

প্রিয়নাথ অবাক চোখে বাচ্চাটাকে দেখছিলেন। ওকে নিয়েই যত গোলমাল যত কাণ্ড—অথচ ওর কোনও ভূক্ষেপই নেই।

সাবিত্রী কাজের লোকদের নিয়ে ঘরে তুকলেন। টেবিল-চেয়ার ঠিকমতো সাজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই আবার চা আর স্ন্যাক্স নিয়ে ফিরে এলেন। সেগুলো টেবিলে রেখে প্রমথেশকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘দাদা, তোমরা চা খেতে-খেতে কথা বলো।’ তারপর প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে : ‘আপনি আজ আমাদের এখানে খাবেন—আর রাতে তো থাকছেনই। গেস্ট-রুমে আপনার শোওয়ার ব্যবস্থা করেছি।’

প্রমথেশ হেসে বললেন, ‘শুধু আজ কেন! যদি দরকার মনে করেন তা হলে পাঁচ-সাত দিনও থাকতে পারেন। উই ডেন্ট মাইন্ড অ্যাট অল।’

প্রিয়নাথ বেশ চিঞ্চিতভাবে বললেন, ‘কে জানে, ব্যাপারটা আজ রাতে

মিটবে কি না !'

সাবিত্রী বোধহয় রামাবান্নার তদারকি করতে চলে গেলেন। মাধুরী ওঁকে বললেন, 'তুমি যাও, আমি একটু কথা বলেই যাচ্ছি—।'

চা খেতে-খেতে নয়নপ্রভা সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন মাধুরী আর প্রমথেশ। প্রিয়নাথ মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। বোলাব্যাগ থেকে ডায়েরি বের করে মাঝে-মাঝে নোট নিলেন। তারপর চায়ের পাট চুকলে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'চলুন, নয়নপ্রভাদেবীর ঘরটা একবার দেখে আসি।'

প্রমথেশ মাধুরীর দিকে তাকালেন।

মাধুরী বললেন, 'মা সাবিত্রীর সঙ্গে থাকতেন। মা চলে যাওয়ার পর ওঁ-য়রে সাবিত্রীই একা থাকে। ওখানে তো মায়ের চিহ্ন বলছে সেরকম কিছু নেই—শুধু পুরনো আমলের একটা কাঠের আলমারি ছাড়া...।'

প্রিয়নাথ তবু যেতে চাইলেন।

মাধুরী স্বামীকে বললেন, 'তুমি মাস্পিকে দেয়ো—আমি ওঁকে ঘরটা দেখিয়ে নিয়ে আসছি।'

মাধুরী প্রিয়নাথকে নিয়ে চলে গেলেন সাবিত্রীর ঘরের দিকে।

কিন্তু সেখানে প্রিয়নাথকে হতাপ্য হতে হল। মনে দাগ কাটার মতো নতুন কিছুই চোখে পড়ল না।

সুতরাং একটু পরেই ওঁরা দুজনে ফিরে এলেন। প্রমথেশ মাস্পিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রিয়নাথ ফিরে আসামাত্রই জানতে চাইলেন, 'কিছু পেলেন ?'

প্রিয়নাথ সিগারেটে আলতো টান দিয়ে বললেন, 'নাঃ...।' তারপর মাস্পির কাছে এগিয়ে এসে ওর গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'আজ রাত দশটা নাগাদ আমরা ওই টেবিল ধিরে বসব। মাধুরীদেবী,' মাধুরীর দিকে ফিরে তাকালেন ভূতনাথ, 'আপনার শাশুড়ির ছবিটা আমি দেওয়াল থেকে নামাচ্ছি। ওটা টেবিলে একটা পাশ ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে রাখব। ওঁর ওপরে কনসেন্টেট করার জন্যে ছবিটা দরকার।'

ছবিটা দেওয়াল থেকে খুলে নিলেন প্রিয়নাথ। বৃদ্ধার তীব্র চোখ প্রিয়নাথকে যেন বিন্দু করল।

କଯେକ ସନ୍ତୋ ପର ଅନ୍ଧକାରେ ବସେଓ ପ୍ରିୟନାଥକେ ବୃଦ୍ଧାର ତୀର ଦୃଷ୍ଟିର ଚାପ ସହ କରତେ ହଛିଲ । କାରଣ, ଟେବିଲେ ଦାଁଡ଼ କରାନୋ ଛବିର ଓପରେ ପ୍ରିୟନାଥେର ଟର୍ଚ ଏକଟା ଆଲୋର ବୃତ୍ତ ଏଁକେ ଦିଯେଛିଲ । ଆର ଓଂରା ଚାରଜନ ହାତେ ହାତ ଧରେ ଏକମନେ ନୟନପ୍ରଭାର କଥା ଭାବଛିଲେନ ।

ଅନ୍ଧକାରେ ଓଂଦେର ଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସେର ଶବ୍ଦ ଶୋନା ଯାଚିଲ । ପଞ୍ଚମେର ଖୋଲା ଜାନଲା ଦିଯେ ମରା ଚାଁଦେର ଆଲୋ ଆର ବାତାସ ଢକେ ପଡ଼ିଲ ଘରେର ଭେତରେ ।

ଟେବିଲ ଘରେ ବସାର ଆଗେ ପ୍ରିୟନାଥ କଯେକଟା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ବୁଝିଯେ ଦିଯେଛେନ ମାଧୁରୀ, ପ୍ରମଥେଶ ଓ ସାବିତ୍ରୀକେ ।

‘ଆମି ଯା ବଲବ ସେଟୋ ଅକ୍ଷରେ-ଅକ୍ଷରେ ମାନତେ ହବେ । ଏର ଯେମ୍ଭ୍ରୋକିଫୋଟୋ ନଡ଼ିଚଢ଼ ନା ହୟ । କେଉ କୋନଓ କଥା ବଲବେନ ନା, ବା ଆନନ୍ଦେଶ୍ୱାର କୋନଓ ଆସ୍ୟାଜ କରବେନ ନା । ଆର ସବାଇ ଏକମନେ ନୟନପ୍ରଭାର କଥା ଭାବବେନ— ଯେନ ଉନି ଛାଡ଼ା ଦୁନିଆଯ ଆର କେଉ ନେଇ । ଯଦି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀ ନୟନପ୍ରଭାର ପ୍ରେତ-ଶରୀର ଘରେ ଦେଖା ଦେଯ ତା ହଲେ ଆପନାରା ଯେମ୍ଭ୍ରୋ ପେଯେ ଚିକାର-ଟିକାର କରବେନ ନା । ତାତେ କାଜେର ଅସୁବିଧେ ହଲେ ଆର ଲାସ୍ଟ ଅୟାନ୍ ଫାଇନାଲ ଇନ୍ଟାକଶନ ହଲ : କୋନଓ ଅବହାତେଟେ ଟେଯାର ଛେଡେ କେଉ ଉଠବେନ ନା ।’

କଥାଗୁଲୋ ବଲାର ସମୟ ପ୍ରିୟନାଥକେ କେମନ ଅନ୍ୟରକମ ମନେ ହଛିଲ । ଏତକ୍ଷଣ ଦେଖା ନିପାଟ ଭଦ୍ରଲୋକ-ଭଦ୍ରଲୋକ ଚେହାରାଟା ବଦଳେ ଗିଯେ ଜେଗେ ଉଠଲ ଆସ୍ତାବିଶ୍ୱାସେ ଟଗବଗ କରା ପ୍ରେତସିନ୍ଧ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ମାନୁଶ ।

ମାଧୁରୀର କେମନ ଭୟ-ଭୟ କରଛିଲ । ଚେଯାରେ ବସେ ବାରବାର ଚୋଥ ଫେରାଛିଲେନ ବିଛାନାର ଦିକେ । ମାମ୍ପି ସେଥାନେ ଅଘୋରେ ଘୁମିଯେ ରଯେଛେ । ଓକେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ରେଖେ ଆସତେ ଚେଯେଛିଲେନ ମାଧୁରୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟନାଥ ଆପଣି କରେଛେନ । ବଲେଛେନ, ‘ମାମ୍ପି ଏହି ଘରେ ନା ଥାକଲେ ପ୍ରେତତର ବସାନୋର କୋନଓ ମାନେଇ ହୟ ନା ।’

ସାବିତ୍ରୀଓ ଭୟ ପାଛିଲେନ । ତବେ ଯା ‘କିଛୁ କରା ହଞ୍ଚେ ସବହି ମାମ୍ପିର ଭାଲୋର ଜନ୍ୟ—ଏହି ବଲେ ମନକେ ପ୍ରବୋଧ ଦିଚ୍ଛିଲେନ ।

ପ୍ରମଥେଶେର ମନେ ଖାନିକଟା ଆଶଙ୍କା ଯେ ଛିଲ ନା ତା ନୟ । ତବେ ତାର ଚେଯେ ବେଶି ହଛିଲ କୌତୁଳ । ତାର ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ମନ ଅବାକ କୌତୁଳ ନିଯେ

বিচিত্র মানুষটার বিচিত্র কার্যকলাপ লক্ষ করছিল।

ইলেকট্রনিক পেন্ডলাম ঘড়ির শব্দে অসুবিধে হবে বলে ঘড়ির ব্যাটারিগুলো খুলে রাখতে চেয়েছিলেন প্রিয়নাথ। তখন প্রমথেশ বলেছেন, তার দরকার নেই। কারণ, ঘড়ির ঘণ্টার শব্দটা লাইট অ্যাক্টিভেটেড। ঘরের আলো জুললে ঘণ্টা বাজে, নইলে নয়।

ঝোলাব্যাগ হাতড়ে দুটো মোমবাতি বের করে ঘরের এক কোণে সে-দুটো জুলে দিলেন প্রিয়নাথ। একটা খড়ির ডেলা বের করে টেবিলে একটা ত্রিভুজ এঁকে সেই ত্রিভুজের মাঝখানে একটা বড়সড় কড়ি বসিয়ে দিলেন। তারপর ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিলেন।

আবছা আঁধারে চেয়ারে এসে বসলেন প্রিয়নাথ। ঝোলাব্যাগ থেকে একটা সরু টর্চ বের করে জুললেন। জুলত টর্চটা টেবিলে ফ্রেমনভাবে রাখলেন যাতে আলোর বৃক্ষটা সরাসরি নয়নপ্রভার মুখের ওপরে গিয়ে পড়ে। তারপর বিড়বিড় করে মন্ত্রের মতো কীসব আওঙ্কড়তে শুরু করলেন।

মন্ত্র পড়া শেষ হলে প্রিয়নাথ চাপা গলায় বললেন, ‘স্টার্ট। আর কেউ কোনও কথা বলবেন না।’

অঙ্ককারে প্রেতচক্র শুরু হল।

চুপচাপ বসে নয়নপ্রভাব কথা ভূমিতে-ভাবতে সময়ের হিসেব যখন গুলিয়ে গেছে ঠিক তখনই একটা শব্দ হল। তারপর আবার...আবার।

টেবিলের ওপরে রাখা কড়িটা নড়ছে।

সবার কেমন শীত-শীত করে উঠল। প্রিয়নাথ থার্মোমিটারে না দেখেই বুঝলেন ঘরের উষ্ণতা কমছে। সেইসঙ্গে জানলা দিয়ে ঢুকে পড়া বাতাসও কেমন যেন উদ্দাম মাতাল হয়ে উঠল।

হঠাতে মাস্পি কেঁদে উঠল।

প্রিয়নাথের বাঁদিকে বসেছিলেন মাধুরী। প্রিয়নাথ টের পেলেন, ওঁর হাত কেমন যেন শক্ত হয়ে গেছে।

আরও কয়েকবার কাঁদল মাস্পি। তারপর বড়দের মতো গলায় বলে উঠল, ‘পিনু, তোরা কী চাস?’

প্রিয়নাথের ডানদিকে বসা প্রমথেশ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। সেটা বুঝতে পেরে প্রিয়নাথ ওঁর হাতে চাপ দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে টর্চটা নিভে গেল।

এতক্ষণ একটা আলোর আভা আবছাভাবে ঘরময় ছড়িয়ে ছিল। এখন সেই আলোকে ঝাঁট দিয়ে কেউ যেন জড়ো করে দিল মোমবাতিগুলোর কাছে।

প্রশ্নটা ভেসে এল আবার : ‘তোরা কী চাস?’

এবার জবাব দিলেন ভূতনাথ, ‘মাস্পিকে ফেরত চাই।’

‘তুই কে?’ মাস্পির গলায় যেন সন্দেহের বিষ ঝরে পড়ল।

‘আমি ভূতনাথ। মাস্পিকে ফেরত নিতে এসেছি।’ বজ্রস্বরে বললেন প্রিয়নাথ।

‘আ-হা! আহুদা!’ ব্যঙ্গ করে উঠল কঠস্বর। তার পরই শুরু হল খলখল হাসি।

প্রিয়নাথ বিছানায় শোয়া মাস্পির দিকে দেখলেন। বাচ্চাটা শিংগার হয়ে ঘুমোচ্ছে।

মাধুরী আর কান্না চাপতে পারছিলেন না। সামুজ্জি<sup>°</sup> থরথর করে কাঁপছিলেন।

হাসি থামলে পর শোনা গেল : ‘মাস্পিকে আমি ছাড়তে পারব না—ওর ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে। মায়ার উপর কি সহজে কাটানো যায়?’

আচমকা প্রিয়নাথ মাধুরী আর প্রমথেশের হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দু-হাত শূন্যে তুলে চিৎকার করে বললেন, ‘মাস্পি মানুষ—আর তুই পিশাচ। পিশাচের আবার মায়ার টান কীসের! তোর টানে মাস্পি খতম হয়ে যাবে। মাস্পিকে তুই ছেড়ে দে!’

‘আ-হা! ছেড়ে দে বললেই হল!’ ব্যঙ্গের ধারালো টান ফুটে উঠল কঠস্বরে। তারপর একটু হেসে : ‘পিনু, এই লোকটাকে বাড়ি থেকে বের করে দে!’

প্রমথেশ আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। কাতর গলায় বলে উঠলেন, ‘মা, তোমার জন্যে আমরা শেষ হয়ে গেলাম...আমরা সবাই শেষ হয়ে গেলাম...’

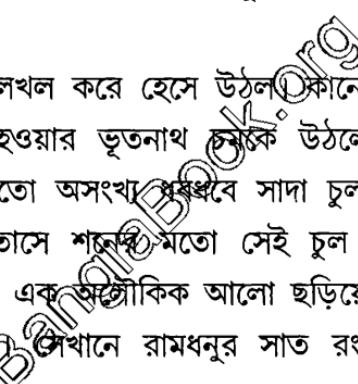
মাধুরী এবার জোরে কেঁদে উঠলেন।

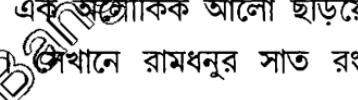
‘মায়ার টান রে, মায়ার টান! আমি কী করি বল?’ প্রেত-কঠস্বর মেহ-মাখা গলায় বলল।

প্রিয়নাথ হাত-পা ছুড়ে প্রায় উন্মত্তের মতো লাফিয়ে উঠলেন। ওঁর শরীরের ধাক্কায় চেয়ারটা পিছনে উলটে পড়ে গেল। খোলা জানলা দিয়ে হাড়-কাঁপানো বাতাস ধেয়ে এল। ঘরের উষ্ণতা পলকে আরও কয়েক ডিগ্রি নেমে গেল।

প্রিয়নাথ ছুটে গেলেন বিছানার কাছে। সবাইকে অবাক ঘরে ঘুমস্ত মাস্পিকে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিলেন। তারপর ঘরের সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে বললেন, ‘তোর মায়ার টানে ফুলের মতো এই শিশুটা দিনকে-দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তুই ওকে ছেড়ে দে! ছাড়তে তোকে হবেই! নইলে তোর নিষ্ঠার নেই!’

প্রিয়নাথের গর্জনে মাস্পির ঘুম ভাঙল না। তবে মাধুরী আর সাবিত্রী ভয়ে চিন্কার করে উঠলেন।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমস্ত মাস্পি খলখল করে হেসে উঠল  কানের ঠিক পাশেই হঠাৎ ওরকম হাসির শব্দ হওয়ার ভূতনাথ মন্ত্রকে<sup>°</sup> উঠলেন।

আর তখনই বটগাছের ঝুরির মতো অসংখ্য প্রবল্পৰে সাদা চুল নেমে এল ঘরের সিলিং থেকে। ঘূর্ণি বাতাসে শুমকি মতো সেই চুল এদিক-ওদিক উড়তে লাগল। কোথা থেকে এক অচৌকিক আলো ছড়িয়ে পড়ল ভেসে বেড়ানো সেই চুলের ওপরে  সেখানে রামধনুর সাত রং খেলে বেড়াতে লাগল।

চুলের তন্তজালে প্রিয়নাথ দিশেহারা হয়ে পড়লেন। এক হাতে বাচ্চাটাকে আঁকড়ে রেখে অন্য হাতে মুখে-চোখে ঢলে পড়া সাদা চুলগুলো সরাতে চাইলেন।

মাধুরী, সাবিত্রী আর প্রমথেশ—ওঁরা তিনজনে তখন আতঙ্কে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন। অঙ্ককারে চুলের মায়াজালে দিশেহারা হয়ে ওঁরা যেখানে-সেখানে ধাক্কা খেতে লাগলেন। মাধুরী আর সাবিত্রী ডুকরে কেঁদে উঠছিলেন বারবার। আর তারই মধ্যে মাস্পির নাম ধরে ডাকছিলেন।

প্রমথেশ দম-বন্ধ-করা গলায় ডেকে উঠলেন, ‘মিস্টার জোয়ারদার! প্রিয়নাথবাবু!’

প্ৰিয়নাথ তখন রাগে পাগল হয়ে গেছেন। এক প্ৰেতেৰ সঙ্গে এক প্ৰেতসিদ্ধেৰ চ্যালেঞ্জ যেন চকমকি পাথৱেৰ ঠোকাঠুকি...তা থেকে বেৱিয়ে আসছে আগুনেৰ ফুলকি।

কয়েক লাফে প্ৰিয়নাথ ছিটকে চলে এলেন প্ৰেতচক্ৰেৰ টেবিলেৰ কাছে। মাস্পিকে টেবিলে শুইয়ে দিলেন। ৰোলাব্যাগ হাতড়ে বেৱ কৱে নিলেন একটা মাৰারি মাপেৰ ছুৱি। তাৱপৰ সবাইকে হতবাক কৱে দিয়ে বাঁহাতে মাস্পিৰ চুলেৰ মুঠি ধৰে ছুৱিটা ছৌঘালেন ওৱ গলায় কাছে।

হিংস্র বাষেৰ মতো গৰ্জন কৱে উঠলেন প্ৰিয়নাথ, ‘তুই যখন ওকে ছাড়বি না, তখন আমিই ওকে শেষ কৱে দেব!’

মাধুৱী ছুটে এলেন প্ৰিয়নাথেৰ কাছে। কাঁদতে-কাঁদতে ওঁৱ হাত চেপে ধৰতে চাইলেন।

প্ৰিয়নাথ এক ঝটকায় ছিটকে ফেল দিলেন মাধুৱীকে। অৱক্ষৰ গলায় চিৎকাৰ কৱে উঠলেন, ‘তোৱ হাতে তিলতিল কৱে মৰাৰ চুঁচয়ে এ অনেক ভালো। এই দ্যাখ, তোৱ আদৱেৰ মাস্পিকে আমি বৃত্তম কৱে দিচ্ছি।’

মাস্পি এতক্ষণ অসাড়-অচেতন ছিল। হঠাৎকে শুখ দিয়ে কান্নাৰ শব্দ বেয়ে এল।

প্ৰেত কঠস্বৰ কাঁদছে।

‘না! না! ওকে মাৱিস না। অমি কে বড় ভালোবাসি...ওকে মাৱিস না...।’

তুই যদি সত্যিই ওকে ভালোবাসিস তা হলে এই মুহূৰ্তে ওকে ছেড়ে দে! তোৱ মায়াৰ টানে ও শেষ হয়ে যাচ্ছ...।’

ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না শোনা গেল। সাত রঙেৰ আঙুয় রঙিন চুলেৰ ঢল ভেসে বেড়াতে লাগল ঘৱেৱ বাতাসে। বাতাস আৱও কয়েক গুণ হিম হয়ে গেল যেন।

ইনিয়েবিনিয়ে কান্নাৰ মাৰেই শোনা গেল : ‘আমি চলে যাচ্ছি...আমি চলে যাচ্ছি...।’

আৱ ঠিক তখনই নয়নপ্ৰভাৱ বাঁধানো ফটোটা টেবিল থেকে পড়ে গেল মেৰোতে। বনৰন শব্দে কাচ ভেঙে গেল।

সাবিকী চিৎকাৰ কৱে উঠেই টাল খেয়ে পড়ে গেলেন। বোধহয় অজ্ঞান

হয়ে গেলেন।

প্রিয়নাথ লক্ষ করলেন, চুলের ঢল ক্রমে আবছা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘরের উষ্ণতা বেড়ে উঠেছে আবার।

ঘরের দরজায় কারা যেন ধাক্কা দিচ্ছিল, কিন্তু সে-শব্দ এতক্ষণ কারও কানে যায়নি।

মাস্পি হঠাৎই যেন ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠল। তবে এ-কানা কোনও বাচ্চার স্বাভাবিক কানা।

প্রিয়নাথ ছুরিটা ফেলে দিলেন। মাস্পিকে তুলে নিয়ে মাধুরীর কোলে দিলেন।

মোমবাতির অন্তুত আলোয় ওঁদের ছায়া-শরীরগুলো নড়ে বেড়াচ্ছিল।

মাধুরী মেঝেকে বুকে জড়িয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। মাস্পিকে তিনি অনেক আদরের কথা বলছিলেন কিন্তু কানা মিশে শিয়ে কথাগুলো কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

অবসর ভূতনাথ ঘরের মেঝেতে বসে পড়লেন। ক্লান্ত ভাঙা গলায় বললেন, ‘প্রমথেশবাবু, আলো জ্বলে দিন। আর ত্রুজিটা খুলে দিন। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছ...।’

হতভস্ব প্রমথেশ শিথিলভাবে হেঁটে গেলেন আলোর সুইচের কাছে।

তিনি আলো জ্বালাতেই প্রিয়নাথের চোখ গেল মেঝেতে পড়ে-থাকা নয়নপ্রভার ছবির দিকে। সেটা দেখিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, ‘এ-ছবিটা নষ্ট করে ফেলবেন। ওঁর কোনও ছবি বাড়িতে না রাখাই ভালো। আশা করি মাস্পিকে আর কখনও উনি বিরক্ত করবেন না।’

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রিয়নাথ। ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। বিড়বিড় করে আবার বললেন, ‘আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছ...।’





## সামান্য কুয়াশা ছিল

আগম কোনও খবর না দিয়েই বর্ষা এবার সময়ের আগেই হাজির। আর শুধু হাজির নয়, ইনিংসের প্রথম বল থেকেই একেবারে ঝোড়ো ইনিংস খেলতে শুরু করেছে। যেমনই বৃষ্টির জোর তেমনই হাওয়ার দাপট। শুরুতে অবশ্য এতটা বোঝা যায়নি। বিকেল পড়ে আসার আগেই সুপ্রকাশ পালিতের বৈঠকখানায় সকলে এসে পড়েছেন—জগৎ শ্রীমানী, বরেন মল্লিক, বিজন সরকার আর প্রিয়নাথ জোয়ারদার। আজ ওঁরা অন্যদিনের তুলনায় একটু তাড়তাড়ি এসেছেন। ক্লারণ, আজ শোকসভা। ওঁরা এসে পৌঁছনোর কিছুটা পরে শুরু হয়েছে ঝড় আর বৃষ্টির ঘটা।

ওঁরা পাঁচজন নীচু গলায় কথা বলছিলেন। ঝঁকের কথাবার্তায় কেমন যেন একটা বিষণ্ণ সূর মাখানো ছিল। আর একইসঙ্গে সদ্য-চলে-যাওয়া মানুষটার নানান স্মৃতি ওঁদের মনে অঙ্গীরভাবে উঁকিবুঁকি মারছিল।

তিনিদিন আগে এ-পাড়ার ডাক্তান্তে উকিল বাসুদেব ভদ্র হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। ওঁর বয়েস হয়েছিল প্রায় সত্তর বছর। কিন্তু শরীর জবরদস্ত ছিল। রোজ ভোর পাঁচটায় শিরদাঁড়া টান-টান করে হেঁটে গঙ্গামানে যেতেন। ওকালতিতে অসম্ভব দাপট ছিল, জজসাহেবরাও তটস্ত

হয়ে থাকতেন। বাসুদেববাবুর সঙ্গে পাড়ার অনেকেই হাদত্যা ছিল। ওঁর আচমকা চলে যাওয়ায় অনেকেই কম-বেশি ধাক্কা খেয়েছেন। কেউ-কেউ আবার যেন ভগবানের অদৃশ্য নোটিশ দেখতে পেয়েছেন।

সুপ্রকাশ পালিতের সঙ্গে বাসুদেব ভদ্র বয়েসের তফাত থাকলেও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তা ছাড়া সুপ্রকাশবাবুদের রাঁচির জমিজমা ইত্যাদি নিয়ে বাসুদেববাবু মামলাও লড়েছিলেন। সেইজন্তই সুপ্রকাশবাবু নিজে উদ্যোগ নিয়ে সবাইকে খবর দিয়ে একটা ঘরোয়া স্মরণসভা গোছের আয়োজন করেছেন।

সুপ্রকাশ বাসুদেব ভদ্র সম্পর্কে নানা কথা বলছিলেন। অন্য চারজন একমনে ওঁর কথা শুনছিলেন। মাঝে-মাঝে সুপ্রকাশ থামলে অন্যরা নিজেদের দু-একটা মন্তব্য করছিলেন।

বরেন মল্লিক বললেন, ‘বাসুদেবদা খুব মিশুকে ছিলেন। আমার লক্ষ্মিতে যখনই যেতেন প্রাণ খুলে গল্প করতেন।’

বৈঠকখানার একটা জানলা খোলা ছিল। আমি দিয়ে ঠিক টিভির সিনেমার মতো বাইরের ঝড়বৃষ্টি দেখা যাচ্ছিলো ঝোড়ো বাতাস হঠাতই বেশ বেড়ে গেল। শনশন হাওয়া কাটার মুকুটটল বাইরে। জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট ভেতরে চুকে পড়েছিল। সেক্ষেক্ষ করে সুপ্রকাশ পালিত বিজন সরকারকে বললেন, ‘জানলাটা একটু বন্ধ করে দিন না...।’

বিজন সরকার এ-পাড়ার শাস্তি কমিটির সেক্রেটারি। বেশিরভাগ সময়েই খোশমেজাজে থাকেন। তবে এখন নিষ্পত্তি মুখে বসে আছেন।

সুপ্রকাশ পালিতের কথায় হাত বাড়িয়ে জানলার পাল্লা দুটো ভেতর থেকে এঁটে দিলেন। তারপর নীচু গলায় বললেন, ‘ভদ্রবাবুর পদবির সঙ্গে তাঁর ক্যারেক্টারের দারুণ মিল ছিল। পাড়ার ব্যাপারে কখনও আমাকে খালি হাতে ফেরাননি।’

হঠাতই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জগৎ শ্রীমানী বললেন, ‘বাসুদেবটা মারা যাওয়ার সময়েও ওকালতি পঁচ করে গেল...।’

সকলে অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকাতেই তিনি যোগ করলেন, ‘...আমাকে সমন ধরিয়ে দিয়ে গেল। জানিয়ে দিল, আমার ওভারটাইম চলছে।’

‘না, না—ও-কথা বলছেন কেন?’ সুপ্রকাশ পালিত সামাল দেওয়ার সুরে জগৎবাবুকে লক্ষ্য করে বললেন। তারপর কাচের শার্সি-আঁটা জানলার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে যোগ করলেন, ‘এরকম জোর বর্ষা এবারে এই প্রথম নামল। চার-চ’ঘণ্টার মধ্যে থামবে বলে মনে হয় না।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুপ্রকাশ। শার্সির গা বেয়ে জলের ফেঁটা গড়িয়ে নামছিল। সেই রেখার দিকে তাকিয়ে বিষম্ব গলায় বললেন, ‘আমাদের জীবনটাও যেন কাচের গায়ে জলের রেখার মতন। মাধ্যকর্যগের মতো কোনও একটা টানে কিছুক্ষণ এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলা। তারপর-তারপর সব শেষ। কী বলো, ভূতনাথ?’

প্রিয়নাথ ভীষণ চুপচাপ ছিলেন। সকলের কথা যেন শুনছিলেন, অথচ শুনছিলেন না। ওঁর চশমার কাঁচে আলো পড়ে চকচক করছিল। চশমার গাঢ় রঙের মোটা ক্রেমের সঙ্গে ভুক জোড়া যেন ঝিশেঁ-গেছে। তার ওপরে কয়েকটা ছেট-বড় ভাঁজ স্পষ্ট নজরে পড়ছে।

অনেকক্ষণ ধরে সিগারেট খেতে পারেননি বলে প্রিয়নাথের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, মুখের ভেতরটা কেমন বিস্মাদ লাগছিল। তিনি আপনমনে চুপচাপ বসে বাসুদেব ভদ্রকে খো ভাবছিলেন। সুপ্রকাশের শেষ কথাটার খেই ধরে ঠোটের কোণে দ্রুজ্জয় হাসি ফুটিয়ে বললেন, ‘মৃতেরা ছুটি নিয়ে বেড়াতে এলে সেটাকে বলা হয় জীবন। বেঁচে থাকা মানে স্বপ্ন দেখা—ঘুম ভাঙলেই মৃত্যু। বাসুদেববাবুর স্বপ্নটা বেশ লম্বা ছিল। নাকি বলব ছুটিটা বেশ লম্বা ছিল...।’

প্রিয়নাথের কথা শুনে সকলেই কেমন চুপ করে গেলেন। প্রিয়নাথ মৃত্যু নিয়ে এত ভাবেন! মৃত্যুকে যেন ওঁরা নতুনভাবে অনুভব করতে পারছিলেন। সুপ্রকাশ পালিত কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজলেন। ঘরের পরিবেশ যেন অনুভব করতে চাইলেন।

ওঁরা সকলে তক্ষপোশের ওপরে বসে ছিলেন। তার কাছাকাছি ছিল একটা হাতলওয়ালা বড় চেয়ার। চেয়ারের রং পালিশ কিছু বোঝার উপায় নেই। তার ওপরে ধূপদানিতে কয়েকটা ধূপ জুলছিল। সেই ধূপের গন্ধে ঘরের ভেতরে স্মৃতিচারণের আবহাওয়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বাসুদেব

ভদ্র সম্পর্কে ওঁরা যাঁর-যাঁর মতন করে দু-চার কথা বলছিলেন। প্রিয়নাথ চুপ করে ওঁদের কথা শুনতে লাগলেন।

প্রিয়নাথের মনে হল, ধূপের গন্ধের সঙ্গে প্রথম বৃষ্টির গন্ধ মিশে গিয়ে ঘরের ভেতরে কেমন এক অলৌকিক আমেজ তৈরি হয়ে গেছে। তিনি ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো অ্যানসনিয়া পেন্ডুলাম-ঘড়িটার দিকে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে তাকিয়ে রইলেন।

হঠাতে প্রিয়নাথ বললেন, ‘আপনারা বাসুদেববাবু সম্পর্কে নানা কথা বললেন। আমার সঙ্গে ওঁর তেমন কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবে আমার ভূত-প্রেতের নেশার কথা তিনি জানতেন। তাই একদিন নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা অজ্ঞত কাহিনি শুনিয়েছিলেন—শুনলে বিশ্বাস হবে না এমন কাহিনি...।’

এমন সময় একজন মাঝবয়েসি লোক ঘরে ঢুকল। প্রবলে ধূতি আর হাতাওয়ালা গেঞ্জি। হাতে শৌখিন ট্রে। তাতে সাজানো চা আর বিস্কুট।

সুপ্রকাশ লোকটিতে ডেকে বললেন, ‘আয়, নিরঞ্জন। সকলের হাতে-হাতে দিয়ে দো।’

নিরঞ্জন প্রত্যেকের হাতে চায়ের কাপুচিন্ট তুলে দিল। বিস্কুটের প্লেটটা নামিয়ে রাখল সকলের হাতের নাগালে। তারপর ধীরে ধীরে পা ফেলে চলে গেল।

পেন্ডুলাম-ঘড়িতে আটটার ঘণ্টা বাজল।

চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিয়ে প্রিয়নাথ নীচু গলায় বললেন, ‘বাসুদেববাবু ওকালতিতে হাতেখড়ি দেওয়ার আগে বছরখানেক নানা পেশায় যুক্ত ছিলেন। খাতা লেখার কাজ করেছেন, ওষুধের সেলস্ম্যান ছিলেন, হোটেলের ম্যানেজার করেছেন, শাড়ির দোকানে চাকরি করেছেন। খানিকটা অস্ত্রির মতির জন্যেই বোধহয় কোনও কাজেই টিকে থাকতে পারেননি। তারপর বাড়ির চাপে, আর ওঁর বাবার বকুনি খেয়ে ল’ পড়তে ঢোকেন। ব্যস, ওঁর জীবনটা একটা পথ পেয়ে গেল।

‘যে-ঘটনাটার কথা বাসুদেববাবু বলেছিলেন সেটা একটা ছোটখাটো হোটেলকে নিয়ে। তিনি তখন সেই হোটেলের ম্যানেজার ছিলেন...।’



ମୋବିଲକାର

বাসুদেবের বারবার হাই উঠছিল। এই ভয়ঙ্কর শীতে বারবার হাই তোলা মানে হিম-বাতাস বুকের ভেতরে টেনে নেওয়া। কিন্তু উপায় কী। কাউটার থেকে পাতাতাড়ি গুটিয়ে যে সরে পড়বেন তার উপায় নেই। ঠিক রাত এগারোটায় মালিকের ফোন আসবে। উনি দেখতে চান কঁটায়-কঁটায় রাত এগারোটা পর্যন্ত তাঁর হোটেল খোলা আছে কি না। বাসুদেবকে যে চোদোশো টাকা মাস-মাইনে দেন, তার পাইপয়সা পর্যন্ত কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করে নেন। কিন্তু কাস্টমার কোথায়! খোলা দরজা দিয়ে শুধু অন্ধকার রাত আর শীতের হালকা কুয়াশা চোখে পড়ছে। আর কখনও-কখনও দিল্লি রোড ধরে ছুটে যাওয়া ট্রাকের ছালাটে হেডলাইট।

যে-রাত্তাটা দিল্লি রোড থেকে ডানকুনির দিকে ঘুরে গেছে তারই বাঁকে দাঁড়িয়ে আছে বাসুদেবের হোটেল। দোতলা স্টেট যে অত্যন্ত কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তার জরাজীর্ণ চেহারার দিকে তাকালেই স্পিডলাইটসের প্রেক্ষিত বলে মনে হয়। হোটেলের পলেস্টারা থেকে শুরু করে জল-কলালোর ব্যবস্থা পর্যন্ত সবই নড়বড়ে অগোছালো।

হোটেলটার নাম ‘দ্য হোস্ট’। সদর দরজায় তেরছা হয়ে থাকা রং-চটা একটা সাইনবোর্ডে ইংরেজি হরফে নামটা লেখা আছে। এ-হোটেলের ম্যানেজারিতে জয়েন করার পর থেকেই বাসুদেবের বারবার সাধ হয়েছে, হোটেলের নামের আগে একটা ‘জি’ হরফ বসিয়ে ‘দ্য গোস্ট’ করে দেন। বেকার জীবনের টানাপোড়েন ঘোঢাতে কপাল ঠুকে এখানে কাজে লেগে গেছেন বটে, কিন্তু এখানে কাজ বলতে তেমন কিছু নেই। সারাদিন শুধু পালিশ-চটা কাউন্টারে বসে থাকে আর রাত্তার গাড়ি গোনো। আর মাঝে-মাঝে সাতকাজের ফরমাশের লোক এবং রাঁধুনি পঞ্চাননকে ডেকে একটু তমি করো।

বাসুদেব আরশোলাকে যথেষ্ট ভয় পান। কেন তিনি জানেন না। এ

অনেকটা যেন মন্ত্রশক্তির মতো। যারা আরশোলা ভয় পায়, তারা জানে না কেন। আর, যারা ভয় পায় না, তারাও জানে না তার কারণ কী। এ-হোটেলে সুপ্রচুর আরশোলা আছে—নানা মাপের, নানা ধরনের। ফলে বাসুদেব আর পঞ্চানন বেশ ভয়ে-ভয়ে দিন কাটান। এবং রাতও।

হোটেলের মালিকের নাম হরেকৃষ্ণ মণ্ডল। জঘন্যরকম বড়লোক। তবে নানান কুসংস্কারে ভোগেন। আর ধর্ম-কর্ম নিয়ে থাকেন। অস্তত বাইরে থেকে দেখে তাই মনে হয়।

‘দ্য হোস্ট’-এ হরেকৃষ্ণবাবু মাসে মাত্র একবার আসেন। হিসেবপত্র বুঝে নিয়ে চলে যান। তাঁর অন্যান্য আরও জমকালো ব্যবসা আছে। সেগুলো নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন। তবে তাঁর নিয়মের এতটুকু নড়চড় হওয়ার জো নেই।

যেমন, চুকে থেকেই বাসুদেব দেখছেন এ-হোটেলে একটা নিয়ম চালু আছে। হোটেল কখনও ফাঁকা রাখা চলবে না—কমন্টেক্স থাতায়-কলমে। অর্থাৎ, সব ঘর ফাঁকা থাকলেও অস্তত দুটো সব ভরতি বলে সবসময় দেখাতে হবে। কারণ, হোটেলে কোনও নেতৃত্ব যদি এসে দ্যাখে সব ঘরই ফাঁকা, তা হলে সে হয়তো ঘৰান্ধে গিয়ে এ-হোটেলে আর উঠবে না। অন্য কোনও হোটেল খুঁজবে

যুক্তিহীন কুসংস্কার। কিন্তু কোনও উপায় নেই।

সেই কারণেই হরেকৃষ্ণবাবুর ঠিক করে দেওয়া দুটো কান্নিক নাম-ঠিকানা সবসময় হোটেল-রেজিস্টারে লেখা থাকে। অরিন্দম পোদ্দার, পাদরীপাড়া, চন্দননগর, ইগলি। আর কালাঁচাদ নক্ষর, ব্ৰহ্মপুৰ, গড়িয়া। প্রথমজনকে আপাতত রাখা হয়েছে কুম নম্বৰ বারোয়—দোতলার দ্বিতীয় ঘরে। আর কালাঁচাদ নক্ষর আছেন তেরো নম্বৰ ঘরে। অর্থাৎ দোতলার তিন নম্বৰ ঘরে।

হোটেলে মোট সাতটা ঘর। একতলায় তিনটে, দোতলায় চারটে। তার মধ্যে একটা সিঙ্গল, বাকিগুলো ডাবল-বেড-এর ঘর। একতলার সিঙ্গলটায় বাসুদেবের থাকার কথা। তাই-ই থাকেন। তবে বেশিরভাগ সময়েই ঘর ফাঁকা থাকে বলে দোতলার চার নম্বৰ ঘরটায় তিনি রাত কাটান। ওই

ঘরটায় দুটো জানলা বেশি আছে। হাওয়া-বাতাস ঠিকমতো খেলতে পারে। আর আরশোলার ভয় কম।

বাসুদেব শীতকাতুরে মানুষ। উলিকটের গেঞ্জি, ফুলহাতা সোয়েটার, মাফলার ইত্যাদি চড়িয়েও ওঁর শীত যাচ্ছিল না। তার ওপরে ঘুমে চোখ বুজে আসতে চাইছিল। বারবার রিসেপশনের দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছিলেন। এগারোটা বাজতে এখনও মিনিট পনেরো মতন বাকি, পঞ্চানন বোধহ্য এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর জন্য সিঁড়ির নীচের একটা খুপরি বরাদু করা আছে। একটু আগেই ও বলে গেছে, বাসুদেবের রাতের খাবার ঘরে ঢাকা দেওয়া আছে।

সুতরাং শীত এবং একঘেয়েমিতে ক্লান্ত বাসুদেব দেওয়াল-ঘড়ির মিনিটের কাঁটার সঙ্গে হাত ধরে হাঁটছিলেন। কতক্ষণে ওটা বারেক্সের দাগে পৌঁছবে?

ঠিক তখনই ওরা এল।

খোলা দরজার ফ্রেমে কালো অন্ধকারের পটভূমিতে ঠিক ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকা একজন পুরুষ ও একজন মাহলাকে দেখতে পেলেন বাসুদেব। দেখে খানিকটা চমকে উঠে ওরা যেন আচমকা হাজির হয়েছে দরজায়। কারণ, বাসুদেব ওরুর হেঁটে আসতে দেখেননি! কখন কোথা দিয়ে দরজার কাছে চলে এল ওরা!

সামান্য কুয়াশা গায়ে মেখে পুরুষ ও মহিলাটি ভেতরে ঢুকল। খানিকটা যেন ছন্দে পা ফেলে চলে এল কাউন্টারের সামনে—বাসুদেবের খুব কাছে। বাসুদেব উগ্র পারফিউমের গন্ধ পেলেন।

ওদের দেখে বাসুদেবের কেমন যেন সন্দেহ হল। ওরা কি অবিবাহিত দম্পতি? এ-হোটেলে রাত কাটাতে এসেছে? কিন্তু ওদের পোশাক-আশাক ভারী অস্ত্রুত।

পুরুষটির বয়েস তিরিশের এপিঠ-ওপিঠ। ইয়োরোপীয় ধাঁচের কাটা-কাটা মুখ। চওড়া কাঁধ। চোখ ছোট-ছোট, কিন্তু চাউনি যেন বর্ণার ফলা। মাথার চুল তেল-চকচকে। টান-টান করে পিছনাদিকে আঁচড়ানো। দাড়ি-গোঁফ কামানো তামাটে মুখে কেমন যেন ফ্যাকাসে ভাব। আর চোয়ালের

হাড় সামান্য উঁচু হয়ে থাকায় মুখে একটা নিষ্ঠুর ভাব ফুটে উঠেছে।

সঙ্গের মেয়েটির বয়েস পঁচিশ কি ছাবিশ। ফরসা, রোগা, ছেটখাটো চেহারা। এলানো চুল। চোখের পালক অস্বাভাবিকরকম দীর্ঘ। গালে হালকা লালচে ভাব। কপালে বড় টিপ।

পুরুষটির গায়ে চেক-চেক ফুল-হাতা শার্ট, তার ওপরে একটা সাধারণ হাত-কাটা সোয়েটার। আর মেয়েটি সিঙ্কের শাড়ির ওপরে একটা মামুলি শাল জড়িয়ে রেখেছে।

এই ভয়ংকর হাড়কাপানো শীতে এইরকম সাধারণ শীতের পোশাক পরে কী করে এরা চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে? এই প্রশ্নটাই বাসুদেবের মনে প্রথম দেখা দিল।

ওদের মুখ এতই স্বাভাবিক যে, মনেই হচ্ছে না প্রচণ্ড ঝঙ্কাঝড় ওদের এতটুকুও কষ্ট হচ্ছে। যদি ওরা 'দ্য গোস্ট'-এ উঠে শ্রেণ্টন-দ্য দিন ফুর্তি করতে চায় তো করুক। মনে-মনে ভাবলেন বাসুদেব এরকম অনেক জোড়া পায়রাই এখানে রাত কাটাতে আসে। অত বাছবিচার করতে গেলে বিজনেস চলে না। হরেকৃষ্ণ মণ্ডল প্রথমেই বাসুদেবকে এ-কথা জানিয়ে দিয়েছেন। শুধু কোনওরকম গোলমাল ঝুঁজুত না হলেই হল।

পুরুষটির প্রথম প্রশ্নে বাসুদেব স্তুতি হয়ে গেলেন। ওঁর বুকের ভেতরে ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। গলা শুকিয়ে জিভটা গিরগিটির চামড়া হয়ে গেল পলকে।

'অরিন্দম পোদার নামে কেউ এ-হোটেলে এসে উঠেছে?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল পুরুষটি।

বাসুদেবের মাথা গুলিয়ে গেল। হোটেলের খাতায় গত তিন মাস ধরেই তো এই ভুয়ো নামটা লেখা রয়েছে! এর আগেও বছ বছর ধরে হরেকৃষ্ণ মণ্ডল হয়তো এই নামটা চালিয়েছেন। কিন্তু কোনওদিন কেউ এই কান্নানিক বোর্ডারের খৌজ করতে আসবে এ-কথা বাসুদেব কখনও আঁচ করতে পারেননি। এখন কী জবাব দেবেন এই প্রশ্নের?

'খাতা দেখে জলদি বলুন।' প্রায় ধৰ্মক দিয়ে উঠল পুরুষটি, 'অরিন্দম পোদার নামে কেউ উঠেছে কি না দেখুন—।'

সব জেনেশনেও খাতা খুললেন বাসুদেব। তিনি বলতেই পারতেন, ‘আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।’ কিন্তু পুরুষটির চেহারা এবং গলায় এমন একটা কিছু ছিল যে, বাসুদেব কেমন যেন ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গেলেন। ওঁর মনের কোণে একটুকরো সন্দেহ উঁকিবুকি দিল : এরা পুলিশের লোক নয় তো!

খাতা খুলে খুঁটিয়ে দেখার ভান করে বাসুদেব বললেন, ‘হাঁ—আছেন। দোতলার বারো নম্বর রুমে।’

পুরুষটি মেয়েটির দিকে তাকাল। অঙ্গুতভাবে হাসল। উত্তরে মেয়েটিও সামান্য হাসল। যেন কোনও গোপন ইশারা চালাচালি হল দুজনের ভেতরে।

এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুললেন বাসুদেব। হরেকৃতি মণ্ডলের ফোন।

ওরা দু-জন তীব্র চোখে বাসুদেবকে দেখছিল। বাসুদেব কোনওরকমে ‘হঁ-হঁ’ বলে ফোনে কথা শেষ করলেন।

রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে-সঙ্গে দেখালে-ঘড়িতে এগারোটার ঘণ্টা বাজতে শুরু করল।

ঘণ্টা বাজার শব্দ শেষ হলে পুরুষটি নীচু গলায় বলল, ‘আমরা পুলিশের লোক। কাউকে এ-কথা জানাবেন না। আমরা অরিন্দম পোদারকে একটা ক্রাইমের ব্যাপারে অ্যারেস্ট করতে এসেছি।’

বাসুদেব ফ্যালফ্যাল চোখে পুরুষটির দিকে তাকিয়ে ওর কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ওঁর মগজে কথাগুলো ঠিকমতো পৌঁছেছিল না। কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

‘আজ রাতটা আপনার হোটেলে আমারা থাকব। আমাদের নাম-ধার্ম খাতায় লিখে নিন। সবাই জানবে আমরা অর্ডিনারি বোর্ডার।’

‘সবাই’ বলতে তো শুধু পঞ্চানন! আর খাতায় নাম-ধার্ম লিখলে তো মালিককে পয়সার হিসেব দিতে হবে! বাসুদেব মনে-মনে ভাবলেন।

পুরুষটির যেন বাসুদেবের মনের কথা বুঝতে পারল। পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে বাসুদেবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,

‘অরিন্দম পোদারের পাশের ঘরটাই আমাদের দেবেন। তা হলে আমাদের কাজের সুবিধে হবে’।

বাসুদেব টাকাটা নিয়ে ড্রয়ারে রাখলেন। ব্যালান্সটা ফেরত দেওয়ার জন্য ড্রয়ার হাতড়াচ্ছিলেন, পুরুষটি বলল, ‘বাকিটা রেখে দিন। বয়-বেয়ারাদের বকশিশ দিয়ে দেবেন।’

বাসুদেব খাতার সঙ্গে সুত্লি দিয়ে বাঁধা ডট পেন্টা বাগিয়ে ধরে ওদের নাম জানতে চাইলেন।

পুরুষটি হেসে বলল, ‘আমার নাম কালাচাঁদ নক্ষর, আর ওর নাম লিখুন রীতা...রীতা নক্ষরই লিখুন। তা হলে সবাই হাজব্যান্ড-ওয়াইফ ভাববে।’

বাসুদেব লিখবেন কী! ওঁর হাতে ধরা কলমটা তখন ক্ষেত্রের কলম হয়ে গেছে। চোখের সামনে গোটা দুনিয়াটা যেন টলে উঠে। পাছে মাথা ঘুরে পড়ে যান, তাই বাঁ-হাতে কাউন্টারটা শক্ত কর্লে চেপে ধরলেন।

নামটা তিনি ঠিক-ঠিক শুনেছেন তো! কালাচাঁদ নক্ষর! খাতার দ্বিতীয় কান্ননিক মানুষট জ্যান্ত হয়ে চোখের সামনে দেখা দিয়েছে! আজ কি মদ্যা, নাকি ভূত চতুর্দশী? বাসুদেবের ক্ষেত্রে কেমন পাগল-পাগল লাগছিল।

‘লিখুন—’ তাড়া দিল পুরুষটি। কালাচাঁদ নক্ষর, রীতা নক্ষর। আর ঠিকানা যা-হোক কিছু একটা বাময়ে-টানিয়ে লিখে দিন। তবে অরিন্দমের পাশের ঘরটাই চাই কিন্ত।’

অতি কষ্টে বাসুদেব লিখতে পারলেন। খাতায় লেখা কালাচাঁদ নক্ষরের নামের নীচে রীতা নক্ষর লিখে দিলেন। তবে সই করার জন্য খাতাটা ওদের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন না। কারণ, কালাচাঁদ নক্ষরের কান্ননিক সইটা আগে থেকেই করা রয়েছে।

কিন্ত কালাচাঁদ এবং রীতা উলটো দিকে দাঁড়িয়েও ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। কারণ ওরা দুজনেই কেমন ঠোঁট টিপে হাসছিল।

‘তেরো নম্বর ঘরটা আপনাদের দিলাম।’ কোনওরকমে বলতে পারলেন বাসুদেব, ‘আপনারা কি ডিনার করবেন? তা হলে কাছেই একটা ভালো ধারা আছে—সারা রাত খোলা থাকে। ওখান থেকে খাবার আনিয়ে দেব।

আমাদের এখানে খাবারের কোনও ব্যবস্থা নেই।'

রীতা সাততাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না—আমরা ডিনার সেরে এসেছি।'

পারফিউমের গঞ্জে বাসুদেবের মাথা বিমবিম করছিল। খাতা-পেন একপাশে গুঢ়িয়ে রেখে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে দেওয়ালের কীবোর্ড থেকে তেরো নম্বর রুমের চাবিটা পেড়ে নিলেন। পঞ্চানন নিশ্চয়ই এতক্ষণে নাক ডাকা শুরু করে দিয়েছে। ওকে বিরক্ত করে আর লাভ নেই। সুতরাং বাসুদেব কাউন্টারের পিছন থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। হোটেলের সদর দরজাট ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে বাইরের আলোটা নিভিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'চলুন, আমিই আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই। আমাদের বেয়ারাটা ঘুমিয়ে পড়েছে।'

ওদের নিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে রওনা হতে যাবেন, ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার বাসুদেবের নজরে পড়ল।

রিসেপশনের আলোটা তেমন জোরালো নয় একটি মাত্র টিউব লাইট—তার আবার একটা দিক কালচে হচ্ছে গেছে। কিন্তু তার সন্ত্রেও বাসুদেবের দেখতে ভুল হল না।

রীতা বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে কালঙ্গিদিকে কিছু একটা বলছিল। ফলে বাসুদেব ওর মুখের ডানপাশটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। রীতার কানের ওপর থেকে চুল সরে গেছে একপাশে। তাই কানের গহুরটা সরাসরি নজরে পড়ছে। সেই গহুরের মুখে ছোট মাপের একটা মাকড়সার জাল। যেন কোনও গুহার মুখ আগলে মাকড়সার জালটা তৈরি হয়েছে।

এবং সেই জালের কেন্দ্রবিন্দুতে, একটা খুদে মাকড়সা সামান্য নড়াচড়া করছে।

বাসুদেব কেন যে ভয় পেলেন তা বুঝতে পারলেন না। কল্পনায় কানের গহুরটাকে তিনি ধূলিমলিন কোনও প্রাচীন সুড়ঙ্গ বলে ভাবছিলেন। মাকড়সার জাল ছিঁড়ে তার ভেতরে মনে-মনে চুকে পড়েছিলেন তিনি। অজানা ভয়ংকর কিছু আবিষ্কারের ভয়ে বারবার কেঁপে-কেঁপে উঠছিলেন।

রীতা মাথা ঝাঁকাল। ওর চুল ঝটকা মেরে সরে এল কানের ওপরে।

মাকড়সার জালটা ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু বিচিত্র এক আতঙ্ক বাসুদেবের হৎপিণ্ডটাকে আঠালো কাগজের মতো আঞ্চেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রইল।

হোটেলের ফাঁকফোকর দিয়ে কুয়াশা আর শীত পা টিপে-টিপে চুকে পড়ছিল। বাসুদেব হঠাতেই শিউরে উঠলেন।

সেটা লক্ষ করে কালাঁচাদ বলল, ‘কী হল, মশাই। এই শীতেই কাবু হয়ে পড়ছেন! আমাদের ওখানে গেলে বুবাতেন ঠাণ্ডা কাকে বলে!’

রীতার সঙ্গে চোখাচোখি হল কালাঁচাদের। ওরা দুজনে একইসঙ্গে হেসে উঠল। হাসির দমকে ওদের ছিপছিপে শরীর দুটো সাপের মতো এঁকেবেঁকে যাচ্ছিল।

‘আমাদের ওখানে’ মানে! বাসুদেব কালাঁচাদের কথাটার মানে বুবাতে চাইলেন। কিন্তু কী ভেবে ওদের আর কিছু জিগ্যেস করলেন না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে রীতা জানতে চাইল, ‘অরিন্দম পোদার কবে এখানে এসে উঠেছে?’

‘পরশুদিন...সঙ্কেবেলা...।’ বাসুদেব মরিয়া হয়ে গল্প তৈরি করছিলেন। যা মনে আসে তাই বলছিলেন।

‘ওর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?’

‘না।’

এবার কালাঁচাদ নক্ষর বলল, ‘অরিন্দম পোদারকে দেখে কি আপনার মনে হয়েছে যে, ও ভয় পেয়েছে?’

কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন বাসুদেব। এভাবে বাতাসে কতক্ষণ দুর্গ তৈরি করা যায়! আন্দাজে গল্প বলার তো একটা সীমা আছে! কিন্তু কিছু একটা তো বলতেই হয়! অতএব বললেন, ‘ঘর ছেড়ে উনি খুব একটা বেরোন না। তবু দু-একবার যা দেখেছি তাতে ভয় পেয়েছেন বলে মনে হয়নি...।’

তেরো নম্বর ঘরের দরজায় ওরা তিনজন পৌছে গিয়েছিল। বাসুদেব যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নাইট ল্যাচ খুলে ওদের ঘর দেখিয়ে দিলেন।

কিন্তু ফিরে আসার পথে আর-একবার হোঁচ্ট খেলেন বাসুদেব।

বারো নম্বর ঘরের দরজার নীচ দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে না!

বাসুদেবের পা আর কাজ করছিল না। আজ রাতে এসব কী শুরু হয়েছে! যারা নেই—কোনওদিন ছিল না—তারা সব একে-একে হাজির হচ্ছে! নাকি তিনিই ভুল করে কোনও এক সময়ে বারো নম্বর ঘরের আলো জ্বলে গেছেন!

থানিক ইতস্তত করে ভয়ে-ভয়ে ঘরের কলিংবেল টিপলেন বাসুদেব।

টুং-টাং শব্দ শেষ হতেই ভেতর থেকে ভারী গলায় কেউ সাড়া দিল।  
‘কে?’

বাসুদেবের পাকস্থলীতে কেউ যেন বরফের ছুঁচ ফোটাতে শুরু করল।  
ওঁর হাত কাঁপতে লাগল থরথর করে। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল।  
অনেক চেষ্টায় গলা দিয়ে স্বর বের করতে পারলেন তিনি।

‘আমি, স্যার—হোটেলের ম্যানেজার।’

‘কী চাই?’ রুক্ষ প্রশ্ন ভেসে এল বন্ধ দরজার প্রান্তিট থেকে।

‘আমার রেজিস্টারে মনে হয় একটু গোলমাল হয়ে গেছে, স্যার।  
আপনাকে কি আমি বারো নম্বর ঘরই দিয়েছিলাম?’

‘তাই তো মনে হয়।’

‘আপনার নামটা কাইভলি বলবেন স্যার। রেজিস্টারের সঙ্গে একটু  
চেক করে নেব—।’

‘অরিন্দম পোদার...।’

নামটা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই বন্ধ দরজা খুলে গেল।

এবং অপার্থিব এক হিমেল বাতাসের ঝাপটা বাসুদেবকে অসাড় করে  
দিতে চাইল।

অরিন্দম পোদারকে ভালো করে দেখতে চাইলেন বাসুদেব। কিন্তু  
দেখতে পেলেন কি?

মাথায় ঘোমটা মুড়ি দিয়ে চাদর জড়ানো। তাতে মুখের অনেকটাই  
আড়াল হয়ে গেছে। তার ওপরে চোখে কালো চশমা। ঘরের আলোটা  
মাথার ঠিক পিছনে থাকায় মুখটা অস্পষ্ট অন্ধকার দেখাচ্ছে।’

‘আর কিছু জানতে চান?’ সামান্য ফ্যাসফেন্সে গলায় প্রশ্ন করল  
অরিন্দম।

‘না, স্যার।’ মাথা নাড়লেন বাসুদেব।

সঙ্গে-সঙ্গে দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু তার আগেই একটা জিনিস বাসুদেবের নজরে পড়েছিল। অরিন্দমের চাদরে আর ঘরের মেঝেতে সাদা রঙের গুঁড়ো-গুঁড়ো কী যেন ছড়িয়ে রয়েছে। নুন, চিনি, নাকি মিঞ্চ পাউডার? বন্ধ কোনও কৌটো জোর করে খুলতে গিয়ে ওরকম ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছে?

এলোমেলো বহু কথা ভাবতে-ভাবতে নীচে নেমে এলেন বাসুদেব। ওঁর শরীর তখনও কাঁপছিল। কতটা শীতে, কতটা ভয়ে তা বলা মুশকিল।

কাউন্টারের কাছে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। ফোন করে ব্যাপারটা কি মালিককে জানানো যায়? উনি কি আদৌ বিশ্বাস করবেন? আর যদিও বা বিশ্বাস করেন, তা হলে কাল সকালের আগে কিছু করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া কালাচাঁদ আর রীতা যদি সত্যি-সত্যি পুলিশের লোক হয় তা হলে পুলিশে খবর দিলে সেটা হাস্যকর সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু রীতার কানের মাকড়সার জালটা কি অস্বাভাবিক নয়? অরিন্দমের চাদরের সাদা-সাদা গুঁড়োগুলোই বা কী?

এইসব উলটোপালটা ভাবনা বাসুদেবের বুকের ভেতরে উথালপাথাল ঢেউ তুলছিল। একবার ভাবলেন পেঞ্চাননের পাশটিতে গিয়ে শুয়ে পড়বেন। কিন্তু তারপরই আবার মনে হল, না, ওপরের ঘরে শোওয়াই ভালো। যদি রাতে কোনও কাণ্ড হয় তা হলে বাসুদেব জানতে পারবেন। আসলে ভয়ের পাশাপাশি কোতৃহলও বাসুদেবের মনে মাথাচাড়া দিচ্ছিল। অরিন্দম পোদার যদি সত্যি-সত্যিই একজন মারাত্মক ক্রিমিনাল হয়, তা হলে কালাচাঁদ আর রীতা কি ওকে এখানেই অ্যারেস্ট করবে? কী করেছে অরিন্দম—খুন, চুরি, ডাকাতি? ও যদি মারাত্মক ক্রিমিনাল হয়, তা হলে ওকে অ্যারেস্ট করতে গেলে তো রিভলভার ইত্যাদি দরকার! অথচ কালাচাঁদ আর রীতা এ-হোটেলে এসে উঠেছে কোনও লাগেজ ছাড়াই। প্যাটের পকেটে অথবা কোমরে কোনওরকম অস্ত্র লুকোনো আছে বলে তো মনে হয়নি!

আরও আধঘণ্টা পর নিজের ঘরের দিকে রওনা হলেন বাসুদেব।

নিজের ঘর বলতে চোদ্দো নম্বর ঘর—কালাঁচাদ আর রীতার পাশের ঘরটা।

পা টিপে-টিপে ওপরে উঠে এলেন আবার। খিদেয় পেট চুইচুই করছিল। সুতরাং ঘরে ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছাড়লেন। উলিকট গেঞ্জির ওপরে হাতকাটা সোয়েটার চাপিয়ে তার ওপরে শাল জড়ালেন। তারপর খাওয়াওয়া সেরে নিলেন।

অন্যদিন হলে এরপর ঘুম। এবং বিছানায় শোওয়ামাত্রই ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির দাপট শুরু।

কিন্তু আজ? আজ দু-চোখের পাতা এক হয় কই!

ঘরের আলো নিভিয়ে বিছানায় অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করলেন বাসুদেব। তারপর...রাত তখন কত ঠিক বলা মুশকিল...শুনতে পেলেন তীব্র শিসের শব্দ। আওয়াজটা এত মিহি যে, কানের প্রদূষণ যেন ফুটো করে দিতে চায়।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন বাসুদেব। ঘরের আগোয়া অ্যাটাচ্ড বাথে ঢুকে পড়লেন। ফলে দ্বিতীয় শিসের শব্দটা বেশ জোরে শোনা গেল। কারণ, তেরো আর চোদ্দো নম্বর মুক্কির বাথরুম দুটো গায়ে-গায়ে লাগানো। এমনকী বেয়ে উঠে সামান্য চেষ্টা-চরিত্র করলে এ-বাথরুম থেকে ও-বাথরুমে ঢুকে পড়া যায়।

পরের বাথরুমে উকি মারার স্বভাব বাসুদেবের কোনওকালেই ছিল না। কিন্তু এখন, এই অস্তুত রাতে, একটা অচেনা আকর্ষণ ওঁকে নীতি থেকে সরিয়ে দিল। অঙ্কারের মধ্যেই জলের পাইপে পা দিয়ে বাথরুমের দেওয়াল বেয়ে উঠে পড়লেন। ভেন্টিলেটারের কাচের পাল্লা খুব সাবধানে ঢেলে সরিয়ে পাশের বাথরুমে উকি মারলেন।

যে-দৃশ্য বাসুদেব দেখতে পেলেন, সন্দেহ নেই, সেটা ভারী অস্তুত।

পাশের বাথরুমে কেউ নেই। বাথরুমের পাল্লা খোলা। সেই খোলা অংশ দিয়ে ঘরের বেশ খানিকটা নজরে পড়ছে। ঘরের মেঝেতে সাদা রঙের গুঁড়ো-গুঁড়ো কী যেন ছড়িয়ে আছে। আর গোটা ঘরে নীল আলোর এক অলৌকিক আভা খেলে বেড়াচ্ছে। সেই আলোর আভা ঘরের

কোনও-কোনও জায়গায় কমে গেলে তবেই গুঁড়োগুলোকে সাদা রঙের বলে চেনা যাচ্ছে।

বাসুদেব বোধহয় কৌতুহলে উন্মাদ হয়ে গেলেন। কারণ, গায়ের চাদর খুলে ফেলে দিয়ে শরীরটাকে সরীসৃপের মতো ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিলেন। তারপর খুব সাবধানে দেওয়াল আর জলের পাইপ অঁকড়ে নেমে পড়লেন তেরো নম্বর ঘরের বাথরুমে।

একটা তুচ্ছ জিনিস বাসুদেবকে অবাক করল।

বাথরুমের মেঝে খটখটে শুকনো। সেখানে জলের কোনও ছিটেফোঁটাও নেই। অর্থাৎ, এসে থেকে কালাঁচাদ বা রীতা বাথরুম ব্যবহার করেনি!

বাথরুমের পাল্লার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি মারলেন বাসুদেব।

ঘরের ঠিক মাঝখানে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রীতাঁজ্জেটজোড়া ছুঁচলো করে শিস দিচ্ছে। আর কালাঁচাদ মূকভিনেতৱু ভঙ্গিতে ধীরে-ধীরে পা ফেলে এগিয়ে আসছে রীতার কাছে। ওদের মজ্জিনের শরীর থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে উজ্জ্বল নীল আলো।

রীতার খুব কাছে পৌঁছে যাওয়ামাত্রই কালাঁচাদের ঠোঁটজোড়া ছুঁচলো হল। কিসিং গোরামি মাছের মতো শুক্র ঠোঁটে ঠোঁট এঁটে চুমু খেল। ওদের ঠোঁটজোড়া যেন লোহা অৱৰ চুম্বকের মতো গায়ে-গায়ে সেঁটে গেল। এবং একইসঙ্গে শিসের শব্দ থেমে গেল।

তারপর ওরা পায়ে-পায়ে পিছোতে শুরু করল। কিন্তু কী আশ্চর্য! ওদের ঠোঁটজোড়া একই অবস্থায় পরস্পরের গায়ে এঁটে রইল। শুধু কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় ওদের ঠোঁটের অংশ ইলাস্টিকের মতো লম্বা হয়ে ওদের শরীর দুটোর মাঝের দূরত্ব বাড়াতে লাগল।

হঠাৎই একটা ‘চকাঁ’ শব্দ হয়ে ঠোঁট দুটো ছেড়ে গেল। কালাঁচাদ আর রীতা বেহালার ছড় টানা তারের মতো তিরতির করে কাঁপতে লাগল। আর পাউডারের মতো মিহি সাদা গুঁড়ো ঘরময় উড়তে লাগল।

শীতে কেঁপে উঠলেন বাসুদেব। এবং তখনই সাদা গুঁড়োগুলোকে কুচো বরফ বলে চিনতে পারলেন। অরিন্দমের চাদরে আর ঘরের মেঝেতে তা হলে বরফকুচি ছড়িয়ে ছিল! এ ঘরের মেঝেতেও তাই। তা হলে কি...তা

হলে . কি... ?

রীতা এবার মুখ খুলল।

‘অরিন্দমকে এবার ডেকে নিয়ে আসি। ও কী বলতে চায় ওর মুখ  
থেকেই শোনা যাক।’

খিলখিল করে বিন্দুপের হাসি হাসল কালাঁচাদঃ ‘কী আর বলবে!  
আমি ওর বাজে কথা শুনতে চাই না। আমি গয়নার ভাগ চাই। ও-  
দোকান থেকে আমরা যা হাতিয়েছি তা প্রায় চলিশ-পঞ্চাশ লাখ টাকার  
গয়না হবে...।’

‘আর আমাকে যে তুমি ওর কাছে থেকে হাতিয়েছ! চোখ মটকে  
বলল রীতা। অচেনা এক শীতের হাওয়া বুকের ওপর থেকে ওর শাড়ির  
আঁচল উড়িয়ে দিল।

‘আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবাসা দিয়ে কাছে পেয়েছি—কারও  
কাছ থেকে ছুরি করে নয়।’

কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গেই দুটো শরীর বিদ্যুৎঘলকের মতো ছুটে  
এল সামনে। সংঘর্ষ হল, কিন্তু কোনও শব্দ কোল না। তারপর বাসুদেবকে  
স্তুতি করে দিয়ে দুটো শরীর নাইজের দড়ির মতো পাক খেয়ে  
গায়ে-গায়ে জড়িয়ে গেল। প্রায় দশ সেকেন্ড ধরে চলল ওদের  
ভালোবাসাবাসি। তারপর ওরা পরম্পরাকে ছেড়ে দিয়ে আবার স্বাভাবিক  
হয়ে দাঁড়াল।

‘চলো, এবার অরিন্দমকে নিয়ে আসি।’ বলল কালাঁচাদ।

সঙ্গে-সঙ্গে ওদের চারটে হাত লম্বা হয়ে খেয়ে গেল বারো নম্বর-  
আর তেরো নম্বর ঘরের পার্টিশন ওয়ালের দিকে।

একতাল ময়দার মধ্যে যেভাবে লোকে হাত ঢুকিয়ে দেয় ঠিক  
সেভাবেই চারটে হাত গেঁথে গেল দেওয়ালে। এবং পরমুহূর্তেই একটা  
অব্যবহীন শরীর টেনে নিয়ে এল ঘরের ভেতরে।

বাসুদেব দেখলেন, দেওয়ালটা যেন রবারের তৈরি। একটা চাদরের  
মতো টান-টান হয়ে অরিন্দমকে মুড়ে রয়েছে। সেই রবারের চাদরের  
আড়ালে অরিন্দমের দেহটা প্রাণপণ ছটফট করে চলেছে, নিজেকে ছাড়িয়ে

নিতে চাইছে।

কিন্তু রীতা আর কালাঁচাদ নাছোড়বান্দা। অরিন্দমের চেষ্টা দেখে ওরা মজা পেয়ে হেসে উঠল। তারপর এক হাঁচকা টানে অরিন্দমকে দেওয়ালের চাদর ছিঁড়ে বের করে নিয়ে এল বাইরে।

হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস পাক খেতে লাগল ঘরের ভেতরে। বাসুদেবের ঢোয়াল থরথর করে কাঁপছিল। দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগে বিশ্রীরকম শব্দ হচ্ছিল।

অরিন্দমের পরনে সেই একই পোশাক। গায়ে চাদর মুড়ি দেওয়া, চোখে কালো চশমা। আর পায়ে হালকা নীল রঙের পাজামা।

ওকে খাটের ওপরে বসিয়ে রীতা আর কালাঁচাদ ওর দু-পাশে দাঁড়াল।

কালাঁচাদ প্রশ্ন করল, ‘গয়নাগুলো কোথায়?’

‘আমার কাছে নেই।’ রুক্ষ বিরক্ত স্বরে জবাব দিল অরিন্দম। তারপর হঠাৎই চোখ থেকে কালো চশমাটা এক ঝটকায় ফেলল ফেলল।

বাসুদেব অবাক হয়ে দেখলেন, অরিন্দম পোদারের বাঁ-চোখের মণি ঘোলাটে সাদা। বড়সড় টল গুলির মতো দুশটা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কালাঁচাদ রীতার দিকে তাকিয়ে দৃঢ় যেন ইশারা করল। তারপর ওরা দুজনে অরিন্দমের কাছ থেকে চার-পাঁচ পা করে পিছিয়ে গেল। তারপর ওর দুজনেই ডান হাতের পাতা মেলে আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে অরিন্দমকে তাক করল।

দুশটা আঙুলের ডগা থেকে সবুজ শিখার বিদ্যুৎ-বিলিক ধ্রেয়ে গেল অরিন্দমের দিকে। আর তৎক্ষণাৎ ওরা তিনজনেই পোশাকহীন হয়ে গেল। কিন্তু ওদের নিরাবরণ চেহারা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন বাসুদেব। তিনটে নগ্ন শরীর আপাদমস্তক স্বচ্ছ বরফ দিয়ে তৈরি। যেন কাটগ্লাসের তৈরি তিনটে ভাস্কর্য। তা থেকে নীল আলো প্রতিফলিত হয়ে ঠিকরে পড়ছে। স্বচ্ছ শরীরের কোনও কোনও জায়গা দিয়ে শরীরের ওপাশের জিনিসপত্র স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

সবুজ শিখার ছোঁয়ায় অরিন্দম পোদারের শরীরে ফাটল ধরল। মাথা

থেকে রক্তের ধারা শুরু হল। তারপর শরীর বেয়ে নামতে লাগল।  
অরিন্দম টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল।

বরফের ওপরে লাল সিরাপ ঢেলে দিলে সেই সিরাপ বরফের নানা ফাটল বেয়ে চুইয়ে-চুইয়ে নেমে এলে যেমন দেখায়, অরিন্দমকে ঠিক সেরকম দেখাচ্ছিল। অনেকটা যেন বরফের ওপরে উজ্জ্বল লাল পাটিক প্রিন্টের কাজ।

যন্ত্রণায় ঝুঁকে পড়ে দাঁতে-দাঁত চেপে অরিন্দম বলল, ‘আমাকে ছেড়ে দাও। আমি সব দিয়ে দিচ্ছি...’

রীতা খিলখিল করে হেসে উঠল : ‘তোমাকে দিতে হবে না। আমরাই নিয়ে নিতে পারব।’

‘রীতা, তোমাকে আমি চিনতে পারিনি। ভুল জায়গায় আমার ভালোবাসা রেখেছিলাম। আমি কখনও ভাবিনি তোমার মতো...’

অরিন্দম আর কথা বলতে পারল না। তার আগেই কালাঁচাদের আঙুলের ডগা থেকে বেরিয়ে আসা সবুজ বিন্দু ওকে শতচিন্ম করে দিল। পলকে বরফের ধূলো হয়ে গেল অবিষ্ম। ওর শরীর কোন এক অলৌকিক বাতাসে ঘরময় উড়ে বেড়াতে পেরিগল। শীতের ঢেউ উথালপাথাল করতে লাগল ঘরের ভেতরে।

রীতা আর কালাঁচাদ হাত বাড়াল পার্টিশন ওয়ালের দিকে। ওদের হাত লম্বা হয়ে দেওয়াল ভেদ করে চুকে গেল অরিন্দমের ঘরে। একটু পরেই একটা ব্রিফকেস টেনে নিয়ে এল।

ব্রিফকেসটা আগের মতোই রবারের চাদর দিয়ে মোড়া। রীতা আর কালাঁচাদ হাঁচকা টান মারতেই রবারের চাদর ছিঁড়ে ব্রিফকেসটা চলে এল ঘরের ভেতরে। ওটা বিছানায় রেখে একটানে ওটার ঢাকনা খুলে ফেলল কালাঁচাদ।

সোনালি আলোয় ঝলমল করে উঠল ঘর। সোনা-রং ঠিকরে পড়ল  
রীতা আর কালাঁচাদের বরফের শরীর থেকে।

ব্রিফকেস ভরতি সোনার গয়না।

বরফের শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে রীতা আর কালাঁচাদ হাসতে শুরু করল

পাগলের মতো। তারপর হাসির দমক থামলে ওরা ব্রিফকেসের গয়নাগুলো আঁজলা ভরে বারবার তুলে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল। তখনই ব্রিফকেস থেকে ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ অসাবধানে পড়ে গেল মেঝেতে। কিন্তু সেদিকে ওরা কোনও ভুক্ষেপই করল না। ওরা পাগলের মতো গয়না ঘাঁটতে লাগল।

একসময় ওদের পাগলামি শেষ হল।

তখন ব্রিফকেসটা বন্ধ করে কালাঁচাদ সেটা রীতার হাতে দিল, বলল,  
'চলো, আমাদের কাজ শেষ।'

তারপর ওরা ঠোঁট ঠোঁট ছোঁয়াল, শরীরে শরীর। ওদের ঘিরে বরফের গুঁড়ো তখনও পাক খাচ্ছে।

আবার তীব্র শিসের শব্দ শোনা গেল। আর একইসঙ্গে ভেস ট্রেডানো বরফের গুঁড়ো গাঢ় হল। বাসুদেব ভালো করে কিছু আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। তীব্র শীতে ওঁর শরীর ঠকঠক করে কাপছিল। তুষার ঘড়ে গোটা ঘরটা উত্তাল হয়ে গেল। রীতা কিংবা কালাঁচাদকে আর দেখা যাচ্ছিল না। শিসের শব্দটা তীব্র হতে হতে হঠাৎ একসময় মিলিয়ে গেল।

আর তখনই বাসুদেব জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন বাথরুমের মেঝেতে।

বাসুদেবের জ্ঞান ফিরেছিল ভোরের দিকে।

গতরাতের ঘটনা ওঁর কাছে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। কারণ, বারো নম্বর আর তেরো নম্বর ঘর আগের মতোই পরিপাটি করে সাজানো। সম্প্রতি কেউ সেখানে থেকেছে বলে মনে হয় না। কালাঁচাদ, রীতা অথবা অরিন্দমের কোনও চিহ্নই সেখানে নেই।

ব্যাপারটা পুরোপুরি দুঃস্বপ্ন বলে বাসুদেব মেনে নিতেন, যদি না তেরো নম্বর ঘরের খাটের নীচে হঠাত করেই খবরের কাগজটা তিনি দেখতে পেতেন।

খবরের কাগজের পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠার একটা খবর ওঁর নজর কাঢ়ল :

## পুলিশের গুলিতে ডাকাত প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্যু

১৬ জানুয়ারি, হগলি ৪ গতকাল সকাল দশটা নাগাদ বালি স্টেশনের

কাছে মুখোমুখি সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে কালাচাঁদ নক্ষর ও রীতা

নক্ষর নামে ডাকাত প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্যু হয়। ওদের কাছে প্রায়

পঞ্চান্ত লক্ষ টাকার সোনার গয়না পাওয়া যায়। মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে

রীতা জানায় যে, ওরা ওদের এক শাগরেদ অরিন্দম পোদারকে গত

১৪ জানুয়ারি রাতে খুন করে। ভাগভাগির বিবাদ থেকেই এই খুন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই তিনজনের ডাকাতদলই গত ১০

জানুয়ারি বউবাজারের একটি অভিজাত সোনার দোকানে দৃঢ়সহস্র টাকা

ডাকাতি করেছিল। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বালি স্টেশনের

কাছে ফাঁদ পেতে রেখেছিল। কালাচাঁদ নক্ষরের কাছে একটি রিভলভার

ও তিনি রাউণ্ড গুলি পাওয়া যায়।

ব্যাপারটা খুব পরিষ্কারভাবেই শেষ হত, যদি-না বাসুদেব হঠাৎই

খবরের কাগজটার তারিখ খেয়াল করতেন।

কাগজের তারিখটা দশ বছরের পুরোনো।





## নগ্ন নির্জন রাত

‘যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে  
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখি নি,...’

এ-গল্প আমি শুনেছি রিমকির কাছে। ডাক নাম রিমকি, আর পোশাকি নাম রূপশ্রী। আমার বড়দার মেয়ে সোনালির সঙ্গে রিমকি কলেজে পড়ত। এরকম সবুজ মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি—সবসময় টগবগ করে ফুটছে। যদি কখনও জিগ্যেস করতাম, ‘এত এনাজি ভুই পাস কোথা থেকে?’ তাতে হেসে গড়িয়ে পড়ত মেয়েটা। বলত, ‘মহাকাশ থেকে, কাকু, মহাকাশ থেকে!’

সূর্যের ভেতরে যেমনটা হয়, ওর ভেতরেও বোধহয় ক্রমাগত নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়া হয়ে টন-টন হাইক্সেজন বদলে যাচ্ছে হিলিয়ামে, আর তৈরি হচ্ছে অফুরন্ট প্রাণশক্তি।

একটা সময়ে আমি বড়মাঝি সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতাম। তখন রিমকি প্রায়ই আসত সোনালীর কাছে। আর আমার ভূতচর্চার কথা শুনে এক-একদিন এসে ভূতের গল্প শোনার আবদার ধরত।

ভূত-প্রেতের গল্প ও শুনতে চাইত কেন সেটা আমি প্রথম দিন থেকেই

বুঝতে পেরেছিলাম। গল্প শেষ হলেই ও বলে উঠত, ‘কী দারুণ বোগাস ট্রু-স্টোরি! কাকু, সত্যি করে বলুন না, মিথ্যেকে সত্যিতে কনভার্ট করার চেষ্টা করে আপনার কী লাভ!’ এবং তারপরই খিলখিল করে হাসি।

এইসব হাসি আর গল্পের মাঝেই চলত সরয়ের তেল দিয়ে মুড়ি-বাদাম-পেঁয়াজ-কাঁচলঙ্ঘা মেঝে খাওয়া, আর বউদির তৈরি করে দেওয়া চা।

রিমকির সেই বয়েসের মুখটা বেশ মনে পড়ে। ফরমা লস্থাটে মুখ। টানাটানা চোখ। বাঁ-কানের নীচে একটা বড় তিল। কপালে কালো টিপ। পরনে উজ্জ্বল রঙের ঝলমলে ছুঁড়িদার।

আমার বয়েসটা যদি বছর পনেরো-যোলো কম হত তা হলে অবশ্যই আমি রিমকির প্রেমিক হতে চাইতাম। ও পাত্তা না দিলেও ওর জ্যাশেপাশে ঘূরঘূর করতাম। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সত্যিই এরকমটা ভাবতাম। বেশ বুরুতাম, রিমকির মধ্যে এমন একটা টান আছে যে, যে-কোনও পুরুষই ওকে ভালোবাসতে চাইবে।

ভৃত যে নেই, এ-কথা প্রমাণ করতে রিমকি প্রায়ই মহাতর্ক জুড়ে দিত আমার সঙ্গে। অনেক সময় বউদি আমার সোনালি ও ওর দলে যোগ দিত।

আমি ওকে শুধু বলতাম, ‘কল্পশ্রী, যেদিন তোমার হাড়ে-হাড়ে অভিজ্ঞতা হবে, সেদিন বুঝবে আমার গল্পগুলো বোগাস ট্রু-স্টোরি, না শুধু ট্রু-স্টোরি।’

সত্যি, বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের কত ধ্যানধারণা বদলে যায়! যাকে চিরকাল ‘নেই’ বলে ভেবে এসেছি তাকে ‘আছে’ বলে মেনে নিই। যেসব ঘটনা একসময় ‘হয় না, হতে পারে না’ বলে বিশ্বাস করতাম, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সে-বিশ্বাস কেমন বদলে যায়—তখন মনে হয়, ‘হয়, হতেও পারে।’

কিন্তু আমি কখনওই চাইনি, মর্মান্তিক কোনও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে রিমকির বিশ্বাস বদলে যাক।

অথচ তাই হয়েছিল।

প্রায় বারো বছর পর একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে হঠাত করে দেখা হয়ে

যেতেই বদলে যাওয়া রিমকিকে আমি চিনতে পারলাম। ওর টগবগে সবুজের ওপরে যেন সন্ধ্যার শাস্ত ছায়া নেমে এসেছে।

একপাশে সরে গিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার পর একটু সহজ হয়েছিল রিমকি। নরম গলায় বলেছিল, ‘কাকু, শেষ পর্যন্ত আপনিই জিতলেন।’

তারপর ওর গল্পটা আমাকে বলেছিল রিমকি—পুরোনো রিমকির ভাষায় ‘বোগাস টু-স্টোরি’। আর নতুন রিমকির ভাষায়? কী জানি!

শুরুর কবিতার লাইন দুটোও ওরই মুখে শোনা—গল্প বলার সময় গুণগুণ করে আবৃত্তি করেছিল ও। শুনে আমার মনে হয়েছিল, গল্পের সব কথা যেন ওই মারাঞ্চক দুটো লাইনের মধ্যেই বলা হয়ে গেছে।

রিমকি আমাকে বলেছিল...।

আমি বাড়িতে পা দেওয়ামাত্রই একেবারে হইহই শুক হয়ে গেল।

সুকান্তি একেবারে চেঁচিয়েই উঠল, ‘মা, মা, মঙ্গলগ্রহ থেকে রূপশ্রী এসেছে। শিগগির নেমে এসো।’

দোতলা থেকে নামতে-নামতে পিসিমা বলে উঠলেন, ‘রূপশ্রী আবার কে?’

‘রূপশ্রী মানে রিমকি। ভুলেও তো আমাদের বাড়িতে আসে না, তাই বললাম মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছে। এখন কথায়-কথায় হিল্পি-দিল্পি করে বেড়াচ্ছে—বিগ বস। আমাদের আর পাতা দেবে কেন! দেখলে না, অত করে আসতে বললে, ছোড়দির বিয়েতেও এল না।’

আমি সুকান্তিকে ধমকে উঠলাম, ‘তুই থামবি! নাকে অক্সিজেনের নল গঁজে নে—নইলে বকবক করে হাঁফিয়ে পড়বি।’

পিসিমা ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছেন।

পরনে সাদা থান, গলায় সরু চেন, হাতে দু-গাছা চুড়ি, চোখে চশমা। মাথার চুলে বেশ পাক ধরেছে। বয়েস কত হবে এখন? মনে-মনে হিসেব করলাম। ষাট পেরিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। অথচ টকটকে ফরসা রং এতটুকু মলিন হয়নি। এখনও দারূণ সুন্দরী। ঠিক যেন দেবীপ্রতিমা। শুনেছি, পিসেমশাই পিসিমার রূপ দেখেই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সে-কথা বুড়ো

বয়েসেও বারবার বলতেন। আরও বলতেন, পিসিমা আগে চলে গেল সে-কষ্ট তিনি সহিতে পারবেন না। ভগবান বোধহয় পিসেমশাইয়ের মনের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। তাই সময় হওয়ার অনেক আগেই ওঁকে ডেকে নিয়েছেন।

‘রিমকিকে রূপশ্রী বললে কখনও চিনতে পারি?’ পিসিমা হেসে বললেন। তারপর আমাকে জিগ্যেস করলেন, ‘কী রে, ইতির বিয়েতে এলি না কেন?’

আমি কাঁধের ব্যাগটা বাঁ-হাতে সামলে ঝুঁকে পড়ে টিপ করে পিসিমাকে একটা প্রণাম করলাম।

পিসিমা আমার চিবুক ছুঁয়ে নিজের ঠোটে সে-আঙুল ছোঁয়ালেন : ‘ইতি বারবার তোর কথা বলছিল...।’

‘কী করব, পিসিমা। একটা কনফারেন্সে ব্যাঙালোর যেতে হয়েছিল।’

সুকান্তির দুই দিনি : বড়দি শ্রতি, আর ছোড়দি ঠোটা<sup>১</sup> শ্রতিদি নাকি অনেকদিন আগেই পিসিমাকে জানিয়ে দিয়েছে ওপরে করবে না। কেন তা খুলে বলেনি। পিসিমাই আমাকে এ-কথা বলেছিলেন। তখন পিসিমার মুখ দেখে আমার মনে হয়েছিল পিসিমা স্থাই জানেন, কিন্তু আমাকে বলতে চাইছেন না। পরে অবশ্য কামজুয়োয় আমি অনেকটাই জেনেছি।

ইতি আমার চেয়ে বছরতিনেকের বড়। আর সুকান্তি আমার পিঠোপিঠি। তাই সুকান্তির সঙ্গেই আমার আড়া বেশি জমে। পিসিমা সবসময় সবাইকে বলেন, ‘রিমকি আর সুকান্তি এক জায়গায় হলেই সেখানে হইহই করে হাট বসে যায়। কী করে যে ওরা এত বকবক করতে পারে সে ওরাই জানে।’

আমাকে সঙ্গে নিয়ে সুকান্তি আর পিসিমা দোতলায় উঠল।

উঠেই দেখি, বাঁ-দিকের বড় বেডরুমটায় শ্রতিদি বিছানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে। দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে ছুটে আসা এলোমেলো বাতাস খবরের কাগজের পৃষ্ঠাগুলোকে পাগল করে দিচ্ছিল। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রতিদির চুল উড়ছিল। শ্রতিদি কাগজের পৃষ্ঠাগুলোকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

আমাকে দেখে কাগজ থেকে মুখ তুলে সামান্য হাসল শ্রতিদি :



‘কীরে, রিমকি, কেমন আছিস?’

ওকে দেখে মনে হল ভোরবেলাতেই স্নান সেবে নিয়েছে।

শ্রতিদি পিসিমার মুখ পেয়েছে। ফরসা রোগা। দেখলে একটু অসুস্থ বলে মনে হয়। আগে এরকম ছিল না। বোধহয় কানাঘুষোয় শোনা সেই বিচ্ছিরি ব্যাপারটার পর এরকম হয়ে গেছে। সব ব্যাপারেই কীরকম যেন ঠাণ্ডা—উৎসাহ উদ্বৃত্তির ছিটেফেঁটা নেই কোথাও।

আমি বললাম, ‘তুমি কেমন আছ?’

আবার সামান্য হাসি। তারপর ইতির বিয়েতে না-আসা নিয়ে আর-এক প্রশ্ন অনুযোগ।

ঘরে চুকে সবে একটা চেয়ারে বসে হাঁফ ছেড়েছি, পিসিমা বললেন, ‘এবার তোকে ছাড়ছি না—দু-চারদিন থেকে যেতেই হয়ে সুকান্তি রথীনকে আর শোভাকে ফোন ‘করে খবর দিয়ে দেবে।’

আমি হেসে বললাম, ‘আমার উত্তর শুনলে তোমন্ত্র ফ্ল্যাবারগাস্টেড হয়ে যাবে।’

‘ফ্ল্যাবারগাস্টেড মানে কী রে?’ সুকান্তি ভিজেস করল।

‘এও জানিস না! হতবাক, হতভন্ত!’

পিসিমা বললেন, ‘তা হতবাক হয়ে যাওয়ার মতো উত্তরটা শুনি।’

‘আমি তোমাদের এখানে দু-চারদিন থাকতেই এসেছি। দেখছ না, ব্যাগটা কী ভারী।’

উত্তর শুনে সুকান্তি আর পিসিমা একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গেল। হওয়ারই কথা। কারণ, আমার ছোটবেলা-বড়লোকের অনেকটা সময় শ্রীরামপুরে পিসিমাদের বাড়িতেই কেটেছে। আজ বুঝতে পারি, আমি যে ‘আমি’ হয়ে উঠেছি, তার জন্যে পিসিমা-পিসেমশাইয়ের কাছে অনেক ঝণ রয়ে গেছে আমার।

তাই ওদের সঙ্গে-সঙ্গে আমিও ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম।

শ্রতিদি একটু অবাক হয়ে তিনটে পাগলকে দেখছিল।

হঠাৎই একটা গ্যালপিং ট্রেন ছুটে গেল সামনের রেল-লাইন দিয়ে। পিসিমাদের পুরোনো বাড়ির জানলা-দরজা মিহি শব্দ তুলে কাঁপতে লাগল।

ট্রেনের এই কু-বিকবিক শব্দ আমার বালিকা বয়েসের সঙ্গে জড়িয়ে

আছে। তখন পুজোর ছুটি আর গরমের ছুটি মানেই শ্রীরামপুরে পিসিমাদের বাড়ি। আর ট্রেনের কু-বিকাশিক।

পিসিমাদের বাড়িটা রাইল্যান্ড রোডের ধারে। বোধহয় একশো কি দেড়শো বছরের পুরনো। পিসেমশাই এটা কেনার পর জোড়াতালি দিয়ে সারিয়ে-টারিয়ে নিয়েছেন। একতলায় একটা ঘর আর কলতলা-বাথরুম। দোতলায় দুটো ঘর আর পশ্চিমে রেল-লাইনের দিকে একটা টানা বারান্দা। আর একেবারে কোণের দিকে একটা আধুনিক ছাঁদের বাথরুম পিসেমশাই তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন।

আমি হাত-মুখ ধুয়ে শাড়ি-টাড়ি ছেড়ে এলাম।

পিসিমা চা করে দিলেন। তারপর ইতিদির বিয়ের গল্প শুরু হল। কোন বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল, খাওয়া-দাওয়ার মেনু কীরকম হয়েছিল, বাসী বিয়ের দিন কী-কী মজা হয়েছিল, শয়্যা তোলার সময় ভালোমানুষ বরের কাছ থেকে কীভাবে চাপ দিয়ে কড়কড়ে পঁচাশে টাকা আদায় করা হয়েছিল, এইসব।

এর কিছু কিছু আমি ব্যাঙালোর থেকে ফেরে বাবা-মায়ের কাছে শুনেছি। কারণ, ওরা বিয়েতে এসেছিল। তবুও স্থার-একবার শুনতে খারাপ লাগছিল না।

আমাদের কথাবার্তা হাসি-ঠাট্টায় শৃঙ্খলি ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসছিল। ছোট বোনের বিয়ে নিয়ে নানান কথা বলছিল। তারপর একসময় আমাকে বিয়ের ফটো দেখতে বসল।

এসেছিলাম সেই সকাল আটটায়। কখন যে বেলা বারোটা বেজে গেছে কারও খেয়ালই নেই।

পিসিমা একবার সুকান্তিকে বলেছিলেন, ‘তুই আজ অফিসে বেরোবি না?’

সুকান্তি হেসে উঠে বলল, ‘পাগল হয়েছ, মা! আদিন পর রিমকি এসেছে আর আমি অফিস যাব। প্রণয়কে বলে দেব, ও খবর দিয়ে দেবে। আমার যা ছুটি পাওনা আছে তাতে দু-চারদিন ডুব মারাটা কোনও ব্যাপার না।’

পিসিমা আমাকে স্নান করতে যাওয়ার তাড়া দিতেই সুকান্তি বলল,

’না, মা। খাওয়ার দেরি আছে। তোমরা বসে গল্প করো—আমি মাংস কিনে নিয়ে আসি। বটতলায় গেলে পেয়ে যাব। আমি তো জানি, রিমকি ছোটবেলা থেকেই মাংসাশী প্রাণী।’

সুকান্তি চলে যেতেই পিসিমা আমার অফিসের কথা শুনতে চাইলেন। বিজ্ঞাপন কোম্পানির ধরন-ধারণ পিসিমার একেবারেই অচেনা। তাই বাচ্চা ছেলেকে বোঝানোর মতো করে আমি সব বোঝাতে লাগলাম। বললাম, বিজ্ঞাপন কোম্পানিগুলোর মধ্যে কী কম্পিউটিশান। কেন আমাকে কলকাতা ছেড়ে বারবার বাইরে দৌড়তে হয়।

শ্রতিদি আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনছিল। শোনার পর বলল, ‘তোকে আমার হিংসে হচ্ছে, রিমকি। তোর মতো লাইফ আমার খুব পছন্দ।’

পিসিমা একবার অদ্ভুত চোখে বড় মেয়ের দিকে তাকালেন।

আমি শ্রতিদিকে বললাম, শ্রতিদি, সবই নদীর পার কহে...। সত্যিকারের সুখ-শান্তি বলতে যা বোঝায় সেটা কৈবল্যের নেই। ওটা শুধু খুঁজে বেড়ানোর জিনিস—কখনও পাওয়া যায়না।’

শ্রতিদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমার হঠাৎই বেশ খারাপ লাগলো।

খটাখট শব্দে একটা লোকাল ট্রেন চলে গেল।

খোলা জানলা দিয়ে লাইনের ধারের গাছপালা দেখা যাচ্ছিল। কাছেই ইলেক্ট্রিকের তারে দুটা শালিক বসে রয়েছে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছিল। জোরালো রোদে কয়েকটা পাতা আয়নার মতো চকচক করছিল।

পিসিমা বললেন, ‘শ্রতিকে কত বলি, টিউশনি কর—ও করতে চায় না।’

‘টিউশনি আমার ভালাগে না।’ শ্রতিদি বলল।

আমি ওকে বললাম, ‘তোমার তো আঁকার হাত ভালো ছিল। হাতের কাজটাজ কিছু করতে পারো...বাটিকের কাজ...।’

শ্রতিদি মলিন হাসল। ছেট করে ‘হঃ...’ শব্দ করল।

এরপর গল্প আর তেমন জমল না। আমি স্নান করার তোড়জোড় শুরু করলাম। পিসিমাও রান্নাবান্নার ব্যাপারটা দেখতে চলে গেলেন।

রাতে সবাই মিলে একসঙ্গে যখন খেতে বসেছি, তখন পিসিমা সুকান্তিকে বললেন, ‘কীরে, কী ঠিক করলি? তুই কি তা হলে একতলায় ঘরে শুবি? আর রিমকি তোর ঘরে শোবে?’

সুকান্তি খেতে-খেতে মাঘের দিকে তাকাল। জড়ানো গলায় বলল, ‘আমাকে সব লটবহর নিয়ে তা হলে নীচে নামতে হবে। তা ছাড়া আমার ব্যাচিলার্স ডেন কি রিমকির ভালো লাগবে?’ একটু হাসল সুকান্তি।

আমি সাত-তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ‘একতলায় শুতে আমার কোনও প্রবলেম নেই, পিসিমা।’

‘না, তা না....যদি ভয়-টয় পাস....।’

আমি হাসলাম : ‘চোর-ডাকাত হলে ভয় পেতেও পারিব তা ছাড়া আবার ভয় কীসের! আমার একা-একা শোওয়ার অন্তর্মাস আছে।’

সুকান্তি খাওয়া-থামিয়ে বলল, ‘রিমকির অফিসে কিউ দিন-দিন কমে যাচ্ছে। মা চোর-ডাকাতের ভয়ের কথা যাচ্ছে না—বলছে গোস্ট প্রবলেমের কথা।’

‘ভূতের ভয়!’ আমি আর হাসি কিপতে পারলাম না : ‘পিসিমা, সত্যি....ভূত বলে কিছু থাকলে তবে না তাকে ভয় পাব! ভূত হচ্ছে বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্যে বড়দের তৈরি একটা মিথ—মিথ্যেও বলতে পারো। আমি তো আর বাচ্চা নই।’

শ্রতিদি কেমন অস্তুত চোখে আমাকে দেখছিল। ওর বলা সকালের কথাটা মনে পড়ল : তোকে আমার হিংসে হচ্ছে, রিমকি।

সুকান্তি পিসিমাকে বলল, ‘রিমকি একটুও বদলায়নি। সেই ছোটবেলার মতোই—ঝাঁসি কি রানি। কী বল, রিমকি?’

আমি বললাম, ‘তুই ছোটবেলা থেকে যা কুঁড়ে! তুই কখনও নিজের আস্তানা ছাড়বি! বিছানায় পাশ ফিরতে হলেও তো মাকে ডাকিস পাশ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে।’

সুকান্তির সঙ্গে লাঠালাঠি করতে-করতেই খাওয়া শেষ হল।

এরপর শুতে যাওয়ার পালা। সুকান্তি বলল, ‘দাঁড়া, তোর জন্যে ক'টা

ম্যাগাজিন নিয়ে আসি—।’

আমি বললাম, দরকার নেই—আমার সঙ্গে বই আছে, কিন্তু ও শুনল না। ওর ঘরে গেল ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে আসতে।

দোতলার বড় ঘরটায় পিসিমা আর শ্রুতিদি শোয়। তার পাশের ছোট ঘরটায় সুকান্তি। ওর ঠিক নীচেই আমার জন্যে বরাদ্দ করা ঘরটা। এমনিতে ওটা বন্ধই পড়ে থাকে—ইতিও ওখানে শুত না। পিসেমাশাই বেঁচে থাকতে ঘরটা ব্যবহার হত। এককালে ছিল বৈঠকখানা—পরে পিসেমাশাইয়ের শোওয়ার ঘর। ঘর ছাড়া বাকিটা পুরোনো ধাঁচের বারান্দা, কলতলা আর বাথরুম।

থাওয়া-দাওয়ার পর পিসিমাদের সঙ্গে বসে আর-এক প্রস্তু গল্প, আর কিছুটা সময় চিভি দেখলাম। তারপর হাই উঠতে লাগল।

পিসিমা বললেন, ‘আজকের মতো ঢের হয়েছে। এরারে শুতে যা—।’

সুকান্তি ম্যাগাজিনগুলো হাতে নিয়ে আমাকে খোঁজে দিল : ‘চল, তোকে সি অফ করে আসি।’

একতলার ঘরের দরজায় এসে ও বলল, ‘চুকেই বাঁ-দিকে সুইচবোর্ড—তুই তো জানিস। আর বাথরুম...।’

আমি ম্যাগাজিনগুলো ওর হাত থেকে নিয়ে বললাম, ‘মায়ের কাছে মাসির গল্প করিস না। গুডনাইট। কাল সকাল-সকাল উঠবি—আমাকে এসকট করে মর্নিং ওয়াকে নিয়ে যাবি, সানরাইজ দেখাবি।’

ও ভুরু উঁচিয়ে বলল, ‘এটা কি পুরী নাকি! এখানে সানরাইজ রান্নাঘরের তাকে পলিপ্যাকে পাওয়া যায়।’ হাসল সুকান্তি। তারপর গলাটা সিরিয়াস করে বলল, ‘সত্যি তুই ভয় পাবি না তো!'

আমি হালকা গলায় বললাম, ‘পেলে তোকে ডাকব।’

‘তা হলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাবি...জানিস তো আমার স্লিপ খুব ডিপ।’  
ও চলে গেল।

আমি ঘরের আলো জ্বলে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিলাম। সাবধানের মার নেই ভেবে খিল আর ছিটকিনি—দুটোই এঁটে দিলাম। তারপর ম্যাগাজিনগুলো বিছানায় রেখে ঘরের এক কোণে গিয়ে শাড়ি

ছেড়ে নাইটি পরে নিলাম।

যরে আলো বলতে একটিমাত্র টিউব লাইট। আর আসবাবপত্র বলতে একটা ছোট কাঠের আলমারি, একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা বুককেস, আর একটা ছোট খাট। আলমারির মাথায় পুরোনো আমলের টুবিটাকি জিনিস—তার মধ্যে একটা পেতলের দোয়াত আর একটা পেতলের ফুলদানি। তবে এত ময়লা হয়ে গেছে যে, পেতলের বলে আর বোৰা যায় না।

যরে তিনটে জানলা : একটা ভেতরের কলতলার দিকে, আর দুটো রেল-লাইনের দিকে। তিনটে জানলাতেই শক্তপোক্ত গ্রিল লাগানো।

বিছানায় গা ঢেলে দিতেই এক অদ্ভুত তৃষ্ণি পেলাম—যেন কেউ আমার জন্যে পালকের কোল পেতে দিয়েছে। অথচ বিছানাটা মিতান্তই মামুলি।

সামান্য আড়মোড়া ভেঙে একটা ফিল্ম ম্যাগাজিন তুলে নিলাম। ব্যাগে আরভিং ওয়ালেসের সিন্স অভ ফিলিপ্প ফ্রেমিং' রয়েছে, কিন্তু সেটা আর বের করতে ইচ্ছে করল না।

রাতে বই পড়া আমার বহুদিনের অভ্যন্তর। তাই ক্লাস্ট লাগলেও ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ বোলাতে জ্বাগলাম। বহুদিন সিনেমার খবর নেওয়া হয় না। তাই ম্যাগাজিনটা পড়তে খারাপ লাগছিল না।

মাঝে-মাঝে ট্রেন ছুটে যাওয়ার শব্দে মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই একটা ট্রেন চলে যাওয়ার পর কে যেন আলতো করে আমার নাম ধরে ডাকল।

‘রূপশ্রী...।’

আমি চমকে উঠলাম। চোখ ফেরালাম দরজার দিকে। দরজায় ছিটকিনি, খিল সব ঠিকঠাকই আছে।

সুকাস্তি কি দরজার বাইরে থেকে আমাকে ডাকল! কিন্তু ডাকটার ধরন যেন কেমন অদ্ভুত। কেউ যেন ভীষণ আহ্বাদ করে আমার নামটা উচ্চারণ করেছে।

বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত একটা বাজতে মিনিট পাঁচ-সাতক বাকি। এ-সময়ে সুকাস্তি কেন আমাকে ডাকতে

আসবে! নাকি ও ঝাঁসির রানির সাহস পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

ম্যাগাজিনটা মাথার কাছে রেখে আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। একটু সতর্কভাবে দরজার কাছে গেলাম। দরজার পান্নার জোড়ের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করলাম, ‘কে? সুকান্তি?’

উত্তরে কোনও সাড়া পেলাম না। তবে মনে হল যেন কেউ দীর্ঘশাস ফেলল।

আমার প্রশ্ন করলাম আমি, ‘কে? কে?’

কোনও উত্তর নেই।

পিসিমাদের সদরে গ্রিলের দরজা বসানো। তার ঠিক পরেই একটা ভারী কাঠের দরজা। দরজাগুলো তালা-খিল-টিল দিয়ে ঠিকঠাক বন্ধ থাকে। এ ছাড়া বাইরে থেকে উটকো লোক ঢুকে পড়ার কোনও প্রশ্ন নেই। তিনতলার ছাদের দরজাতেও বরাবর রাতে খিল এঁটে দেওয়া হয়।

সুতরাং কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকার প্রক্রিয়া ভীষণ বোকা-বোকা লাগল। মনে হয় আমার নাম ধরে কেউ ভকেনি। ম্যাগাজিনের দিকে মনোযোগ থাকায় আমি হয়তো ভুল ভুক্ত হয়েছি। সামান্য এই কারণে যদি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করি, তা হলে সুকান্তি টিটকিরি দিয়ে আর টিকতে দেবে না।

চুপচাপ বিছানায় ফিরে এলাম। ছোট টেবিলটায় জলের জগ আর প্লাস রাখা ছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই পলকে তেষ্টা পেয়ে গেল। বিছানা থেকে নেমে চলে গেলাম টেবিলের কাছে। প্লাসে জল ঢেলে প্রাণভরে তেষ্টা মেটাতে গিয়েও থেমে গেলাম। বেশি জল খাওয়া ঠিক হবে না। কারণ, রাতে আর বাথরুমে বেরোতে চাই না।

গলাটা সমান্য ভিজিয়ে নিয়ে আলো নিভিয়ে দিলাম। অঙ্ককার ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের ভেতরে। আন্দাজে ভর করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরের ঝোপঝাড় থেকে রাত-পোকার ডাক কানে আসছিল।

চোখটা একটু সয়ে আসতেই রেল-লাইনের দিকের খোলা জানলা দুটোর দিকে নজর পড়ল। ঘরের তুলনায় অঙ্ককার সেখান খানিকটা যেন কম। কালো আকাশ, দু-একটা তারা, আর গাছ-গাছালির কয়েকটা ডালপালা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

আর-একটা ট্রেন ঘমাঘম করে ছুটে গেল। তারপরই যেন চারিদিক  
চুপচাপ হয়ে গেল। বাতাসে নড়ে ওঠা পাতার খসখস শব্দ শুনতে  
পাচ্ছিলাম আমি।

হঠাতে ডাকটা শোনা গেল আবার।

‘রূ-প-শ্রী...।’

আবেগ থরথর গলায় ভীষণ চাপা ফিসফিসে স্বরে আমার নাম ধরে  
ডেকে উঠল কেউ।

না, এবারে শুনতে আমার কোনওরকম ভুল হয়নি। তিনটে অক্ষরকে  
আলাদাভাবে টেনে-টেনে উচ্চারণ করেছে সে। ভালোবাসার জুরে বেপথু  
কোনও রোমান্টিক কঠস্বর।

পিসেমাশইয়ের গলা এটা নয়। তা ছাড়া তিনি অপঘাতে মর্ত্ত্য ঘাননি  
যে ভূত-প্রেত হয়ে উপোসী ভালোবাসা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়েন।

তা হলে এমন করে কে ডাকছে আমায়!

আমি বিছানায় কাঠ হয়ে শুয়ে রইলাম। যেন সামান্য নড়াচড়া করলেই  
অতল খাদে পড়ে চিরকালের মতো তলিমুঝে আব।

এইভাবে কিছুটা সময় কেটে যাওয়ার পর ঢাবতে শুরু করলাম, ঘরের  
আলোটা জ্বলে দেব কি না। কিন্তু মিহি ছেড়ে উঠতে আমার—স্বীকার  
করতে লজ্জা নেই—বেশ ভয়-ভয় করছিল। অথচ আমার মনের একটা  
অংশ ভেতর থেকে বারবার আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, ভূত  
বলে কিছু নেই। যারা ভূতের ভয় পায় ভূতেরা তাদের দেখা দেয়। কিন্তু  
আমার মনের বাকি অংশ কিছুতেই সেসব যুক্তি মানতে চাইছিল না।

ঠিক তখনই ‘খুট’ করে একটা শব্দ হল। যেন কেউ ঘরের দরজা  
খুলল। অন্ধকারে বাইরে থেকে ছুটে আসা বাতাসের ঝাপটাও টের পেলাম  
আমি। অথচ একটু আগেই দেখেছি দরজায় খিল-ছিটকিনি ভালো করেই  
আঁটা রয়েছে।

আমি শুয়ে-শুয়েই ঘামতে শুরু করলাম। অথচ মাথার ওপরে সিলিং  
পাখা একই তালে ঘুরে চলেছে। এরপর কি আমি অঙ্গান হয়ে যাব!

দরজার শব্দ হল আবার। তারপর অতি সাবধানে খিল লাগানোর শব্দ,  
ছিটকিনি আঁটার শব্দ।

তার মানে। কেউ কি ঘরে চুকে ভেতর থেকে দরজাটা আবার বন্ধ করছে! অসম্ভব!

নিজেকে বারবার বললাম, এ-সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। অথবা ভয় পাওয়ার কোনও মানে হয় না। কারণ, ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই। কিছু নেই।

যুক্তি দিয়ে সবই বুঝতে পারছিলাম, অথচ ভীষণ ভয় করছিল।

আমার খুব কাছে কে যেন নিঃশ্঵াসে ফেলল। তারপর পা ফেলে হেঁটে বেড়ানোর অস্পষ্ট শব্দ পেলাম।

আমার চোখ খুব একটা কাজ করছিল না। তবে নাক আর কান দ্বিগুণ সজাগ ছিল। হয়তো সেইজন্যেই পারফিউমের হালকা গন্ধটা টের পেলাম।

এই পারফিউম আমি ব্যবহার করি না। কিন্তু কেন জানি না মনে হল, এটা পুরুষদের পারফিউম। আর গন্ধটা আমাকে স্কেচ টানছিল, নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

ঠিক তখনই একটা জমাট ছায়া জানমাটে চৌকো ফ্রেমে দেখতে পেলাম—তবে মাত্র একপলকের জন্যে। অবগুরই ওটা আলমারির দিকে সরে গেল।

এবার আমি চিৎকার করতে চাইলাম, কিন্তু ভোকাল কর্ড স্ট্রাইক করে বসল।

আশ্চর্য! যখন আমি চিৎকার করতে পারতাম তখন লজ্জায় সঙ্কোচে চিৎকার করতে চাইনি। আর এখন প্রাণপণে চিৎকার করতে চাইছি অথচ পারছি না।

হঠাৎই মনে হল আমার বিছানার খুব কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে—কুঁকে পড়েছে আমার শরীরের ওপরে। পারফিউম ছাড়া আমি যেন একটা উগ্র পুরুষালি গন্ধ পাচ্ছি। একই সঙ্গে পায়রার বুকের পালকের মতো নরম আলতো একটা ছোঁয়া আমাকে অবশ করে দিল। হাতে, পায়ে, গলায়, বুকে। টিভি চালিয়ে তার স্ক্রিনের খুব কাছে হাত নিয়ে গেলে যেরকম অনুভূতি হয়, এ-ছোঁয়া ঠিক সেইরকম।

আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে তীব্র হাইস্ল দিয়ে ঝমাঝম শব্দে একটা ট্রেন ছুটে গেল।

আর সঙ্গে-সঙ্গে তাল কেটে গিয়ে সব ওলটপালট হয়ে গেল। পলকে পারফিউমের গন্ধ, অলৌকিক ছোঁয়া—সব উধাও। আমার ঘুমের ঘোরও কেটে গেল। গলা পর্যন্ত যে-ভয় উথলে উঠেছিল সেটা থার্মোমিটারের পারার মতো দ্রুত নামতে লাগল।

প্রচণ্ড এক চেষ্টায় বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম আমি। হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় আলোর সুইচ জুলে দিলাম।

ঘরে কেউ নেই।

ঘরটা শেষ যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক তেমনটিই আছে।

হঠাৎই আমার চোখ গেল ঘরের দরজার দিকে।

দরজার খিল-ছিটকিনি দুটোই খোলা। দরজার পান্না দুটো ইঞ্জিনের ফাঁক হয়ে আছে।

তা হলে কি ঘরে চোর চুকেছিল! কিন্তু বাইরে থেকে তো খিল-ছিটকিনি খোলা অসম্ভব!

দরজা আবার ভালো করে বন্ধ করে খিল আর ছিটকিনি এঁটে দিলাম। পান্নাদুটো বারকয়েক টেনেটুনে দেখলাম ঠিক আছে কি না। তারপর বিছানায় ফিরে এলাম।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত সওয়া তিনটে।

শরীর আর বইছিল না। আলো জুলে রেখেই শুয়ে পড়লাম। কারণ, আলো নিভিয়ে দিলে আমার আর কিছুতেই ঘুম আসবে না।

দুমদুম করে দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। হাতঘড়িটার দিকে তাকালাম। নটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। জানলার দিকে তাকিয়েও বোৰা যাচ্ছে বেলা অনেক হয়ে গেছে।

দরজায় আবার ধাক্কা পড়ল। সেই সঙ্গে সুকান্তি আমার নাম ধরে ডাকল : ‘রিমকি! রিমকি! ওঠ, ওঠ—নটা বাজে! তুই বলে মর্নিং ওয়াকে

যাবি, সানরাইজ দেখবি?’

আমি সাড়া দিলাম : ‘খুলছি, খুলছি! এক মিনিট...।’

এক মিনিটের কম সময়েই পোশাক পালটে টুথব্রাশে টুথপেস্ট লাগিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

‘কাল রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারিসনি নাকি?’

আমি জড়ানো গলায় বললাম, ‘না।’

তখনই ও দরজার কাছ থেকে জুলন্ত টিউব লাইটটা দেখতে পেল।

‘কী রে, সারা রাত আলো জুলে ঘুমিয়েছিলি নাকি?’

‘হ্যাঁ। আলো-পাখা অফ করে দে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে ওপরে যাচ্ছি। গিয়ে সব বলছি। পিসিমাকে বল চা করতে—।’

ওপরে গিয়ে চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিয়েই আমি বললাম পিসিমা, কিছু মাইন্ড কোরো না। তোমাদের ওই একতলায় ঘরটা হন্টেড।

‘হন্টেড মানে! ঠিক কী বলতে চাইছিস?’ সুকান্ত জিগেস করল।

আমি চায়ের কাপে আর-একটা লস্বা চুমুক দিয়ে নির্বিকারভাবে বললাম, ‘হন্টেড মানে হন্টেড। ওই ঘরটায় ভুজে উপদ্রব আছে। আমাকে আগে বলিসনি কেন?’

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

পিসিমা, শ্রতিদি, সুকান্তি—সবাই বেশ ফ্যালফ্যাল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। পিসিমা আর শ্রতিদি তো মনে হল আমার কথায় বেশ ভয় পেয়ে গেছে। আর সুকান্তি আমাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল। বুঝতে চাইছিল আমি সত্যি-সত্যি ভূতের কথা বলছি, নাকি ঠাট্টা করছি।

কিছুক্ষণ পর সুকান্তি মুখ নীচু করে মিনিমিন করে বলল, ‘না...মানে...ভাবিনি যে, এখনও ও-ঘরটায় কোনও প্রবলেম হতে পারে।’ মুখ তুলে পিসিমার দিকে তাকাল ও : ‘মা, তুমি তো জানো, ছোড়দির বন্ধু দুশিতা তো এসে রাতে ও-ঘরে ছিল। তখন তো কিছু হয়নি! তারপর...।’

লক্ষ করলাম, শ্রতিদির চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। আর পিসিমাও কেমন যেন অস্বস্তি পেয়ে এক মুখে ওর মুখে চাইছেন।

সুকান্তি আমার কাছে বুঁকে এসে জানতে চাইল : ‘তুই ঠিক কী

দেখেছিস বল তো! কী হয়েছে কাল রাতে?’

‘কী আবার হবে! একটা লোক চুকে পড়েছিল আমার ঘরের ভেতরে। অথচ রাত্তিরে শোওয়ার আগে খিল-ছিটকিনি ঠিকমতোই এঁটে দিয়েছিলাম।’

আমি চা খেতে-খেতে পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম।

জানলা দিয়ে রোদ-বলমলে দিন দেখা যাচ্ছে। চারপাশে কোথাও অশ্রীরী—অলৌকিকের ছায়ামাত্র নেই! এই পরিবেশে কাল রাতের ব্যাপার-স্যাপারগুলো বলতে গিয়ে আমার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। মনে হল, এমন তো নয় যে, বাইরে থেকে কায়দা করে একতলার ঘরটার খিল-ছিটকিনি খোলা যায়! তা হলে কোনও বদমাশ লোক চুরি বা অন্য কোনও বদ মতলবে বাইরে থেকে খিল-ছিটকিনি খুলে মাঝরাতে ঘরে চুকে পড়েছে! তারপর ট্রেনের আওয়াজে আমার ঘূম ভেঙে যাসে ভেবে পালিয়েছে।

সে-কথাই সুকান্তিকে বললাম।

সুকান্তি মানতে চাইল না। বলল, ‘না রে, বাস্তুতা অত সহজ নয়। ঘরটা বোধহয় সত্য-সত্যই হন্টেড। তোর অঙ্গে আরও দুটো এরকম কেস হয়েছে।’

‘কীরকম, শুনি—।’

এবার পিসিমা মুখ খুললেনঃ ‘জয়তীকে তুই চিনবি না। আমার ননদের বড় মেয়ে। বছর পাঁচেক আগে ও ওয়াল্শ হসপিটালে ওর এক আস্তীয়কে দেখতে এসেছিল। কী একটা অ্যাঞ্জিডেন্ট হয়েছিল যেন। তখন ও আমাদের বাড়িতে এসে থেকেছিল। রাতে নীচের ওই ঘরটায় শুয়েছিল। ও কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়েছিল—।’

‘কী দেখেছিল রাতে?’ আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছিল।

পিসিমা শাড়ির আঁচলে হাত মুছলেন। তারপর বললেন, ‘দাঁড়া, ভাতটা একবার দেখে আসি। আঁচটা কমিয়ে দিয়ে আসি।’

পিসিমা উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

একটু পরেই ফিরে এসে বলতে শুরু করলেন।

‘রাত কত হয়েছিল জয়তীর খেয়াল নেই। তবে খুব গভীর রাত নিশ্চয়ই। হঠাৎই ও দেখল বেল-লাইনের দিকে একটা জানলার গ্রিলের

বাইরে একটা ছায়া। চুপচাপ দাঁড়িয়ে যেন ওকে লক্ষ করছে।

‘জয়তী প্রথমটায় ভেবেছে চোর-ছ্যাচড় হবে। ও চিংকার করতে যাবে, ঠিক তখনই দ্যাখে ছায়াটা গিল ভেদ করে ঘরে ঢুকে পড়ল—ঠিক একতাল মাখনের মতো। জয়তী আর চিংকার করতে পারেনি। ও কাঠ হয়ে শুয়ে ছায়াটাকে লক্ষ করতে চেষ্টা করছিল।

‘তখন শুরুপক্ষ ছিল। তাই আবছা হলেও লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিল জয়তী। লোকটা ওর বিছানার ধার ঘেঁষে পায়চারি করছিল। জয়তী ওর নিঃশ্঵াসের শব্দ পেয়েছিল। একটা সেন্টের গন্ধ পেয়েছিল। তারপর... তারপর...’

সুকান্তি আচমকা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘মা, আমি একটু বাজারে বেরফচি। আচ্ছা, কাঁচালঙ্কা কি ফুরিয়ে গেছে, না আছে?’

‘একশো নিয়ে আসিস।’

সুকান্তি একটা গানের কলি ভাঁজতে-ভাঁজতে বেরফচি গেল।

আমি পিসিমার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিলু লাগলাম।

‘সুকান্তির সামনে পরের কথাগুলো বলতে জিসুবিধে হত...।’ পিসিমা বললেন, ‘ও অবশ্য জানে—তাই আমার জিসুবিধেটা বুঝতে পেরে চলে গেল। তোরা মেয়ে, তোদের সামনে কিলা যায়...।

‘এরপর লোকটা জয়তীর গায়ে হাত দিয়েছিল। ওর...ওর...এত...এত ভালো লেগেছিল যে, ও মুখ ফুটে বারণ করতে পারেনি।’ পিসিমা চোখ নামালেন। ওঁর মুখে লালচে ভাব ফুটে উঠল।

শ্রতিদিরও দেখলাম কান-টান লাল হয়ে গেছে। অনধিকারী ভালোবাসায় তৃপ্তি পাওয়া নিশ্চয়ই অন্যায়। কিন্তু শরীর যে সবসময় মনের কথা মানতে চায় না!

‘এইসব করতে-করতেই লোকটা বিড়বিড় করে কবিতার মতো কী একটা আবৃত্তি করেছিল। জয়তী দু-চারটে লাইন মনে করে আমাকে বলেছিল, কিন্তু আমার ঠিক মনে পড়ছে না। শুরুটা এইরকম ছিল : “যে আমাকে চিরদিন...”। তারপর কী যেন—।’

শ্রতিদি হঠাৎ বলে উঠল, ““যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে / অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখি নি, / সেই নারীর মতো”...তারপর

ଖାନିକଟା ବାପସା, ମନେ ପଡ଼ିଛେ ନା...ତାରପର ଆବାର ‘‘ଆମାର ବିଲୁଷ୍ଟ ହୃଦୟ, ଆମାର ମୃତ ଚୋଥ, ଆମାର ବିଲିନ ସ୍ଵପ୍ନ ଆକାଙ୍କ୍ଷା, / ଆର ତୁମି ନାରୀ—/ ଏହି ସବ ଛିଲ ସେଇ ଜଗତେ ଏକଦିନ।’’

ଆମି ଅବାକ ହୟେ ଶ୍ରତିଦିକେ ଦେଖିଲାମ । ଓ ଥାମତେଇ ବଲେ ଉଠିଲାମ, ‘‘ନାମଟା ତୋମାର ଶ୍ରତିର ବଦଳେ ଶ୍ରତିଧିର ହଲେ ମାନାନସଇ ହତ ।’

ଶ୍ରତିଦି ହାସଲ ।

ପିସିମା ଆବାର ବଲତେ ଶୁରୁ କରଲେନ ।

‘ତାରପର ଛାୟାଟା ଆଲମାରିର କାହେ ଯାଯ । ସେଥାନେ କିଛୁକ୍ଷଣ ଦାଁଡିଯେ କୀସବ କରତେ ଥାକେ । ତାରପର ଚଲେ ଆସେ ଟେବିଲେର କାହେ । ସେଥାନେ ବୁଁକେ ପଡ଼େ ଖାନିକ ସମୟ କାଟିଯେ ଦେଯ । ଜୟତୀ ଭେବେଛିଲ, ଲୋକଟା ବୋଧହୟ ଟେବିଲେର ଡ୍ର୍ୟାରଟା ଖୋଲାର ଚେଷ୍ଟା କରଛେ । ଯାଇ ହୋକ, ଏରପର ଛାୟାଟା ଚଲେ ଯାଯ ଆଲମାରିର ପେଛନେ । ଏକଦିନ ଦିଯେ ଚୁକେ ଆର-ଏକଦିକ ଟିର୍ଯ୍ୟ ବେରିଯେ ଆସେ । ତାରପର ଆବାର ଫିରେ ଆସେ ଜୟତୀର କାନ୍ଦା ଆବାର ଓଈସବ ଶୁରୁ କରେ ଦେଯ । ଜୟତୀ ସଥିନ ନେଶାର ଘୋରେ ପ୍ରାୟ ତଲିଯେ ଯାଛେ ତଥିନ ହଠାତେ ସାମନେର ଲାଇନ ଦିଯେ କାନଫଟାନୋ ଶୁଭ୍ର କରେ ଏକଟା ଟ୍ରେନ ଛୁଟେ ଯାଯ । ସଙ୍ଗେ-ସଙ୍ଗେ ଜୟତୀର ସେଲ ଫିରେ ମୁହଁର ଓ ଚେଂଚିଯେ ଓଠେ । ତଥିନ ଅନ୍ଧକାର ଛାୟାଟା ଯେନ ହାଓୟାଯ ଭେଲ୍‌ଜୋନଲାର ଗ୍ରିଲ ଭେଦ କରେ ପଲକେ ପାଲିଯେ ଯାଯ ।’

ପିସିମାର ଗଲ୍ଲ ଶେଷ ହତେଇ ଆମି ହେସେ ବଲଲାମ, ‘ଭୂତ ନଯ, ପିସିମା—ଚୋର । ଖୁବ ବଦ ଟାଇପେର ଚୋର । ତୋମାଦେର ଥାନାଯ ଇନଫର୍ମ କରା ଉଚିତ ଛିଲ । ଲୋକଟା ଆଲମାରି ଖୋଲାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ପାରେନି । ଟେବିଲେର ଡ୍ର୍ୟାରଟାଓ ଖୁଲତେ ପାରେନି । ତଥିନ ତୋମାର ଘୁମନ୍ତ ରିଲେଟିଭକେ ନିଯେ ଅସଭ୍ୟତା କରାର ଚେଷ୍ଟା କରେଛେ । ଇସ, ଆମି ଯଦି କାଲ ସମୟମତୋ ଚେଂଚିଯେ ଉଠିତେ ପାରତାମ । ତା ହଲେ ସୁକାନ୍ତି ଲୋକଟାକେ ପାକଡ଼ାଓ କରେ କଷେ ଖୋଲାଇ ଦିତେ ପାରତ—’

ପିସିମା ମାଥା ନାଡ଼ିଲେନ : ‘ନା ରେ, ଚୋର-ଟୋର ନଯ । ପାଁଚ-ସାତ ବହର ଧରେ ଲୋକଟା ଏକଇ ବାଡ଼ିତେ ଏକଇ ଘରେ ଏକଇ କାଜ କରେ ଚଲେହେ—ଏ କଥନ୍ତ ହ୍ୟ ! କଇ, ପାଡ଼ାର ଆର କାରାଓ ବାଡ଼ିତେ ତୋ କଥନ୍ତ ଏରକମ ଶୁନିନି ! ତା ଛାଡ଼ା ଜାନଲାର ଗ୍ରିଲେର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେ ଲୋକଟା ଘରେ ଚୁକଲ କେମନ

করে, আবার পালালই বা কেমন করে! আর কাল রাতে বাইরে থেকে তোর ঘরের দরজার খিল-ছিটকিনি খুলল কেমন করে, বল!

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর জেদি গলায় বললাম, ‘তুমি যে এত জোর দিয়ে বলছ, তুমি নিজে কখনও ভৃত্যাকে চোখে দেখেছ!

পিসিমা পলকে কেমন উদাস হয়ে গেলেন। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে চোখ রাখলেন কিছুক্ষণ। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে কেমন এক অস্তুত গলায় বললেন, ‘না, আমি দেখিনি। প্রথমবার এরকম ঘটনা শোনার পর আমি একা ও-ঘরে অনেক রাত কাটিয়েছি, কিন্তু কেউ আসেনি। আমাদের অনেক রিলেটিভ ও-ঘরে অনেক রাত কাটিয়েছে, কিন্তু কোনও প্রবলেম হয়নি। অবশ্য তারা বেশিরভাগই পুরুষ ছিল—আর দু-একজন বয়স্কা মহিলা। তাদের বেলা ওই নিশিকুটুম্ব দেখা দেয়নি। দ্বিতীয়বার সে স্ত্রী দিল জয়তীর বেলায়। তখন জয়তী তোর মতোই—দেখতে-শুনতে সুন্দর, অক্ষ বয়েস। আমার মনে হয়, অন্নবয়েসি সুন্দরী মেয়েদের পক্ষে এই ভৃত্যার আলাদা কোনও টান আছে। ওদের আশণপণে ভাস্তুবাসতে চায়। নইলে কেউ ওরকম করে! ওরকম কবিতা বলে!

আমি ঠোঁট টিপে চোখ কপালে তুলে কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। তারপর মাথা নেড়ে বললাম, ‘তুমি যতই বলে পিসিমা, আমি ঠিক যেন ফুললি কনভিন্সড হাতে পারছি না।’

এবার শ্রতিদি জবাব দিল, ‘তুই তখন থেকে এরকম জেদ ধরে আচিস কেন, রিমকি। শুরুতে তুই-ই তো বললি ঘরটা হন্টেড। তা ছাড়া মা এই যে বলল, ছায়াটা আলমারির পেছনে চুকে গেল—একদিক দিয়ে চুকে আর-একদিন দিয়ে বেরিয়ে এল—এটা কি কোনও মানুষের পক্ষে ইম্পসিব্ল নয়?’

‘কেন, ইম্পসিব্ল কেন?’

‘আলমারির পেছনেই তো দেওয়াল। সেখানে দু-ইঞ্জও ফাঁক নেই! তা হলে একটা গোটা মানুষ চুকবে কেমন করে!

আমি দমে গেলাম।

শ্রতিদি বলেই চলল, ‘তোকে তো লোকটা টাচ করেছিল। ওটা কোনও মানুষের ছোঁয়া? তুই বল! তখন তোর মন-শরীর অবশ হয়ে

যায়নি?’ একটু চুপ করে থেকে শ্রতিদি আবার নীচু গলায় বলল, ‘ভাগ্যস ট্রেনটা এসে গিয়েছিল...নইলে আরও বাজে কিছু হতে পারত!

তার মানে! আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। কাল রাতে ঝমাঝম শব্দে ট্রেন ছুটে গেছে বলে আমি বাজে কিছু হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছি! পিসিমাদের ওই রিলেটিভ—জয়তী—সে-ও একইরকমভাবে বেঁচে গেছে!

শ্রতিদি এত সব জানল কেমন করে! কী করে মনে রাখতে পারল কবিতার ওই রোমান্টিক লাইনগুলো!

শ্রতিদির মুখ থমথম করছিল।

আমি জিগ্যেস করলাম, ‘তুমি এত সব জানলে কেমন করে?’

শ্রতিদির চোখে জল এসে গেল পলকে। মুখটা ঘুরিয়ে নিষ্ঠিত উঠে দাঁড়াল। তারপর বলতে গেলে ছুট-পায়ে বেরিয়ে গেল ঘুর থেকে।

আমি খানিকটা অবাক হয়ে পিসিমার দিকে তা঳িলাম।

পিসিমা মাথা নীচু করে বসেছিলেন। যেটু অবস্থাতেই বললেন, ‘শ্রতিকে দিয়ে ব্যাপারটা শুরু হয়। তার আর্থিকখনও কিছু হয়নি। সে-রাতেও ও একা শুয়েছিল ওই ঘরে। সেন্ট্রাল আবার বাংলা বন্ধ ছিল। তাই কোনও ট্রেন চলেনি। অশরীরই প্রেতটা সেদিন আর মাঝপথে থামেনি। ওর...ওর...সাধ মিটিয়ে তারপর উধাও হয়ে গেছে...’

আমি পাথর হয়ে গেলাম। আমি এসব কী শুনছি।

পিসিমা কেঁদে ফেললেন : ‘সেদিন থেকে শ্রতি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। পরে...পরে...ওকে মানসিকভাবে সুস্থ করার জন্যে নকল অ্যাবরশন করাতে হয়। তোকে আমি লজ্জায় এ-কথা আগে বলিনি। তা ছাড়া কেউই তো এসব কথা বিশ্বাস করবে না। সবই আমাদের কপাল...।

‘জয়তীর ব্যাপারটার পর এত বছর পার হয়ে গেছে...তাই ভেবেছিলাম ঘরটার দোষ কেটে গেছে। এখন দেখছি যায়নি। আমাদের হয়তো বাড়িটাই ছেড়ে দিতে হবে...’

শ্রতিদির বিয়ে না করার কারণ হিসেবে কানাঘুঁঘোয় কিছু-কিছু শুনেছিলাম। ভেবেছিলাম, আর-পাঁচটা ঘটনার মতোই ওর লাভার ওকে

বিপদে ফেলে পালিয়েছে। কিন্তু এখন পিসিমার মুখে এসব কথা শোনার পর সবকিছু কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল।

আমি কল্পনায় এক অতৃপ্তি প্রেমিককে দেখতে পাচ্ছিলাম—যার বয়েস একশো, দুশো, তিনশো কি চারশো বছর। যার ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা আজও মেটেনি। এককালে সে হয়তো এইখানেই থাকত। পাগলের মতো আকুল ভালোবাসা নিয়ে কারও জন্যে অপেক্ষা করত।

আমি চোখ বুজে ফেললাম। পায়ারার বুকের নরম পালক আমার শরীরে বিলি কাটতে লাগল। আমি একট চেনা পারফিউমের গন্ধ পেলাম।

ঠিক তখনই পশ্চিমের রেল-লাইন ধরে বমবাম শব্দে একটা ট্রেন ছুটে গেল। তার হিস্লের শব্দটা আমার বুকের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে গেল।





## কনে-দেখা আলোয়

‘ম’ ব মেয়েকেই ভালো দেখায়।’ ছোট হয়ে-আসা বিড়িতে জোরালো টান দিয়ে মন্তব্য করলেন জগৎ শ্রীমানী।

‘কনে-দেখা আলো কাকে বলে জানতে পারি কি?’ বরেন মল্লিক পান চিবোছিলেন—একটু খোঁচা দিয়েই প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন জগৎ শ্রীমানীর দিকে।

আলোচনাটা শুরু হয়েছিল পাড়ার রবিশঙ্করবাবুর মেয়ের বিয়ে নিয়ে। গতকাল বিয়ের ব্যাপারটা মিটে গেছে। পাত্রের চেহারা একেবারে কার্তিকের মতো। অথচ মেয়ের চেহারা মোটেই মানানসই নয়। কালোকোলো এই মেয়েটির পাত্রস্থ হওয়া নিয়ে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তা ছিল অবশ্যই, তবে পাড়ার লোকদের দুশ্চিন্তা ছিল যেন তার শতগুণ। তাই ইঠাং করে সেই মেয়েটির বিয়ের নেমন্তন্ত্র পেয়ে অনেকেই বেশ স্বাক্ষর হয়ে গিয়েছিলেন।

সুপ্রকাশ পালিত, জগৎ শ্রীমানী, মুজুর মল্লিক, বিজন সরকার, আর প্রিয়নাথ জোয়ারদার—সকলেরই সেই বিয়েতে নেমন্তন্ত্র ছিল। তবে প্রিয়নাথের এক আঙুলীয়ের বিয়ে ছিল গতকালই। ওঁকে সেখানে যেতে হয়েছিল—পাড়ার নেমন্তন্ত্রে যেতে পারেননি।

বৈঠকখানায় বসে বেশ কিছুক্ষণ এই বিয়ে নিয়ে আলোচনার পর

সুপ্রকাশ হঠাৎই বলেছিলেন, ‘খোঁজ নিয়ে দেখুন, রবিশঙ্করবাবু হয়তো কনে-দেখা আলোয় মেয়েকে দেখিয়েছেন। তাই পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়ে গেছে...।’

তাঁর উত্তরে জগৎ শ্রীমানী মন্তব্য করেছেন এবং বরেন মল্লিক পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন।

বিড়ির শেষ টুকরোটা তঙ্গপোশে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন জগৎ শ্রীমানী। তারপর ভুরু উঁচিয়ে গোল-গোল চোখে বরেন মল্লিকের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ফ্যাসফেঁসে গলায় বললেন, ‘বরেন, তুমি কি সত্যিই জানতে চাইছ, না আমি জানি কি না সেটা টেস্ট করছ?’

বরেন মল্লিক ইতস্তত করে চোখ সরিয়ে নিলেন। বোবা গেল, জগৎ শ্রীমানীর শেষের কথাটাই ঠিক।

প্রিয়নাথ গলাখাঁকারি দিয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝোড়লেন, বললেন, ‘কনে-দেখা আলো কাকে বলে সবাই জানে। সুর্য ডুবে যাওয়ার ঠিক পরে—মানে, গোধূলির সময়—যে-আলোটা থাকে স্টেটই কনে-দেখা আলো...।’ হাসলেন ভূতনাথ : ‘কিন্ত এটা কেউ বলতে পারেন, সেই আলোতে কেন কনেকে বা কাউকে ভালো দেখায়?’

চোখে দুষ্টুমির বিলিক তুলে একে-একে তিনজনের মুখের দিকে তাকালেন ভূতনাথ।

সবাই চুপচাপ। মাথার ওপরে ব্রিটিশ আমলের কাঠের ব্রেডওয়ালা পাথা ঘুরছে, কঁাচকঁাচ শব্দ হচ্ছে।

হঠাৎই অ্যানসনিয়া পেন্ডুলাম ঘড়িতে ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। সকলে যেন ঘণ্টার শব্দ শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ঘণ্টার শব্দ শেষ হলে জগৎ শ্রীমানী বললেন, ‘ওই আলোটা খুব নরম। মানে, মোলায়েমভাবে মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়ে!’

বরেন মল্লিকের মুখ দেখে মনে হল, ব্যাখ্যাটায় তাঁর সায় আছে।

কিন্ত সুপ্রকাশ পালিত উসখুস করছিলেন, বারবার ভূতনাথের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

ভূতনাথ সিগারেটে মেজাজি টান দিয়ে জগৎ শ্রীমানীকে বললেন, ‘আপনি ঠিকই বলেছেন—তবে ওটা ঠিক সায়েন্টিফিক এক্সপ্লানেশন হল

না। আমি একটু ধার করা বিদ্যে জাহির করি। কারণ, বিজ্ঞান যেখানে শেষ সেখান থেকে আমার বিদ্যে শুরু। এটা আমি শুনেছিলাম এক সায়েন্টিস্ট বন্ধুর মুখে।

‘কনে-দেখা আলোর মোদা ব্যাপারটা হল, ওই আলোয় কোনও ছায়া পড়ে না। যাকে বলে ডিফিউজ্ড লাইট। মানে, ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে আলো যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সেইজন্যেই মুখের ওপর আলোটা নরম মোলায়েম বলে মনে হয়।’

কিছুক্ষণ কেউই কোনও কথা বললেন না। বোধহয় প্রিয়নাথের ব্যাখ্যাটা মনে-মনে বুৰতে চেষ্টা করছিলেন।

হঠাৎই সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, ‘রাতের কনে-দেখা আলোর কথা আপনারা কেউ কখনও শুনেছেন কি?’

‘তার মানে!’ হাই পাওয়ার চশমার কাছের পিছনে সুপ্ৰকৃতি পালিতের চোখ দুটো অস্বাভাবিকরকম বড় দেখাল।

প্রিয়নাথ স্নান হাসলেন। মাথা ঝুঁকিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন, ‘আমার তো বেশিরভাগ কাজ-কারোজ্জ্বল রাত নিয়ে। তবে এই ঘটনার শুরু হয়েছিল কনে-দেখা আলো দিয়ে। আর শেষও হয়েছে, বলতে পারেন কনে-দেখা আলো দিয়ে। তফসিলে মধ্যে শুধু এই—প্রথমটা দিনের কনে-দেখা আলো, আর শেষেরটা রাতের।’

‘রাতের কনে-দেখা আলো!’ অস্ফুটে বললেন বরেন মল্লিক।

‘হাঁ, রাতের—’ ভূতনাথ বললেন, ‘ধরে নেওয়া যাক, ছেলেটির নাম সুজন—বয়েস আর কত হবে?—এই ছাবিশ-সাতাশ। আমার গল্পটা—মানে, সত্যি ঘটনাটা—ওকে নিয়েই। ও তখন ভালো চাকরি করে। মাবাবা ওর জন্যে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছেন। একমাত্র ছেলেকে এবার সংসারী করে দেবেন ঠিক এইরকম একটা সময়ে ঘটনার শুরু...।’

ধানবাদ থেকে ট্রেনে ফিরছিল সুজন। সঙ্গে মা আর বাপি। মাসিমণির মেয়ের বিয়েতে ওরা চারদিনের জন্য ধানবাদ গিয়েছিল। মায়ের আরও ক'দিন থাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সুজন থাকতে চায়নি। কারণ, অফিস থেকে

ও মাত্র চারদিনেরই ছুটি পেয়েছে। অফিসে জয়েন করেই ওকে আবার চেমাই ছুটতে হবে—অফিসের একটা নতুন প্রজেক্টের মিটিং আছে সেখানে।

বাপিরও অবশ্য বেশিদিন থাকার ইচ্ছে ছিল না। কলকাতায় ব্যবসার কাজ ছেড়ে কোথাও ওঁর মন বসে না। তাই সুজনের মায়ের মন খারাপ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক।

ট্রেনে ওঠার পর থেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছিল সুজন। বলছিল, ক'মাস পরেই ও ছুটি নিয়ে মাকে ধানবাদ ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে। এবারে আর চারদিন নয়—কমপক্ষে দশদিন।

মা তবুও মুখ ভার করে বসেছিল।

বাপি কোনও কথা বলেননি। লম্বা সিটের এক কোণে বসে আপনমনে সিগারেট খাচ্ছিলেন, আর আড়চোখে সুজনদের দেখছিলেন।

সুজনের অনেক কথা গোমড়া মুখে শোনার পর শেষে মাঝেল, ‘তোর জন্মেই আরও দু-দিন থাকতে চেয়েছিলাম—আমার জন্মে নয়।’

‘কেন, আমার জন্মে কেন?’ সুজন অবাক হয়ে জানতে চাইল।

‘রুবিকে তোর জন্মে মেয়ে দেখতে বাস্তুগুলি আম। ও একটা মেয়ের খবর দিয়েছিল। দেখতে নাকি দারুণ। কুল ঝিকেলে ও রুবিদের বাড়িতে আসবে কথা ছিল। তোরা এমন কুরাঞ্জি, মেয়েটাকে দেখার আর সময় পেলাম না।’

রুবি সুজনের মাসিমণির নাম। বিয়ের সম্বন্ধ করার ব্যাপারে মাসিমণির উৎসাহ অফুরন্ত। প্রায়ই অহঙ্কার করে বলেন, ‘এ পর্যন্ত চোদ্দোটা বিয়ের সম্বন্ধ করেছি।’

সুজন মায়ের কাছেই শুনেছে, মাসিমণির টার্গেট নাকি পাঁচশটা সম্বন্ধ। তারপর তিনি এই গুরুণ্দায়িত্বের কাজ থেকে রিটায়ার করবেন। তখন ভারতে বিয়ের হার নির্ধাত গোত্তা খেয়ে নীচে নেমে যাবে।

সুজন জানে, ওর বিয়ের জন্য মা একেবারে আদা-জল খেয়ে লেগে পড়েছে। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মেয়ের ফটো দেখেছে ও—কিন্তু ওর পছন্দ হয়নি। কোনও-কোন সময় মাকে ও মিনমিন করে বলেছে, ‘এত তাড়াছড়োর কী আছে। আগে চাকরিতে একটু দাঁড়িয়ে নিই...।’

কিন্তু মা সেসবে আমল দেয়নি। অনুসন্ধান পুরোদমে চলেছে মায়ের



আক্ষেপটা শোনার পর সুজন মাথা নেড়ে বলল, 'উফ, তোমাদের কিছু এন্থু আছে বটে!'

'কী বললি?' ছেলের কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে মা প্রশ্ন করল।

সুজন বলল, 'না—কিছু না।'

তারপর জানলা দিয়ে বাইরের ছবি দেখতে লাগল।

গাছপালা, মাঠ-পাঞ্চর, দিঘি, হাঁস, ফিঙে ঘুঘু—সব একে-একে ছুটে চলেছে উলটো দিকে। শুধু পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্যটা জানলার ফ্রেমে নাছোড়বান্দার মতো আটকে রয়েছে।

কী অপূর্ব ছবি! এ-ছবি কেবল একজনই আঁকতে পারেন।

সুজন মুঝ হয়ে গিয়েছিল, আনন্দনা হয়ে গিয়েছিল। তাই খেয়াল করেনি, ট্রেন কখন যেন আসানসোল স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর সিঙ্গারাওয়ালাদের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে।

আজ রবিবার। তাই ট্রেন বেশ ফাঁকা। সুজনদের উলটোদিকের সিটে জানলার পাশ যেম্বে একজন মাত্র যাত্রী বসে আছেন। চোখে হাই পাওয়ার চশমা। থলথলে চেহারা। ধানবাদ থেকে ওঠার পঙ্কজ একটা হিন্দি ম্যাগাজিন খুলে বসেছেন।

ট্রেন ছাড়ার হাইস্ল দিল। তারপর নেড়ে উঠল। ঠিক তখনই সুজন দেখল তিনজনের একটি পরিবার ওদের কিউবিক্ল-এর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনজনেরই চোখের নজর পছন্দসই সিট খুঁজছে।

লম্বা সিটটা প্রায় খালি দেখে পরিবারের কর্তা তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই, এখানে এসো—।'

সুজনদের উলটোদিকে ওরা তিনজন বসে পড়ল।

ভদ্রলোক প্রোঢ়। তার স্ত্রীর বয়েসও মানানসই। আর ওঁদের মেয়ের বয়েস কত হবে? বড়জোর কুড়ি-বাইশ।

মেয়েটির বোধহয় জানলার কাছে বসার ইচ্ছে ছিল। কারণ, সুজন লক্ষ করল, খানিকক্ষণ উসখুস করার পর ও হিন্দি-ম্যাগাজিন-পড়া ভদ্রলোককে নীচু গলায় কিছু একটা অনুরোধ করল।

ভদ্রলোক চমকে উঠে মেয়েটির দিকে তাকালেন। তারপর সৌজন্য দেখিয়ে বললেন, 'হাঁ, হাঁ, কিউ নহি—।' এবং কষ্ট করে উঠে সিটের

একেবারে এ-প্রাপ্তে এসে বসলেন—যাতে ওরা তিনজন পাশাপাশি বসতে পারে।

সুজন মেয়েটিকে একটু খুঁটিয়ে দেখছিল—অনেকটা যেন পাত্রী দেখার চোখে। হলুদ-কালোয় ছাপা চুড়িদার। গলায় সরু চেন। কানে চকচকে পাথরকুচি বসানো দুল। বাঁ-হাতে ঘড়ি। কপালে সরবরের দানার মতো টিপ।

গায়ের রং ময়লা। মুখটা সামান্য লম্বাটে। নাক-স্পষ্ট। তার ডান পাশে একটা বড় জরুল। ঠোঁট কালচে গোলাপি। চিবুকে ছেউ টোল রয়েছে।

মেয়েটির চোখ দুটি অতি সাধারণ। তবে চোখের পালক বেশ ঘন এবং লম্বা। মাথায়ও অনেক চুল। আলগা বেণীর বেশ খানিকটা সিটের ওপরে সাপের মতো ঝঁকে পড়ে আছে।

মেয়েটি মোটেই সুন্দরী নয়। তবে সুন্দী বলা যায় অন্যাসেই। আচ্ছা, সুজন যদি পাত্রী দেখতে যেত তা হলে এই মেয়েটিকে কি পাত্য পছন্দ করত? বোধহয় না।

সুজনের এখন এই এক মুশকিল হয়েছে। সুন্দরী হিতা কোনও তরঙ্গী দেখলেই ওর মন পাত্রী দেখার মাপকাঠিতে জ্বর সৌন্দর্য মাপতে চায়। এ এক অদ্ভুত খেলা। মনকে হাজার বারুণ করেও সুজন বাগ মানাতে পারেনি। এ জন্য নিজের ওপরে জ্বর মোৰে-মাঝে ভীষণ রাগ হয়।

নিজের এই পাগলামিতে সুজন আপনমনেই হেসে ফেলল। ওর খেয়াল ছিল না, তখন ও আনমনাভাবে তাকিয়ে ছিল মেয়েটিরই দিকে।

‘হাসছেন কেন?’

সুজন একেবারে হকচকিয়ে গেল। কী বলবে ভেবে পেল না।

কারণ, মেয়েটিই সামান্য বিরক্ত গলায় প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েছে। ওর ভুরু কুঁচকে গেছে। চোখে সন্দেহের ছায়া।

সুজনেরই মা-বাবা পাশে বসা। সুজন খুব বিরুত হয়ে পড়ল। ওর মুখ লাল হয়ে গেল। কানে উত্তাপ টের পেল।

কোনওরকমে ও বলল, ‘আপনি মনে হয় ভুল বুঝেছেন। আমি অনমনা হয়ে স্কুল লাইফের কথা ভাবছিলাম। তখনকার একটা মজার ব্যাপার হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় হাসি পেয়ে গেছে...।’

মেয়েটি এই উত্তরে তেমন খুশি হল বলে মনে হল না। তাই সুজন

সাততাড়াতাড়ি স্মৃতি হাতড়ে একটা স্কুলের গল্প শুনিয়ে দিল।

গল্পটা সত্যিই মজার ছিল। তাই মেয়েটিও হেসে ফেলল।

দুই পরিবারের গল্প শুরু হয়ে গিয়েছিল খানিক আগেই। কথায়-কথায় জানা গেল মেয়েটির নাম চন্দ্রা। ওদের ‘দেশ’ আসানসোল। সেখানে এক আঞ্চলিক বিয়ে উপলক্ষে ওরা এসেছিল। এখন কলকাতায় ফিরছে। ধানবাদেও ওদের দু-চারজন আঞ্চলিক আছে। কখনও-কখনও ধানবাদেও ওরা বেড়াতে যায়।

টুকরো-টুকরো কথা হচ্ছিল, চা খাওয়া হচ্ছিল। তারই মধ্যে সুজন লক্ষ করল, মা বারবার ওর দিকে দেখছে। মনে হল যে ইশারায় কিছু একটা জনতে চাইছে। সুজন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল।

চন্দ্রা তখন ওর জানলার তাকে বাঁ হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে হাতের পিঠের ওপরে চিবুক রেখেছে। দু-চোখ মেলে দেখছে বাইরের দিকে। ওর কয়েক গোছা চুল হাওয়ার উড়ছে—কখনও কপালে পঁড়ছে, কখনও চোখের ওপর।

বাইরে তখন সুর্য ডুবে গেছে। কিন্তু তার পিঠির আভা থেকে গেছে আকাশময়। এ সময়ে মেঘের যা কাজ তাই করেছে। সূর্যের ভালোবাসায় কুটিকুটি হয়ে রামধনুর নানান রং পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। অপরূপ এক আলো সবাইকে তখন সুন্দর করে তুলেছে। গাছপালা, ধানখেত, পুকুর, ইলেকট্রিক-তারে বসে থাকা পাখি—সবই কেমন যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে।

চন্দ্রাকেও তখন অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

এই অসামান্য আলোয় ওকে দেখে সুজন মুঝ হয়ে গেল। ওর ঝুকের ভেতরে এক অস্তুত অনুভূতি মুচড়ে উঠল। কিশোর বয়েসের প্রথম প্রেমের মতো ওর মনে হল, চন্দ্রাকে না পেলে বাঁচবে না।

কলকাতায় ফিরেও এই অনুভবটা ওর একটুও পালটাল না। অফিসে জয়েন করে, চেমাইয়ে মিটিং-এ গিয়ে, আবার বাড়িতে ফিরে—সবসময় ওর নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল।

এর নাম যদি প্রেম হয় তা হলে মানতেই হবে এ বড় অস্তুত প্রেম!

ঠিকানা আদান-প্রদান ট্রেনেই হয়েছিল। সুতরাং বেশ কিছুদিন উদাসভাবে

ছটফট করে কাটানোর পর সুজন একদিন চিঠি লিখল চন্দ্রাকে।

প্রথম চিঠিটা ছিল নির্দেশ বন্ধুত্বের চিঠি। উত্তরও এল অনেকটা সেইরকম।

কিন্তু ধীরে-ধীরে চিঠিগুলোর রং বদলাতে লাগল। সুজন আর চন্দ্রার নিয়মিত দেখা হতে লাগল। এক রহস্যময় টান সুজনকে চন্দ্রার সঙ্গে আটেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলতে চাইল।

মা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মনে-মনে খুশি হয়েছিল। তবে আক্ষেপের একটা ছেট খোঁচা তাকে কখনও-কখনও বিরক্ত করছিল : চন্দ্রার চেয়ে সুন্দরী বেশ কয়েকটি মেয়েকে সুজন এর আগে নাকচ করেছে। যদিও তাদের বংশমর্যাদা, ধনসম্পদ, ইত্যাদি ছিল অনেক উঁচু মানের।

কিন্তু প্রেম কখনও অভিভাবকদের ইচ্ছেমতন পথ চলে না। সুতরাং, দুই পরিবারের সমরোতায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের কথাবার্তা শুরু হল। এবং বিয়ের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল।

ঠিক এইরকম একটা সময়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

চন্দ্রার সপরিবারে রাতারাতি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

নিরুদ্দেশই বলা যায়, কারণ সুজন একজন ওদের বেলঘরিয়ার বাড়িতে গিয়ে দ্যাখে ওদের দরজায় তালা খুলেছে।

আশপাশে খোঁজখবর করে স্পষ্ট কিছু জানা গেল না। দু-একজন ভাসা-ভাসা ভাবে বললেন, যে, ওদের কোন এক আত্মীয় নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেই খবর পেয়ে ওরা তাড়াহড়ো করে চলে গেছে।

এর বেশি আর কোনও খবর জোগাড় করতে পারল না সুজন। ভাঙচোরা মন নিয়ে ফিরে এল। ওর রঙিন হয়ে ওঠা জীবনটা চোখের পলকে সাদা-কালো হয়ে গেল।

বিষণ্ণ বিধৃত অবস্থার মধ্যে সুজনের দিন কাটতে লাগল। অবশ্য দিন না বলে সেগুলোকে রাত বলাই ভালো। চন্দ্রার কোনও খবর পাওয়া গেল না, কোনও চিঠিও এল না। সুজনের মা-বাপি ধাক্কাটা ধীরে-ধীরে সামলে নিতে পারলেও সুজন পারল না। ও কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। অফিসের কাজে আরও বেশি করে ঢুবে গেল। আগ বাড়িয়ে অফিসের টুরে যেতে লাগল, আর চলার পথে তিনটে চেনা মুখকে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াতে

লাগল। চন্দ্রাকে খুঁজে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েও ও ঠিক যেন ছাড়তে পারেনি।

প্রায় একবছর পর চলন্ত ট্রেনের কামরায় বিবাগী সুজন হঠাৎই চন্দ্রার বাবা অপরেশবাবুকে দেখতে পেল।

কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে অপরেশবাবুর!

সারা মুখে কাঁচা-পাকা দাঢ়ি। গাল চুপসে গেছে। চোখ গর্তে বসা। কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। গায়ের রং আগের তুলনায় অনেক কালচে হয়ে গেছে। মাথার চুলের চেহারা দেখে মনে হয় বহুদিন তাতে তেল-জল পড়েনি।

অপরেশবাবুকে দেখেই চন্দ্রার কথা মনে পড়ে গেল সুজনের। উঃ কতদিন...কতদিন পর চন্দ্রার ঘনিষ্ঠ একজন আত্মীয়কে সুজন দেখতে পেল!

সুজন পূর্বা এক্সপ্রেস ধরে দিল্লি থেকে ফিরছিল। অফিস থেকে ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াতের সুযোগ থাকলেও ও সেকেন্ড ক্লাসে যাতায়াত করে। চন্দ্রার নিরন্দেশ হওয়ার পর থেকে ও এই অভিযন্তা রপ্ত করেছে। ওর মনে অন্তু এক আশা ছিল : যদি আচমকা ক্লোনও ট্রেনে চন্দ্রার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! দিল্লির ট্রেন ধানবাদ আসন্নস্থাল ছুঁয়ে যায়। তাই অফিস থেকে ও প্রায়ই দিল্লি টুরের দায়িত্ব পালিত।

এবারে টুর সেরে ফেরার পথে ট্রেন যখন ধানবাদে দাঁড়িয়েছে তখনও ও বরাবরের মতোই জানলা দিয়ে চক্ষুল চোখ মেলে ধরেছে, আর্তের মতো খুঁজছে একটা চেনা মুখ—কিন্তু বরাবরের মতোই হতাশ হয়েছে।

ট্রেন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা লেটে চলছিল। সহ্যাত্মীরা অনেকেই বিরক্তির মন্তব্য করছিল। সুজনের সেগুলো কানে ঢোকেনি। ও চোখ বুজে বিভোর হয়ে চন্দ্রার কথা ভাবছিল।

আচমকা অপরেশবাবুকে চিনতে পেরে সুজনের হংপিণু লাফিয়ে উঠল গলার কাছে।

কামরার দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে জীর্ণ-শীর্ণ মানুষটা শূন্য চোখে চেয়ে আছে একটা সিলিং ফ্যানের দিকে। ওঁর পায়ের কাছে একটা বড় থলে।

‘মেসোমশাই!’ ওঁর কাছে গিয়ে ডাকল সুজন।

অপরেশবাবু চমকে উঠে তাকালেন সুজনের দিকে। কামরার মলিন

আলোয় বাপসা নজরে ওকে ঠাহর করতে চাইলেন।

‘মেসোমশাই, আমি সুজন। মাসিমা কেমন আছেন? চন্দ্রা কেমন আছে?’

অপরেশবাবু সুজনকে চিনতে পেরে ব্রিবত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, চোখ নামিয়ে বসে রইলেন অপরাধীর মতো।

সুজন বসে পড়ল ওঁর পাশে : ‘এ কী চেহারা হয়েছে আপনার। চন্দ্রা, মাসিমা...ওঁরা কেমন আছেন?’

অপরেশবাবু আর সামলাতে পারলেন না। বুকের ভেতর থেকে পাক খেয়ে উঠে আসা একটা কষ্ট ওঁকে ভেঙেচুরে দিল। শীর্ণ হাতে সুজনের হাত চেপে ধরে তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। কিছু একটা বলতে চেয়েও যেন বলতে পারছিলেন না—শুধু ঠোঁট বেসামালভাবে কাঁপছিল, চোখ দুটো ভিজে উঠছিল পলকে।

অনেকগুলো নীরব মুহূর্ত এইভাবে কেটে গেল।

সুজন মানুষটাকে সময় দিল। অনেক প্রশ্ন ওর মনে ভেড় করে এলেও ও চুপ করে রইল।

নিজস্ব তালে শব্দ তুলে ট্রেন ছুটে চলেছে, ঘোরের অঙ্ককার ভেদ করে তিরের মতো ছুটে আসছে বাতাস। বাতাসে স্থান্য ঠান্ডা ভাব। শীত আর বেশি দূরে নেই।

অনেকক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বলতে পারলেন অপরেশবাবু।

মালবাজারে ওঁর ছোট ভাইয়ের হঠাতই হার্ট অ্যাটাক হয়। তার সঙ্গে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা এতটাই ছিল যে, টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্রই ওঁরা তিনজনে ছুটে যান শিলিঙ্গড়ি। শহর থেকে প্রাইভেট কারে করে মালবাজারে যাওয়ার পথে একটা ট্রাকের সঙ্গে ওঁদের গাড়ির মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয়। চন্দ্রা, চন্দ্রার মা—দুজনেই সাংঘাতিকরকম চোট পায়। বাঁচার কোনও আশাই ছিল না। তারপর বহু কষ্ট করে ডাক্তার-হাসপাতাল, জড়িবুটি-কবিরাজ, ঝাড়ফুঁক-তন্ত্রমন্ত্র করে কোনওরকমে শেষ রক্ষা হয়। অপরেশবাবুর বাঁ-হাতটা ভেঙে গিয়েছিল, তা ছাড়া মাথাতেও চোট পেয়েছিলেন। সেসব সামলে ওঠার পর কারও সঙ্গে তিনি আর যোগাযোগ করেননি—যোগাযোগ করার মতো পরিস্থিতিও ছিল না। তাই ওঁরা একরকম অঙ্গাতবাসে চলে যান। আসানসোলের এক নির্জন প্রান্তে গিয়ে নতুন ঠিকানায় থাকতে শুরু করেন।

অপরেশবাবু একসময় গিয়ে কলকাতার পাট চুকিয়ে চলে আসেন। তারপর থেকে সম্পর্কের সব ডালপালা ছিন্ন করে ওঁরা একান্তে চুপিচুপি দিন কাটান।’

‘...এ আমাদের নিজেদের দুনিয়া, সুজন। এখানে কেউ চুকতে পারে না...এখান থেকে কেউ চলে যেতেও পারে না...।’ বুক ভাঙা এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অপরেশবাবু।

ওঁর কাহিনির সবটুকু সুজনের কাছে স্পষ্ট হয়নি। কেন ওঁর আত্মগোপন করে রয়েছেন? তা হলে কি দুর্ঘটনার পর চন্দ্রা আর মাসিমার মুখ বীভৎস কৃৎসিত ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে! এমন কী হয়েছে, যে ওরা এরকম চোরের মতো মুখ লুকিয়ে বসে আছে!

সুজন ভেতরে-ভেতরে অস্থির হয়ে পড়ছিল। চন্দ্রাকে একটিখন্দ দেখার জন্য ওর অস্তরাত্মা ছটফট করছিল।

আর থাকতে না পেরে ও বলল, ‘আমি...আমি চন্দ্রের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।’

‘না, তা আর হয় না।’ শীর্ণ অবসন্ন অপরেশবাবু ক্লাস্তভাবে মাথা নাড়লেন।

‘মেসোমশাই, প্লিজ! আপনি জানেন না, এই একটা বছর আমি কীরকম পাগলের মতো আপনাদের খুঁজে বেড়িয়েছি! অফিসের টুরে সবসময় সেকেন্ড ক্লাসে ট্র্যাভেল করি শুধু এই আশায় যে, কোনদিন ছট করে আপনাদের কারও সঙ্গে দেখা হবে যাবে। সত্যিই...দেখা হল তো!’ সুজন কেঁদে ফেলল। কনে -দেখা আলোয় প্রথম চন্দ্রাকে দেখার অপরূপ ছবিটা ওর বুকের ভেতর থেকে হঠাতে করেই চলে এল চোখের সামনে।

ও কিছুতেই কান্না চাপতে পারছিল না। এতদিনের কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা, যেন এই প্রথম অঙ্কার কুঠির থেকে বেরিয়ে এল বাইরে।

অকালবৃদ্ধ মানুষটার হাত আঁকড়ে ধরে ভাঙা গলায় সুজন বলল, ‘একটিবার...মেসোমশাই, প্লিজ...একটিবার...।’

আকুল যুবকটির কান্না-ভেজা চোখে অপরেশবাবু কী দেখলেন কে জানে! নরম গলায় বললেন, ‘চলো। কিন্তু চন্দ্রা কি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে?’

‘কেন, দেখা করতে চাইবে না কেন?’

‘ও...ও অনেক...বদলে গেছে...’

কেমন বদলে গেছে চন্দ্রা? দুর্ঘটনায় ওর চেহারা বদলে গেছে? নাকি মনটা?

সুজন শত ভেবেও কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। এলোমেলো বহুরকম ভাবনা ওর মনের ভেতরে উথালপাথাল করতে লাগল।

এরকম একটা মনের অবস্থা নিয়ে আসানসোল স্টেশনে নামল সুজন। স্টেশনের বাইরে এসে ওরা একটা সাইকেল রিকশায় উঠে বসল।

জ্যোৎস্নার রাত। কালো ভেলভেটের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। কারও কাছে কিছু ধার করে সেটা অকাতরে বিলিয়ে দেওয়া বড় সহজ নয়। অথচ চাঁদ হাসিমুখে ধার করা আলো বিলিয়ে চলেছে।

সাইকেল রিকশা ছুটছিল। বাতাসে সামান্য শীত-শীত ভাবে<sup>১</sup> সুজন বেশ গুটিসুটি মেরে বসল। অপরেশবাবু আপনমনে সিগারেট ধুচ্ছিলেন। কোনও কথা বলছিলেন না।

শুরুতে একবার শুধু বিড়বিড় করে বলেছিলেন, তুমি ওদের সঙ্গে দেখা না করলেই ভালো করতে! কিন্তু তুমি যেভাবে জেদ ধরেছ...। অবশ্য তোমার কষ্টটাও আমি বুঝি...’

জনপদ ক্রমশ কমছিল। রাস্তায় লোকজন আঙুলে গোনা যায়। সাইকেল রিকশাও চোখে পড়ছে কম। শুধু সুজনদের নিয়ে এই রিকশাটা একয়েড়েভাবে ছুটে চলেছে। কখন থামার সময় আসবে কে জানে!

একসময় পিচের রাস্তা শেষ হয়ে কাঁচা রাস্তা শুরু হতেই রিকশা থামালেন অপরেশবাবু। রিকশা থেকে নেমে ওঁরা হাঁটা পথ ধরলেন।

হাঁটা পথ একসময় শেষ হল। টিনের চাল দেওয়া বড়সড় একটা একতলা বাড়ির সামনে এসে অপরেশবাবু আলতো গলায় বললেন, ‘এসো, সুজন—আমরা এখন এখানেই থাকি।’

বাড়ির ভেতরে ঢুকেই কেমন অস্তুত লাগল সুজনের। ঠান্ডার কামড়টা বাইরের চেয়ে যেন বেশি। আর হালকা ন্যাপথালিনের গঙ্গে পরিবেশটা ভারী হয়ে রয়েছে।

বড় মাপের বসবার ঘর। তার চারটে জানলাই হাট করে খোলা। এদিক-

ওদিক ছিটকে পড়া চাঁদের আলো চোখে পড়ছে। আর ঘরের আলো এতই  
কম যে, চাঁদের আলোর সঙ্গে প্রায় পাঞ্চা দিচ্ছে।

‘এত কম আলো...আপনাদের অসুবিধে হয় না?’ সুজন অবাক হয়ে  
বলল।

‘অসুবিধে?’ শব্দ করে সামান্য হাসলেন অপরেশবাবু। ওঁর মুখে ছায়া  
পড়ায় হাসিটা দেখা গেল না : ‘আলো না থাকলেই বরং আমাদের সুবিধে  
হয়। ওরা তো একদম আলো সহ্য করতে পারে না। আমিও আস্টে-আস্টে  
ওদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি।’

সুজনের মনের ভেতরে হঠাতেই কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হল। ওর  
চোখ এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে চন্দ্রাকে, মাসিমাকে খুঁজল।

সেটা লক্ষ করে অপরেশবাবু বললেন, ‘তুমি বোসো—স্টো ওদের  
ডাকছি।’

একটা কাঠের চেয়ারে বসল সুজন। কিন্তু কাঠের চেয়ে কোর্টি ভীষণ ঠাণ্ডা।  
ও বেশ অবাক হয়ে গেল। হাতের ব্রিফকেসটা লেন্সেয়ে রাখল একপাশে।

অপরেশবাবু চলে যাওয়ার একটু পরেই মঙ্গিমা ঘরে এসে ঢুকলেন।

কী জমকালো সাজে সেজেছেন তিনি! মেসেন্স আলোতেও সেই সাজ প্লো-  
সাইনের মতো ঝকমক করছে।

গাঢ় হলুদ রঙের জরিপাড় শাড়ি। দু-হাত ভরা গয়না। গলায় জড়োয়া  
হার। কানে চকচকে দুল। নাকে নাকছাবি। কপালে বড় টিপ। সিঁথিতে  
উজ্জল সিঁদুর। যেন একেবারে নতুন বউ।

মাথায় ঘোমটা টেনে শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে সুজনের কাছাকাছি বসলেন  
মাসিমা।

‘কেমন আছ, সুজন?’

সুজন বিহুল চোখে চন্দ্রার মাকে দেখছিল, কোনওরকমে ঘাড় নাড়ল :  
‘ভালো আছি।’

মেসোমশাইয়ের কাছে আমাদের বিপদ-আপদের কথা সব তো শুনেছে।’

সুজন আবার ঘাড় নাড়ল।

এতদিন পর দেখা হল, অথচ মাসিমার মধ্যে কোনও উচ্ছ্বাস নেই।  
যেন আগে থেকেই জানতেন, সুজন আজ দেখা করতে আসবে!

‘কেমন আছেন, মাসিমা?’

‘ওই একরকম...।’

‘চন্দ্রা কেমন আছে?’

বিষণ্ণ হাসলেন মাসিমা : ‘ওই আমারই মতন।’

ঘরের আলোটা কমজোরি হলেও সরাসরি মাসিমার মুখের ওপরে গিয়ে পড়েছিল। সুজন মুখটাকে আগের চেনা মুখের সঙ্গে মনে-মনে মিলিয়ে দেখেছিল।

মুখের চামড়া তেলতেলে টানটান। দু-চোখ ছবির মতো সুন্দর। মাসিমার মুখটা হয়তো এরকমই ছিল, তবে এখন অনেক সজীব আর নবীন দেখাচ্ছে।

সুজনের ছৌ-নাচের মুখোশের কথা মনে পড়ল।

মাসিমার টুকটাক কথা বলার মধ্যেই অপরেশবাবু সুজনের জ্ঞান্য এক কাপ চা নিয়ে এলেন। সঙ্গে প্লেট নেই, বিস্কুট নেই।

সব মিলিয়ে দৃশ্যটা সুজনের কেমন খাপছাড়া লাগলো ‘মাসিমা, চন্দ্রা থাকতে অপরেশবাবু হঠাতে চা করতে গেলেন কেন্দ্ৰ তা ছাড়া ওঁদের অবস্থা কি এখন এতই খারাপ যে, অতিথির কপালে প্লেট বা বিস্কুটও জোটে না!

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুজন ন্যাশ্বালিনের গন্ধ পেল। এই বিশ্রী গন্ধটা ওঁরা কীভাবে সহ্য করছেন কে. জানে!

‘সব কাজ আমাকে একার হাতেই করতে হয়...’ হাতে হাত ঘষে অনেকটা যেন কিন্তু-কিন্তু ভাবে অপরেশবাবু বললেন, ‘ওরা ঠিক পারে না...।’

অ্যাসিডেটের ব্যাপারটা নিয়ে খানিকক্ষণ কথা হল। চন্দ্রার কথাও হল। সুজনের মা-বাপির খোঁজ নিলেন মাসিমা। কিন্তু ওঁর কথায় উৎস্তরার কোনও ছিটেফেটাও খুঁজে পাচ্ছিল না সুজন। টিভিতে যাঁরা খবর পড়েন মাসিমা যেন ঠিক তাঁদের মতন করে কথা বলছিলেন।

কিছুক্ষণ পর যখন কেউ আর কথা খুঁজে পাচ্ছিল না তখন ভেতরে-ভেতরে অধৈর্য হয়ে ওঠা সুজন জিগ্যেস করল, ‘চন্দ্রা কোথায়, মাসিমা? ওর সঙ্গে একটু দেখা করব...।’

‘দেখা করবে করো। ও বাইরের বাগানে বসে আছে।’ নির্দিষ্টভাবে এই

কথা বলে বাড়ির পিছনদিকটা ইশারায় দেখালেন মাসিমা।

অপরেশবাবু সুজনকে ডাকলেন, ‘এসো, আমার সঙ্গে এসো—।’

একটা ছোট ঘর এবং রান্নাঘর পেরিয়ে বাড়ির খিড়কি দরজার কাছে পৌঁছে গেল সুজন। অপরেশবাবু দরজা খুলে বাইরে বেরোলেন, ওকেও ডেকে নিলেন।

সামনে প্রায় বিষেখানেক জমি। তার এখানে-সেখানে এলোমেলোভাবে নানান জাতের গাছ বড় হয়ে উঠেছে। তবে একপাশে অনেকটা জায়গা ফাঁকা পরে আছে। সেখানে কয়েকটা বেদি চোখে পড়ছে। হয়তো অপরেশবাবুই সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছেন।

সবক'টা বেদি খালি—শুধু একটি ছাড়া। সেখানে ছায়া-ছায়া কেউ একজন বসে আছে।

‘চন্দ্রা—।’ অপরেশবাবু চাপা গলায় ডাকলেন।

নীচু গ্রামের সেই ডাক চন্দ্রা দিব্য শুনতে পেল, সম্ভাস্ত ঘাড় ফেরাল সুজনদের দিকে।

‘তুমি যাও—কথা বলো।’ সুজনকে অল্পক্ষণ করে ঠেলে দিলেন অপরেশবাবু। তারপর ফিরে চলে গেলেন বাড়ির ভেতরে। চন্দ্রার সঙ্গে একা কথা বলতে পারলে সুজন স্থানক্ষেত্র হালকা হবে।

কেমন যেন সম্মোহিতের মতো সুজন এক পা দু-পা করে এগিয়ে চলল চন্দ্রার দিকে। পায়ের নীচে ঠাণ্ডা ঘাসের ছোঁওয়া ওর শরীরে একরকম শিরশিরানি জাগিয়ে তুলছিল। এক ঝাঁক পাখির মতো উড়ে এসে রাতের বাতাস সুজনের চোখে-মুখে ঝাপটা মারল।

এক টুকরো মেঘ কোথা থেকে ভেসে এল। পুর্ণিমার চাঁদকে সেটা ঢেকে দিতেই কটকটে জ্যোৎস্নার আলো-ছায়া উধাও হয়ে গেল। এক পরিব্যাপ্ত ঘষা আলো মোলায়েমভাবে ছড়িয়ে পড়ল চরাচরে।

সুজনের কনে-দেখা আলোর কথা মনে পড়ে গেল।

ও পায়ে-পায়ে পৌঁছে গেল সেই বেদির কাছে। চন্দ্রার কাছ থেকে হাতদুয়েক দুরত্বে বসে পড়ল।

চন্দ্রার সাজপোশাক সুজনকে মোটেই অবাক করল না। কারণ, একটু আগেই ওর মায়ের জমকালো সাজ ও দেখেছে। তবে চন্দ্রার সাজ যেন

হৃষি মায়ের মতন—এমনকী ঘোমটাটা পর্যন্ত!

চন্দ্রার পরনে টুকটুকে লাল শাড়ি, যদিও চাঁদের আলোর রংটা ভালো করে ঠাহর হচ্ছে না। সারা গায়ে গয়না। খোঁপার পাশ থেকে ফুলের মালা ঝুলছে। তার ওপর দিয়ে ঘোমটা টানা। আর ঘোমটার ভেতরে চন্দ্রার টলটলে মুখ।

‘চন্দ্রা!’ আবেগমথিত গলায় ডেকে উঠল সুজন। ন্যাপথালিনের গন্ধটা তখনও ওর নাকে আসছে।

চন্দ্রা ওর ডাকে মুখ ফেরাল। কোনও কথা বলল না।

চন্দ্রার মাথায় ঘোমটা কেন! ওর কি তা হলে বিয়ে হয়ে গেছে! কিন্তু কপালে বা সিঁথিতে তো সিঁদুরের ছোঁওয়া চোখে পড়ছে না!

‘চন্দ্রা, এই একটা বছর আমি তোমাকে পাগলের মতো খুঁজেছি। যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হয়ে আমি শেষ হয়ে গেছি। আমার কথা তোমার মনে পড়েনি?’

‘পড়েছে।’ আবেগহীন গলায় বলল চন্দ্রা, ‘কিন্তু ক্ষেমওঁ উপায় ছিল না। তুমি আমাকে খুঁজে পাও...আমাদের খুঁজে পাও...আমরা চাইনি। কিন্তু সবই নিয়তি! নইলে বাবার সঙ্গে আচমকা তোমার দেখা হবে কেন?’

এ কোন চন্দ্রা! এ রকম কোনও চন্দ্রাকে তো সুজনের মনে পড়ছে না।

‘আমি এখনও তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি, চন্দ্রা...।’

‘অপেক্ষা!’ খিলখিল করে হাসল চন্দ্রা : ‘আমার সব অপেক্ষা শেষ হয়ে গেছে। তুমি এবার চলে যাও।’

অবাক হয়ে চন্দ্রার মুখের দিকে তাকাল সুজন। চন্দ্রা ওকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। ও তো ভেবেছিল রাতটা এখানে থাকবে। তারপর কাল সকালে বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে তবে ফিরবে!

চন্দ্রাকে হারিয়ে পাওয়ার আনন্দ সুজনের অন্যান্য চেতনা আর বোধ আচম্ভ করে দিয়েছিল। ও হতবাক হয়ে চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে ছিল।

রাতের বাতাস হঠাৎই যেন চপ্পল হয়ে উঠল। গাছের পাতা শিরশির শব্দ তুলল। জোনাকিরা এদিক-ওদিক উড়ছে। আর টলটলে জ্যোৎস্নার অপরূপ কনে-দেখা আলো রাতকে আরও সুন্দর, আরও রহস্যময়ী করে তুলেছে।

ঘোমটার আড়ালে চন্দ্রাকে যেটুকু দেখা যাচ্ছিল তাতেই মাতাল হয়ে গিয়েছিল সুজন। ও সামনে ঝুঁকে পড়ে চন্দ্রার একটা হাত মুঠো করে ধরল।

সঙ্গে-সঙ্গে চিংকার করে উঠল চন্দ্র। এক বটকার হাত টেনে নিতে চাইল। বাতাসের ঝাপটায় ওর ঘোমটা খসে গেল।

‘এসব কী করছ! তুমি চলে যাও!’

অবাক হয়ে সুজন হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল। তবে চন্দ্রাকে মুঞ্চ হয়ে দেখছিল। দেবী প্রতিমার মতো মসৃণ তেলতেলে মুখ চাঁদের আলোয় অনন্য হয়ে উঠেছে।

‘চন্দ্র! আবার ডেকে উঠল সুজন, ‘আমি চলে যাওয়ার জন্যে আসিনি।’ ওর বুকের ভেতরটা কেমন মুচড়ে উঠছিল।

হঠাৎই পিছন থেকে অপরেশবাবুর গলা পাওয়া গেল। তুমি চলে যাও, সুজন। তাতে সবার ভালো হবে।’

চমকে মুখ ফেরাতেই অপরেশবাবুকে দেখতে পেল সুজন। পাশে দাঁড়িয়ে মাসিমা। ওঁর কখন যেন নিঃশব্দে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

‘আজ রাত্তিরটুকু থেকেই কাল সকালে চলে যাব, মেসোমশাই।’ অনুনয়ের সুরে বলল সুজন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অপরেশবাবু। বিরতভাবে বললেন, ‘তুমি আজ রাতেই চলে যাও—।’

‘কেন?’

‘আমাদের এখানে রাতে কেউ থাকে না।’ একটু থেমে তারপর : ‘শুধু আমরা তিনজনে থাকি।’

অপরেশবাবুর শেষ কথাটা জ্যোৎস্নারাতে নিশাচর পাথির মতো ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়াতে লাগল। ওদের ঘিরে ঘুরপাক খেতে লাগল : শুধু আমরা তিনজনে থাকি শুধু আমরা তিনজনে থাকি শুধু আমরা তিনজনে...।’

সুজন উঠে দাঁড়াল। ও ঠিক বুঝতে পারছিল না এখন কী করবে। রাতের আঁধার, বাতাস, জোনাকির দল, গাছ-গাছালি, আর এই তিনজন রহস্যময় মানুষ ওকে কেমন যেন দিশেহারা করে দিচ্ছিল।

মাসিমা মেসোমশাইয়ের হাত ধরে টানলেন। ওঁরা গিয়ে বসলেন বেদিতে,

চন্দ্রার পাশে। মেসোমশাই মাঝখানে—ওর দু-পাশে ওর স্ত্রী আর মেয়ে। ওঁদের বসার ঢংটা এমন যেন স্টুডিওতে বসে গ্রুপ ফটো তোলার পোজ দিচ্ছেন।

ঁচাদের সামনে থেকে মেঘের আড়াল হঠাৎই সরে যেতে জ্যোৎস্নার তীব্র আলো-ছায়া আবার ফিরে এল।

তখন সুজন দেখল, চন্দ্রার মুখে জরুলটা আর নেই। ওটা কোথায় গেল! অ্যাক্সিডেন্টের পর কি প্লাস্টিক সার্জারিতে বাদ গেছে!

ও অবাক হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই অপরেশবাবু হাত তুলে ওকে থামতে ইশারা করলেন।

‘চন্দ্রাকে তুমি দেখতে চেয়েছিলে—দেখেছ, কথাও বলেছ। এবার তুমি যাও সুজন। তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি। তবে জেনে রেঞ্জে আমরা আরও কষ্টে আছি।’

বাতাস হঠাৎই আরও অস্ত্রির হয়ে উঠতেই মাসিমা<sup>১</sup> খসে পড়ল। মাসিমা আর চন্দ্রার খোঁপা কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় খুলে গেল। বাতাসে ওদের এলো চুল পাগলের মতো উভচ্ছেলাগল—ঁচাদের আলোয় চিকচিক করতে লাগল।

অপরেশবাবু স্ত্রী আর মেয়ের কাঁধে হাতুরাখলেন, বললেন, ‘অ্যাক্সিডেন্টের পর আমি যেভাবে ওদের ফিরিয়ে এনেছি তা কেউ বিশ্বাস করবে না। তবে এ তো ঠিক ফিরিয়ে আনা নয়—চোকাঠে দাঁড় করিয়ে রাখা। দু-জগতের মাঝখানে। আর আমি?’ বিষণ্ণ আক্ষেপের এক শব্দ করলেন অপরেশবাবু : ‘আমি ওদের দুজনের পাহারাদার হয়ে দিন কাটাচ্ছি।’

‘তোমাকে আমরা ভালোবাসি।’ চন্দ্রা আর মাসিমা একইসঙ্গে বলে উঠলেন।

‘আমিও চন্দ্রাকে পাগলের মতো ভালোবাসি...।’

‘জানি। আর জানি বলেই তো এত কষ্ট করেও টিকে আছি।’

‘আমিও আপনাদের সঙ্গে কষ্ট করে টিকে থাকব।’ বায়না করার সুরে বলল সুজন।

অপরেশবাবু হতাশভাবে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন : ‘তুমি তো কিছুতেই বুঝতে চাইছ না! তা হলে দ্যাখো—’ স্ত্রী আর মেয়ের কানে-

কানে কী যেন বললেন অপরেশবাবু।

মাসিমা আর চন্দ্রা খিলখিল করে হেসে উঠলেন—হাসতেই থাকলেন। আর একইসঙ্গে ওঁদের ডানহাতটা তুলে নিয়ে গেলেন ডান চোয়ালের নীচে।

এরপর সুজন যা দেখেছিল তা সত্ত্বি হলেও পরে কখনও স্টোকে ও সত্ত্বি বলে মানতে পারেনি। কিন্তু ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভুল দেখার কোনও অবকাশ ছিল না

চন্দ্রা আর মাসিমা—দুজনেই ওঁদের মুখ দুটো খুলে নামিয়ে নিলেন। মুখ নয়, মুখোশ। সুজন দেখল, ওঁদের মুখের জায়গাটায় একরাশ অঙ্ককার।

ন্যাপথালিনের উৎকট গন্ধে সুজনের দম বন্ধ হয়ে এল। রাতের বাতাস হঠাৎই যেন আরও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একটা ঘোরের মধ্যেই শুনতে পেল নিশাচর কোনও পাখির কান্না।

দুটো অঙ্ককার মুখের পিছনে বিশাল কালো পতাকার মতো ওঁদের চুল উড়ছিল। সেই পটভূমিতে অপরেশবাবুর মুখটা ছায়ির মতো দেখছিল। স্ত্রী আর মেয়েকে আঁকড়ে কাছে টেনে নিলেন শিশু।

ওঁদের খিলখিল হাসির শব্দ তখনও থাম্যানি।

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাওয়ার অপরেশবাবুর শেষ কথাটা যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল সুজনের কানে।

‘...সেইদিন থেকে দুজন অঙ্ককারকে নিয়ে আমি বাস করি। আমার মেয়ে-অঙ্ককার, আর বউ-অঙ্ককার। এখানে আমরা তিনজন ছাড়া আর কারও ঠাঁই নেই...’





## ছায়াবন্দি খেলা

‘মি’ স্টার জোয়ারদার, আপনার কাছে কোনও অলৌকিক সমস্যা নিয়ে আমি আসিনি। ভূত-প্রেতের ব্যাপারে কোনও সাহায্যও চাইতে আসিনি।’ একটু থামলেন ভদ্রলোক। বোধহয় পরের কথাগুলো মনে-মনে গুছিয়ে নিতে চাইছিলেন। হাতের জুলত সিগারেটে ঘন-ঘন তিনটে টান দিয়ে শেষ টুকরোটা খুব সাবধানে অ্যাশট্রের গায়ে ঘষে নিভিয়ে দিলেন। তারপর সেটা অ্যাশট্রের গর্তে ফেলে দিয়ে কুলকুল করে ধোয়া ছাড়লেন। ঘরে ধোঁয়ার মেঘ তৈরি হয়ে গেল।

সেই মেঘের দিকে মুখ তুলে অবশ ঢোকে ভাকিয়ে রইলেন তিনি। যেন অপূর্ব এক রামধনু তাঁকে মুঝ করে দিয়েছে।

মেঘ ধীরে-ধীরে ফিকে হয়ে মিলিয়ে গেল। তখন ভদ্রলোক আনমনাভাবে বিড়বিড় করে বললেন, ‘বলতে গেলে এরকমই এক ধোঁয়ার গল্প আপনাকে আমি শোনাতে এসেছি। তবে সেটা সাদা ধোঁয়া নয়—কালো ধোঁয়া। ঘন কালো ধোঁয়ার মেঘও বলতে পারেন।’

প্রিয়নাথের কৌতৃহল ক্রমশ বাড়ছিল।

ভদ্রলোকের নাম অশেষ শিকদার। এয়ারপোর্টে চাকরি করতেন—বছরচারেক হল রিটায়ার করেছেন। তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে

রনিতি বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড-এ করণিক। প্রায় আট বছর হল বিয়ে করেছে। তিন-সাড়ে তিন বছরের একটি মেয়েও আছে।

অশেষবাবুর মেয়ে প্রমিতা পাস কোর্স বি. এসসি. পাশ করে বসে আছে। ঘরকম্বার কাজে মাকে সাহায্য করে আর গোটাচারেক টিউশনি করে।

ওঁরা সবাই থাকেন কৈখালিতে। রিটায়র করার পর অশেষবাবু সেখানে বাড়ি করেছেন। মোট ছ'জন মানুষ নিয়ে ওঁদের পরিবার বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু গত অগ্রহায়ণের এক অমাবস্যার রাত থেকে ওঁদের জীবনের ছকটা পালটে গেছে। ওঁদের সুখ-শাস্তির সাজানো ঘুঁটিগুলো কেউ যেন কাঠের একটা কৌটোয় ভরে পাগলের মতো ঝাঁকিয়ে তারপর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছত্রখান করে দিয়েছে।

অশেষ শিকদার ক'দিন ধরেই প্রিয়নাথকে ফোন করে দেখা করতে চাইছিলেন। কিন্তু ওঁর কথাবার্তার ধরন খুব স্বাভাবিক না হওয়ায় প্রিয়নাথ দেখা করতে চাননি—বরং এড়িয়ে যেতে চায়েছেন।

কিন্তু একদিন ভদ্রলোক টেলিফোনে এমন একটা কথা বললেন যে, প্রিয়নাথ কৌতুহলী হয়ে উঠলেন। সেই কথাগুলো এই মুহূর্তেও প্রিয়নাথের কানে অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলছিল।

অশেষবাবু আহত গলায় বলেছিলেন, ‘প্রিয়নাথবাবু, বুঝতে পারছি আপনি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। কারণ, আমার কথাবার্তা বোধহয় খুব একটা নরমাল নয়। আপনাকে একটা কথা বলতে পারি—আমি পাগল নই। কিন্তু আমার জীবনে যে-বড় বয়ে গেছে তাতে যে-কোনও মানুষই পাগল হয়ে যেত। আমি যে কেন হইলি সেটাই আশ্চর্যের।’ বিষণ্ণ হসি হেসেছিলেন ভদ্রলোক। তারপর : ‘বোধহয় আপনাকে সেই ঘটনাগুলো বলার জন্যেই আমি এখনও সুস্থ অবস্থায় বেঁচে রয়েছি। নইলে বহুদিন আগেই তো আমার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা! যাই হোক, এটুকু আপনাকে হলফ করে বলতে পারি, এরকম বিচিত্র ঘটনা আপনি জীবনে কখনও শোনেননি...।’

সেই বিচিত্র ঘটনা শোনার জন্যই প্রিয়নাথ শেষ পর্যন্ত ওঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছিলেন এবং শুক্রবার সন্ধিয়ায় ওঁকে বাড়িতে আসতে

অনুরোধ করেছেন।

অশেষ শিকদার যখন এসে হাজির হলেন তখন সওয়া ছ'টা মতন হবে। ভূতনাথ ওঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আজ একটু আগেভাগেই সঙ্কেবেলার পুজো আর্চার কাজ সেরে নিয়েছিলেন। তারপর অগোছালো বসবার ঘরটাকে একটু-আধটু ঠিকঠাক করে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মেঝেতে ঢলে পড়া বইপত্র আর ম্যাগাজিনগুলো যতটা সম্ভব থাকে-থাকে সাজিয়ে নিয়েছেন।

ব্যাচিলারদের ঘরের একটা বিশেষ চরিত্র থাকে। সেটা আনেকটা যেন ছমছাড়া স্বাধীনতার ছাপ। আর যারা সংসারী, তাদের সংসার পরিপাটি সাজানো-গোছানো হলেও কোথায় যেন একটা পরাধীনতার রেশ থেকে যায়। অস্তত প্রিয়নাথ তাই মনে করেন। তাই নিজের ঘরটাকে তিনি কখনও খুব ছিমছাম করে সাজান না—পাছে তার মধ্যে পরাধীনতার ভেঙ্গেন চুকে পড়ে।

অশেষবাবু এসে প্রথমেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন, মুঠোপর বংশলতিকার অঞ্জবিস্তর বিবরণ দিয়েছেন। প্রিয়নাথ তাতে বিরুদ্ধ হননি। কারণ, আসল রসের সন্ধান পেতে হলে অনেকটা নীরস পথে পেরোতে হয়—প্রিয়নাথের অভিজ্ঞতা অস্তত তাই বলে। সুতরাং তিনি শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন। অশেষবাবুকে একটানা কিয়া বলার সুযোগ দিচ্ছিলেন। আর মানুষটাকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

চেহারা রোগার দিকে হলেও স্বাস্থ্য খারাপ নয়। গায়ের রং ময়লা। গাল সামান্য বসা। কাঁচা-পাকা সরু গেঁফ। মাথার চুল ছোট-ছোট করে ছাঁটা আর তার বেশির ভাগটাই সাদা। কপালে একটা শিরা উঁচু হয়ে রয়েছে। ওপর-ওপর দেখে ব্লাড সুগারের রুগি বলে মনে হয়। তবে সবচেয়ে লক্ষ করার মতো জিনিস হল চশমার কাচের আড়ালে ওঁর চোখ দুটো। সরু লম্বাটে মুখে অস্বাভাবিক বড়-বড় দুটো চোখ যেন ভীষণরকম বেমানান। তার ওপর ভয়ে কিংবা কৌতুহলে চোখের মণি দুটো সবসময়েই অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। আবার হঠাৎ করেই কোনও কিছুর দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল হয়ে যাচ্ছে।

ছেট করে বারতিনেক কাশলেন অশেষবাবু। তারপর বলতে শুরু করলেন ওঁর বিচ্ছ্র কাহিনি।

আমার বাড়িটা কৈখালির দশদ্রোণ এলাকায়। দু-কাঠা জমির ওপরে ছেট একতলা বাড়ি। জমির ফাঁকা জায়গাটায় কয়েকটা সুপুরি গাছ আর একটা পেয়ারা গাছ আছে। পেয়ারা গাছটায় ভোরের দিকে কিংবা বিকেলের দিকে দু-চারটে পাখি-টাখি আসে—বসন্তবৌরি, বুলবুলি, কাঠঠোকরা—এ ছাড়া শালিক-চড়ই তো আছেই।

বাড়ি আমার হয়তো কোনওদিনই করা হয়ে উঠত না, যদিনা হঠাৎ করে লালটুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে যেত। লালটু ~~ওই~~<sup>জ্ঞান</sup>কারই ছেলে—‘ত্রিবেণী এন্টারপ্রাইজ’ নামে ওর একটা ~~কোম্পানি~~ আছে—কন্ট্রাকশনের কাজ করে। ওর সঙ্গে রয়েছে এক ঝঁক<sup>°</sup> তরতজা যুবক বিশ্বজিৎ, বাচু, পলটু, দেবাশিস, আরও অনেকে। আমাকায় কোনও উৎসব হলে ওরা সবার আগে হইহই করে মেতে ওঁরই আবার কারও অসুখ-বিসুখ বা বিপদ-আপদ হলে সবার আগে ওরই ঝাঁপিয়ে পড়ে—বড়-বৃষ্টি রাত-বিরেতের তোয়াক্ষা করে না।

লালটু আমাকে ধারে জমির মালিক হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, ধারে বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। আমি কোনওরকমে টাকার জোগাড় করে ওকে কিস্তিতে-কিস্তিতে শোধ দিয়েছি। বাড়িতে আমি আছি আজ চারবছর, কিন্তু ওর ধার এখনও শোধ করতে পারিনি—সামান্য কিছু বাকি আছে। আমি মনে-মনে জানি, ওর টাকা হয়তো আমি শোধ করে দেব, কিন্তু ওর খণ্ড সারা জীবনেও শোধ করতে পারব না।

লালটুর কথা এত করে বলছি তার কারণ, আমার এই বিপদেও ও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওর বন্ধুবান্ধবের দল নিয়ে প্রাণপথ লড়াইয়ে মেতে উঠেছিল—কিন্তু পারেনি। বোধহয় পারা সম্ভব ছিল না বলেই।

গত বছর অগ্রহায়ণ মাসের এক বিকেলে আমি বাড়ির বারান্দায় চুপচাপ বসে ছিলাম। শিবানী, মানে বউমা, ওর মেয়ে মুনমুনকে নিয়ে পেয়ারা গাছের নীচটায় বসে ছিল। আমার স্ত্রী বনানী বাড়ির ভেতরে টুকিটাকি



কাজ সারছিল। ছেলে রুনু তখনও অফিস থেকে ফেরেনি। সাধারণত ও সাতটা নাগাদ ফেরে। আর প্রমি বাড়ি ছিল না—চিউশানিতে গিয়েছিল।

পাখি দেখাটা আমার শখ। তাই পেয়ারা গাছটার ডালপালার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। দুটো বুলবুলি সেখানে খেলা করছিল।

সূর্য একটু আগে ডুবে গেছে। সময়টা গোধূলি মতন। শীতের বাতাস সবে হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করেছে। তা ছাড়া আমার বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা বড় পুকুর আছে। সঙ্গের পর সেদিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসে। সেদিন বাতাসটা একটু যেন বেশিই ঠাণ্ডা ছিল।

হঠাৎই আমার চোখে পড়ল একটা ছোট মেঘের টুকরো যেন আমার বাড়ির দিকে ভেসে আসছে।

সাধারণ মেঘের মতো হলে ব্যাপারটা আমার চোখ টানত ~~গুৰি~~। কিন্তু ওটার ভেতরে একটা কিছু ঘূরপাক খাচ্ছিল। যেন কালো মেঘের ভেতরে একটা আরও কালো মেঘের ডেলা খাঁচায় বন্দি বায়ের মতো অস্থিরভাবে পাক খাচ্ছে আর ফুঁসছে।

পশ্চিমের আলো একপাশ থেকে এসে ঝোলি শুপরে পড়েছিল। তাতে মেঘটাকে আরও অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

অদ্ভুত বলতে কীরকম? কালীগুজীর সময় আকাশে হাউই ওড়ে দেখেছেন? একরকম হাউই আছে যেগুলো আকাশে গিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর কয়েকটা উজ্জ্বল সাদা আলোর কণা ঝিকমিক করে জুলতে থাকে, আর হাওয়ার ভাসতে ভাসত নামতে থাকে নীচের দিকে।

এই মেঘটার ভেতরেও সেরকম কিছু একটা হচ্ছিল। ওটার ভেতরে যেন অসংখ্য বিদ্যুতের কণা জুলছিল আর নিভছিল।

মেঘটা ভাসতে-ভাসতে আমার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে এসে পড়ল। তারপর পেয়ারা গাছটার ডালপালা-পাতার ভেতরে ঢুকে পড়ল।

দিনের আলো মরে আসছিল। তাই মেঘটাকে আর স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে হঠাৎই নজরে পড়ল, একটা বুলবুলি পাখি নেই। চঞ্চল হয়ে এ-ডাল সে-ডাল করতে-করতে কখন যেন উড়ে পালিয়েছে। আপনি তো জানেন, বুলবুলি পাখি জোড়ায়-জোড়ায় থাকে। তাই ভাবলাম, অন্য বুলবুলিটা এখনই উড়ে চলে যাবে সঙ্গীর কাছে।

কিন্তু সেরকম কিছু হল না। বরং একটা চিৎকার কানে এল—কোনও পাখির কর্কশ চিৎকার। বেড়াল পাখির ছানা চুরি করতে এলে মা-পাখি যেমন কর্কশ চিৎকার করে অনেকটা সেইরকম। আর তারপরই দেখলাম, অন্য বুলবুলিটা গাছ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। গাছটাকে ঘিরে পাগলের মতো এলোমেলোভাবে উড়তে লাগল, আর ডাকতে লাগল।

সে-ডাক আমি চিনি। কারণ, আমি খুব খুঁটিয়ে পাখি দেখি, পাখির আচার-আচরণ লক্ষ করি। হারানো সঙ্গীর খোঁজে বুলবুলি অনেক সময় এরকম করে।

শিবানী মুনমুনকে নিয়ে বাড়ির দিকে চলে আসছিল, আর মুখ তুলে বুলবুলিটার অন্তুত আচরণ দেখছিল।

বাড়িতে ঢোকার সময় শিবানী আমাকে বলল, ‘দেখেছেন, বাবা, পাখিটা কেমন করছে?’

আমি ছেট করে ‘হ্যাঁ’ বললাম।

ওরা ভেতরে চলে যাওয়ার একটু পরেই পাখিটা উড়ে কোথায় চলে গেল। অন্ধকার ঘন হয়ে আসায় কালো ধোঁয়ানি মেঘটাকেও আর ঠাহর করতে পারলাম না।

দাজিলিঙ্গে বেড়াতে গিয়ে এরকম ভেঙ্গে থাকা ছেট-ছেট মেঘের টুকরো দেখেছি। অবশ্য ওগুলো মেঘ নয়—কুয়াশা। গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেলে কেমন স্যাঁতসেঁতে ভাব টের পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে একটু বাড়তি শীত। এই কালো মেঘের টুকরোটা আমাকে দাজিলিঙ্গের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

এমন সময় আমি একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব টের পেলাম। আচমকা একটা শীত আমাকে কাঁপিয়ে দিল। আমি তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে উঠে ঘরে চলে এলাম। তখন বুঝিনি, আমার পিছু-পিছু আরও একজন কেউ চুকে পড়েছে ঘরের ভেতরে।

সেটা বুঝলাম পরদিন রাতে।

সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বারান্দায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়েছি। রাত তখন ক'টা হবে? এগারোটা-সওয়া এগারোটা। রঞ্জু, শিবানী, প্রমিতারা সব শুয়ে পড়েছে। বনানী তখন রান্নাঘর শেষবারের মতন গুচিয়ে নিচ্ছে। ও প্রমিতার কাছে শোয়। আমি ড্রাইং কাম ডাইনিং স্পেসে হালকা

বিছানা পেতে শুই। তো চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট টানতে-টানতে ডাইনিং স্পেসের সিলিং-এর দিকে আমার চোখ চলে গিয়েছিল। তখনই খেয়াল হল, সিলিং-এর এক কোণে যেন একটুকরো কালচে ধোঁয়া জমাট বেঁধে রয়েছে। ধোঁয়া বা মেঘ বা ছায়া যা-ই বলুন, ওটার কোনও নির্দিষ্ট শেপ ছিল না। দেওয়ালের কোণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কেমন যেন লেপটে ছিল। অনেকটা ড্যাম্পের ছাপের মতন।

আমি সিগারেট ফেলে দিয়ে ঘরে চলে এলাম। ছায়াটার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে ওটাকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করলাম। না, তেমন কোনও ব্যাপার আমার নজরে পড়ল না। শুধু মনে হল, দেওয়ালের গায়ে লেপটে ওটা যেন সামান্য নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে—ঠিক আমিবার মতন।

বনানী আমার বিছানা পাততে এল। ওকে ব্যাপারটা বললাম<sup>১৩</sup> আঙুল তুলে দেখালামও।

ও খুব একটা আমল দিল না। আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে ওটার কাছে এগিয়ে গিয়ে একপলক কী দেখল ও-ই জানে। তাসপর বলল, ‘ও কিছু নয়, ঝুলের দাগ পড়েছে। তোমাকে বললাম ঝুলাণ্ডের একটা এক্জেস্ট ফ্যান লাগাও, তা আমার কথা শুনলে না। ও পঞ্জে একদিন আমি সন্ধ্যার মাকে নিয়ে ঝুলবাড়ু দিয়ে সাফ করে দেবো এখন শোবে এসো।’

আলে নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু খচখচানিটা মন থেকে গেল না। কেমন যেন মনে হল, কাল সকালে উঠে ওই কালচে ছোপটাকে ওখানে আর দেখতে পাব না।

পরদিন সকালে উঠে দেখলাম, আমার ভাবনা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য হয়ে গেছে।

এতে আমার স্বন্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু তার বদলে অস্বন্তিটা বেড়ে গেল। ছায়াটা এবার কোথায় কীভাবে দেখা দেবে সে-নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম।

ঠিক পাঁচ দিন পর ছায়াটা সাঙ্ঘাতিকভাবে জানিয়ে দিল, ও আছে। চলে যাওয়ার জন্যে ও আমার বাড়িতে এসে ঢোকেনি। কিন্তু আমার বাড়িটাই কেন যে ওর পছন্দ হল! পরে অবশ্য বুঝেছি, শুধু আমার বাড়িটা নয়—আমাকেও ওর ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আমাকে ছেড়ে ও কিছুতেই

যাবে না। কেন তা জানি না।

আমাদের বাড়ির রোজকার নোংরাগুলো পলিথিনের প্যাকেটে করে সামনের সরফ একটা রাস্তায় ফেলা হয়। ওখানে আরও দুচারটে বাড়ির আবর্জনা এসে পড়ে। সেগুলো ফেলামাত্রই পাড়ার দুটো বেড়াল আর একটা নেড়ি কুকুর সেখানে এসে হাজির হয়। তারপর প্যাকেটগুলো নিয়ে টানহাঁচড়া করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে কাঁটা-কুটো খায়।

হঠাতে লক্ষ করলাম, আবর্জনা প্যাকেটগুলো জায়গা মতো আর পড়ছে না। কিংবা বলা যায়, পড়ার পরই ওগুলো নিয়ে কেউ চম্পট দিচ্ছে। এ-নিয়ে কাউকে কিছু বলার আগেই আর-একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম।

আমার বাড়ির পেছন দিকটায় একটা তেঁতুল গাছ আছে।<sup>ক্ষেত্রে</sup> পাশ ঘেঁষেই আমার সেপটিক ট্যাঙ্ক। তো মাঝে-মাঝেই আমি বাড়ির চৌহদি ঘুরে তদারকি করি, সাফসুতরো করি। সেদিন করতে ক্ষেত্রে দেখি তেঁতুল গাছটার গোড়ায় একরাশ আবর্জনা ছড়ানো। প্যাকেট ছিড়ে কেউ ওগুলোর মধ্যে থেকে পাগলের মতো খাবার খুঁজে বেজিয়েছে। সন্দেহ করলাম, এ হয়তো কাকের কাণ। আবার বেড়াল-কুকুর হতে পারে। কিন্তু লক্ষ করলাম, ছড়ানো আবর্জনায় মাছের কঁচা বা মাংসের হাড় এক কণাও নেই। বরং ভাত-তরকারি আর রুটির টুকরো অল্পবিস্তর পড়ে আছে। কাক-বেড়াল-কুকুর হলে মনে হয় না, এগুলো পড়ে থাকত। তা ছাড়া এ-জায়গাটায় কখনও আবর্জনা ফেলা হয় না বলে ওরা বোধহয় এদিকটায় আসেনি।

ব্যাপারটা নিয়ে সামান্য দুশ্চিন্তা যে হয়নি, তা নয়। তবে খুব বেশি আমল দিইনি। এর দিনতিনেক পরে ঘটে গেল সেই অদ্ভুত ঘটনা।

সেদিন রাত আটকা নাগাদ লালটু ওর বন্ধু দেবাশিসকে নিয়ে এল আমার বাড়িতে। আমিই আসতে বলেছিলাম—হাজার দশেক টাকা শোধ করব বলে।

আমরা তিনজনে ড্রহং-ডাইনিং-এ বসে চা-বিস্কুট খাচ্ছি, মুনমুন হঠাতে আমার কাছে এল। ওর পেছন-পেছন চুকে পড়ল একটা বেড়ালছানা। ধবধবে সাদা এই ছেট্টা বেড়ালটা দিন কুড়ি-পাঁচিশ ধরে আমাদের সঙ্গী

হয়েছে। মুনমুন ওকে শুধু খাওয়াতে চায়। বেড়ালছানা ঘাঁটে বলে বউমা মাঝে-মাঝেই ওকে বকুনি লাগায়।

মুনমুন আমার কাছে এসেই ‘দাদান, ম্যাওকে খেতে দাও’ বলে সামনের প্লেট থেকে থাবা দিয়ে একটা বিস্কুট তুলে নিল। বেড়ালছানাটা তখন লালটু আর দেবাশিসের প্লাস্টিকের চেয়ার ঘিরে লাফাচ্ছে, ছুটোছুটি করছে।

লালটু মুনমুনকে কোলে নেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকছিল। মুনমুন পাকা বুড়ির মতো হাত তুলে ওকে অপেক্ষা করতে ইশারা করে বলল, ‘আগে ম্যাওকে খেতে দিই...।’

ঠিক তখনই শিবানী মেয়েকে ডাকতে-ডাকতে ঘরে এসে ঢুকল।

আমি চোখের কোণ দিয়ে একটা নড়াচড়া লক্ষ করলাম। সেদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি, টিভির টেবিলের নীচের অঙ্ককার থেকে একটা অঙ্ককার ছায়া গড়িয়ে আসছে আমাদের দিকে। মেঝেতে যেভাবে জল গড়ায় ঠিক সেইভাবে তরল কালো মেঘটা মোজেইক করা মেঝের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে আসতে লাগল।

লালটুদের আমি ওই ছায়া বা মেঝের ব্যাপারটা বলিন। কারণ, বললেও হয়তো ওরা বিশ্বাস করত না। কিন্তু এখন ওই মুহূর্তে, ওটা এভাবে দেখা দেবে আমি ভাবিনি।

কথা বলতে-বলতে আমি অন্যমনক্ষ হয়ে পড়েছিলাম। লালটু সেটা লক্ষ করে জিগ্যেস করল, ‘কী হল, অশেষদা?’

আমি কোনও শব্দ না-করে আঙুল তুলে ইশারা করলাম কালো ছায়াটার দিকে।

লালটু আর দেবাশিস সেদিকে তাকাল কিন্তু ঠিকমতো কিছু ঠাহর করতে পারল না।

লালটু শুধু বলল, ‘আপনার মোজেইকটা ওই জায়গায় কেমন কালচে হয়ে গেছে...।’

আর ঠিক তখনই খেলতে-খেলতে বেড়ালছানাটা ওই কালো ছায়াটার ওপর লাফিয়ে পড়ল।

একটা কালো চাদর হঠাতে করে গায়ে জড়িয়ে নেওয়ার মতো অঙ্ককার ছায়াটা বেড়ালছানাটাকে চোখের পলকে সাপটে নিল।

শিবানী ভয়ে চিংকার করে উঠল। দেবাশিসের হাত থেকে চায়ের কাপ ছিটকে পড়ল মেঝেতে। লালটু চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর চোখ এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে যে-কোনও ধরনের একটা হাতিয়ার খুঁজছিল।

আর আমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম।

কারণ, বেড়ালছানাটাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তবে ওর ‘ওঁয়া-ওঁয়া’ মরণ-চিংকার আমাদের সকালের কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছিল।

আমার বুলবুলি পাখিটার কথা মনে পড়ে গেল। পাখিটার উধাও হওয়ার রহস্য সেদিন আমি বুঝতে পারিনি। আজ, এই মুহূর্তে, হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছিলাম।

শুধু এই ভয়ঙ্কর সত্যিটুকু ছাড়া আর কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমার মাথা কাজ করছিল না। রেল-লাইন দিয়ে মেল দ্রেন ছুটে গেলে লাইনের দু-ধারের বাড়ির জানলা-দরজা যেরকম ঝুঁকিবঁক করে কেঁপে ওঠে, আমার হাত-পা ঠিক সেইরকম কাঁপছিল। তবে পা দুটো মেঝেতে অসাড় হয়ে গেঁথে গিয়েছিল। আর শিবানী~~কে~~ কিছু একটা বলতে চেয়ে আমি উদ্ব্লাস্ত হাত দুটো শূন্যে উঁচিয়ে ন্যস্তত চেষ্টা করছিলাম।

শিবানীর ভয়ানক চিংকার শুয়ে~~ক্ষুয়ে~~ প্রমি আর বনানী ছুটে এসেছিল এ-ঘরে। কিন্তু তখন মেঝের ওপরে শুধু একটা কালো ধোঁয়ার তাল পাক থাচ্ছে।

লালটু কোনওরকম হাতিয়ার খুঁজে না পেয়ে ধোঁয়ার তালটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেবাশিস ‘লালটু! লালটু সরে আয়—’ বলে ওকে হাত বাড়িয়ে থামাতে চেষ্টা করেছিল। খামচে ধরেছিল লালটুর জামা। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। লালটুর জামার খানিকটা অংশ ছিঁড়ে রয়ে গেল দেবাশিসের হাতে। আর লালটুর শক্তপোক্ত দেহটা মেঝেতে আছড়ে পড়ার শব্দ হল। ও যন্ত্রণায় ‘উঃ’ শব্দ করে উঠল।

দেবাশিস আর রনিত লালটুকে ধরে তুলল। ততক্ষণে ছায়াটা ফিরে হয়ে গিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে।

আমরা অতগুলো মানুষ কিছুই করতে পারলাম না। বেড়ালছানাটার চিংকার কমজোরি হতে-হতে হঠাৎই থেমে গেল। ওটার শরীরের এক

কণাও আর চোখে দেখতে পেলাম না।

ঘরটা মুহূর্তের মধ্যে শিশানের মতো চুপচাপ হয়ে গেল। শুধু মায়ের শাড়িতে মুখ গুঁজে মুনমুন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

অনেক—অনেকক্ষণ পর রন্ধন আমার কাছে এসে দাঁড়াল। প্রায় ফিসফিসে গলায় জিগ্যেস করল, ‘কী ব্যাপার, বাবা? এসব কী হল?’

আমি বড়-বড় শ্বাস টেনে হাঁফাছিলাম। এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে বললাম, ‘জানি না।’

বনানী আমাকে এক গ্লাস জল এনে দিল। লালটু আর দেবাশিস আমাকে ধিরে একরাশ উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শিবানী মুনমুনকে কোলে তুলে নিল।

নিজেকে একটু সামলে নেওয়ার পর ওদের ছায়ার ব্যাপারটোললাম।

প্রথমদিনের সেই বুলবুলি পাখির ঘটনা। তারপর আবর্জনাকে মাছের কাঁটা, মাংসের হাড় উধাও হওয়ার ব্যাপার। আর বললাম বাড়ির আনাচেকানাচে ওটার ঘাপটি মেরে বসে থাকার কথা।

ওরা সবাই শুনল। কিন্তু তক্ষুনি কেউ কেন্ত্রিকথা বলতে পারল না।

কিছুক্ষণ পর লালটু বলল, ‘অশেষদা, আপটি বিপত্তারিণীর পুজো দিন।’

আমি আর বনানী ধর্মতীরু মান্দে-দেব-দ্বিজে যথেষ্টই ভক্তি আছে। তাই লালটুর প্রস্তাবে সায় দিলাম।

দেবাশিস বলল, ‘অশেষদা, দিনের বেলায় ছায়াটাকে একবার খুঁজে দেখলে হয় না?’

‘কেন, খুঁজে পেলে কী করবি?’ লালটু জানতে চাইল।

দেবাশিস মাথা খাটাতে বেশি ভালোবাসে। ভেবেচিস্তে ধীরে-ধীরে কথা বলে। আর লালটু মাথাও খাটায়, সেই সঙ্গে শরীরও। ও সবসময়েই কিছু একটা করার জন্যে এক পায়ে খাড়া।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে দেবাশিস বলল, ‘খুঁজে পেলে ওটার ওপরে পেট্রল টেলে আগুন জ্বালিয়ে দেব।’

আমি মনে-মনে ভাবছিলাম : যাকে ধরা-ছেঁয়া যায় না, তাকে কি আগুনে পোড়ানো যায়!

লালটু বলল, ‘পেট্রল টেলে কিছু করা যাবে কি না জানি না—তবে

খুঁজে দেখা যেতে পারে!'

দেবাশিস জিগ্যেস করল, 'অশেষদা, কালো মেঘটা ঠিক কোনদিক থেকে  
ভেসে এসেছিল বলতে পারেন?'

'পুরুরের দিক থেকে'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ থাকার পর লালটু বিড়বিড় করে বলল,  
'ওদিকটায় প্রায় মাইলদেড়েক দূরে একটা কবরখানা আছে। এই ধোঁয়ার  
সঙ্গে লড়াই করে কিছু করা যাবে না। অশেষদা, আপনি বিপদ্ভারিণীর পুজো  
করুন—তারপর দেখুন কী হয়।'

আরও খানিকক্ষণ জঙ্গল-কম্পনার পর লালটুরা চলে গেল। যাওয়ার  
আগে বলে গেল, কাল দুপুরে দল বেঁধে ওরা ছায়াটাকে খুঁজতে আসবে।

সে-রাতে আমি আর ঘুমোতে পারলাম না। কানের ক্ষুচ্ছ শুধু  
বেড়ালছানাটার 'ওঁয়া-ওঁয়া' চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। তবে ~~বেড়ালছানাটার~~  
বদলে ওটা মুনমুনের কান্নাও হতে পারত। ঈশ্বর মুনমুনের কাঁচিয়ে দিয়েছেন।

এ-কথা ভাবতেই আতঙ্কের একটা হিম প্রবাহু আমার শিরদাঁড়া বেয়ে  
নেমে গেল। মনে হল, কালো ছায়াটার সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না।

পরদিন দুপুরে লালটুর দলবল এল আমার পাড়িতে। তন্তম করে কালো  
ছায়ার দলটাকে খুঁজল ওরা। কিন্তু ~~স্মরণ~~ ধোঁজাখুঁজিই সার হল। ওটার  
কোনও হাদিস পাওয়া গেল না।

ওরা চলে যাওয়ার অনেক পরে, সঙ্গে ছাঁটা-সাড়ে ছাঁটা নাগাদ,  
ছায়াটাকে আমি দেখতে পেলাম। ওটা কোথায় লুকিয়ে ছিল জানেন! শুনলে  
আপনার গা ঘিনঘিন করে উঠবে।

আমি তখন বাথরুমে গিয়েছিলাম। হঠাৎই দেখি পায়খানার প্যানের গর্ত  
থেকে এক দলা কালো ধোঁয়া পাক খেয়ে বেরিয়ে আসছে। গাঢ় কালো  
ধোঁয়াটার ভেতর থেকে যেন একটা চাপা রাগ ফুটে বেরোছিল। আর  
বাথরুমের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, ওটার ভেতরে বিন্দু-বিন্দু কয়েকটা  
আগুনের ফুলকি বালির কণার মতো চিকচিক করছে।

সাপের ছোবল মারার ভঙ্গিতে ধোঁয়ার একটা অংশ সরু হয়ে আমার  
দিকে ছিটকে এল। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে বাথরুম থেকে একরকম  
পালিয়েই এলাম।

রথের পরে শনিবার বা মঙ্গলবার দেখে সাধারণত বিপত্তারিণীর পুজো হয়। কিন্তু আমার মনে হল, সেইদিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হলে পুজো আমাদের বোধহয় আর করাই হবে না। তাই পাড়ার এক ঠাকুরমশাইকে ধরে জোর করে একটা দিন ঠিক করে বিপত্তারিণীর পুজো করলাম। কিন্তু অবস্থা একটুও বদলাল না। ছায়াটাকে মাঝে-মাঝেই দেখা যেতে লাগল।

রণিত, প্রমিতা, বউমা—ওরা সবাই মিলে আমাকে চাপ দিতে লাগল। বলল, বাড়িটা ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু চাকরি-জীবনের পয়সা তিলতিল করে জমিয়ে ধার নিয়ে, বহু কষ্টে বহু পরিশ্রম করে এ-বাড়ি আমি তৈরি করেছি। সে-বাড়ি এক কথায় বেচে দেব! তা ছাড়া এখন এই অভিশপ্ত বাড়ি কিনবেই বা কে!

আমি ওদের কথায় রাজি হতে পারলাম না। হেলেমেয়ের সঙ্গে আমার চাপা মন কষাকষি চলতে লাগল। রাতের ঘূর্ম দিনের শান্তি—সব উভে গেল। আমার উদ্ভাস্ত অবস্থা দেখে, কষ্ট দেখে, বনানী<sup>১</sup> স্থুর মনমরা হয়ে পড়ল। ঠাকুরকে প্রাণপণে ডাকতে লাগল, আর শুধু আঁচল গুঁজে কাঁদতে লাগল। আমি ভেতরে-ভেতরে শেষ হয়ে যেতে লাগলাম।

এরপর একদিন আর-একটা সাঙ্ঘাতিক ঝাপার হল।

বিকেল গড়িয়ে সবে সঙ্গে হচ্ছে শিবানী রানাঘরে চা করছিল। বনানী মুনমুনের একটা ছেঁড়া জামায় ছুঁচের ফৌড় দিচ্ছিল। মুনমুন আমার সঙ্গে ড্রেইং-ডাইনিং-এ বসে টিভি দেখছিল। আর প্রমি আমাদের সামনেই মেঝেতে বসে একগাদা অডিয়ো ক্যাসেট নিয়ে তার কী একটা লিস্ট তৈরি করছিল।

হঠাৎই শিবানীর ভয়ঙ্কর চিংকারে আমরা আপদমস্তক কেঁপে উঠলাম। ও যেন অন্ধ আতঙ্কে পাগল হয়ে একটানা মরণ-চিংকার করে চলেছে। তারই মধ্যে বাসনপত্র ছিটকে পড়ার শব্দ হল। কিছু কাপ-প্লেট বোধহয় ভাঙ্চুর হল।

প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিতে আমাদের কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। তারপরই আমরা ছুট লাগলাম রানাঘরের দিকে।

গিয়ে যা দেখলাম সেটা সংক্ষেপে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

দোলের সময় কালো রং মেখে ভৃত হলে যেমনটি দেখতে হয় শিবানীর অবস্থা অনেকটা সেইরকম। ওর ফরসা শরীরে, শাড়িতে, ব্লাউজে, সর্বত্র

হতচাড়া কালো ছোপ। তবে ও নিজের পায়ে ভয় করে দাঁড়িয়ে ছিল না। শূন্যে ওর দেহটা পাক খাচ্ছিল, লাট খাচ্ছিল, আর ও হাত-পা ছুড়ছিল। সাঁতার না-জানা মানুষ সাগরে ভেসে গেলে বাঁচার চেষ্টায় যেভাবে হাত-পা ছোড়ে ঠিক সেইরকম। সোজা কথায়, ওই ভয়ঙ্কর কালো ধোঁয়ার তালটা শিবানীকে সাপটে ধরে যেন চেটেপুটে গিলে খাচ্ছিল।

আমাদের সবায়ের চিৎকারে এক কানফাটানো হটগোল শুরু হয়ে গেল। আমি, বনানী, আর প্রমি শিবানীর শাড়ি-জামাকাপড় হাত-পা খামচে ধরে পাগলের মতো এলোপাতাড়ি টানতে শুরু করলাম। ওরই মধ্যে প্রমি আর বনানী হাউমাউ করে কাঁদছিল, আর মুনমুন ভয়ে নীল হয়ে গিয়ে ‘মা! মা!’ বলে চিৎকার করছিল।

কালো ছায়াটার শরীর থেকে একটা হিসহিস শব্দ শুনতে পাইছিলাম। কিন্তু আমি এতটুকুও ভয় পাইনি। বরং আমার ভেতরে একটা বেপরোয়া রাগ আর জেদ টগবগ করে ফুটছিল।

রান্নাঘরের বন্ধ জায়গায় তুমুল লড়াইয়ের পর শিবানীকে আমরা বাঁচাতে পারলাম।

কালো ছায়াটা আচমকা শিবানীকে ছেড়ে ছিয়ে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে চম্পট দিল। শিবানীর শরীরটা হাতদুঁটে ওপর থেকে খসে পড়ল মেঝেতে। ওর নাকের ডানদিকের ফুটো দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। বেশবাস অগোছালো। দু-চোখ ভয়ে বোজা। ও বড়-বড় শ্বাস ফেলছিল আর থরথর করে কাঁপছিল।

প্রমি আর বনানী ওর ওপরে ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করে কাঁদছিল আর ওকে বারবার ডাকছিল : ‘বউদি! বউদি!’, ‘শিবানী, শিবানী! ’

আমি বনানীকে চেঁচিয়ে বললাম, ‘মুনমুনকে ধরো! শিবানীর চোখে-মুখে-মাথায় জল দাও। আমি এক্ষুনি বীরেন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসছি! ’

ডাক্তার-ওষুধ করে প্রায় তিনদিনের চেষ্টায় শিবানীকে ভালো করে তুললাম। ও বলল, চা-পাতা রাখার কৌটোর ঢাকনা খুলতেই ভেতরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা কালো-ছায়াটা ওর ওপরে বাঁপিয়ে পড়ে।

কথাটা শুনে আমি হঠাৎই কেমন শিউরে উঠলাম।

শিবানীর দুর্ঘটনার পর থেকেই আমাদের সংসারে চিড় ধরে গেল।

সেদিন রাত্রি অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর শিবানীর অবস্থা দেখেশুনে একেবারে হলুঙ্গুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছিল। আমাকে ও সাফ জানিয়ে দিল শিবানী একটু ভালো হয়ে উঠলেই ওরা আমার অভিশপ্ত বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকবে না।

চার-পাঁচদিন ধরে বাড়িতে প্রচণ্ড অশাস্তি চলল। আমি একেবারে নির্বিকার নির্লিপ্ত হয়ে গেলাম। কেউ একশোটা কথা বললে হয়তো একটা কথা বলি। আমার আর কিছুই যেন ভালো লাগছিল না। বাঁচার ইচ্ছে একেবারে উবে গিয়েছিল।

একদিন সকালবেলা রন্ধন ওর বউ আর মেয়েকে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমি খবরের কাগজ পড়ছিলাম, মুখ তুলে তাকালাম। দেখি শুনো মান-টান সেরে সেজেগুজে বাঙ্গ-পঁঢ়িরা নিয়ে একেবারে তৈরি হয়ে এসেছে।

‘বাবা, আমরা চলে যাচ্ছি।’ মেঝের দিতে তাকিয়ে আজুতে গলায় বলল রাত্রি। তারপর একটু থেমে সময় নিয়ে : ‘তোমারও চলো। মা-কে বলেছি—মা, প্রমি—ওরা রাজি আছে...।’

‘তা হলে তুমি ওদের নিয়ে চলে যাও বুঝ?’

এ-কথা বলে আমি আবার খবরের কাগজের পাতায় চোখ রাখলাম।

প্রমি আর বনানী বোধহয় পরদার আড়াল দাঁড়িয়ে ছিল। আমার জবাব শুনে সামনে বেরিয়ে এল।

বনানী আমার কাছে এসে খবরের কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। আমার হাত দুটো চেপে ধরে কান্না-ভাঙ্গা গলায় মিনতি করে বলল, ‘তুমি কেন হেলেমানুষের মতো জেদ করছ! এ-বাড়িতে থাকলে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব। ওই শয়তান ছায়ার সঙ্গে লড়ে আমরা কেউ পারব না। তোমাকে কত করে বোঝাচ্ছ....তুমি কি কিছুতেই নিজের ভালো বুবৰে না!’

আমি পাথরের মতো বসে রইলাম। জানলা দিয়ে বাইরের গাছপালা আর আকাশ দেখছিলাম।

এবার প্রমিতা আমার কাছে এগিয়ে এল।

‘বাবা!’

আমি ওর দিকে তাকালাম। ওর চোখে-মুখে একটা জেদি ছাপ। ও আমার ধাত পেয়েছে।

‘বাবা, মরতে আমি ভয় পাই না। তবে এভাবে মরার কোনও মানে হয় না। এখানে থাকলে আমাদের সবার ক্ষতি হবে। তুমি কি তাই চাও?’

আমি এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ালাম : ‘না—চাই না। তাই তো বলছি, তোমরা সবাই চলে যাও—এ-বাড়িতে আমি একা থাকব। আমি এর শেষ দেখে তবে ছাড়ব।’

প্রমিতা বোধহয় বুঝতে পারল আমার সঙ্গে কথা বলে আর লাভ নেই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। তাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বনানীকে বলল, ‘মা, চলো—আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।’

বনানী জল-ভরা চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে<sup>ক্রান্তে-</sup>কাঁদতে বলল, ‘না রে, আমার আর যাওয়া হবে না। তোমা যা—।’

অনেক টানাপোড়েন আর কানাকাটির পর ওরা চলে গেল। শুধু বনানী ওর একগুঁয়ে স্বামীটাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে রইল। আমরা দুটি প্রণী ওই বাড়িতে রয়ে গেলাম। আর ছায়াটাও রয়ে গেলে।

বনানী ঠাকুর-দেবতা নিয়ে সময় কাটলো আর সুযোগ পেলেই আমার মেজাজ বুঝে পুরোনো অনুরোধটা করে<sup>করে</sup> চলো, এ-বাড়ি ছেড়ে আমরা চলে যাই।’

নতুন ধরনের দুর্ঘটনা আর না হলেও একটা ব্যাপার লক্ষ করছিলাম। ছায়াটা সবসময় আমার কাছাকাছি থাকে। যখন-তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখা দেয়। আমার চারপাশে ঘূরঘূর করে। যেন কিছু একটা করতে চায়। সেটা করবে না কি ভাবছে। তখনও বুঝিনি ওর মতলবটা কী। যখন বুঝলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বাইরের বাগানে দু-একটা পাখি মাঝে-মাঝে উধাও হচ্ছিল। মাছের কঁটা, মাংসের হাড় আগের মতোই গা-ঢাকা দিচ্ছিল। তবে এইসব ছোটখাটো ব্যাপারগুলো আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। ছায়াটাকে আমরা বন্দি করতে চাইতাম বটে, তবে তার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমি আর বনানী পাড়ার লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ছোট বাড়িটায় আমরা দুজনে মুখ বুজে দিন কাটাই। প্রমিতা

বা রনিতদের কখনও আসতে বলি না। ওরা কেউ ফোনে খবর নিলে দায়সারা ঠান্ডা উত্তর দিই।

এরকম একটা অবস্থা যখন চলছে, তখন এক অমাবস্যার রাতে ছায়াটাকে আমি বন্দি করতে পারলাম। বনানী ব্যাপারটা দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। পরে, ধীরে-ধীরে, ব্যাপারটাকে সহিয়ে নিয়েছে। আমিও সহিয়ে নিয়েছি। ধরে নিয়েছি, এটাই আমার নিয়তি।

একদিন রেডিয়োতে আপনার একটা ইন্টারভিউ শুনলাম। আমার খুব ভালো লাগল। তখনই মনে হল, আপনাকে আমার ব্যাপারটা আমি জানিয়ে যাব। অন্তত একজন ব্যাপারটা জানুক, যে এটা আগাপাস্তলা বিশ্বাস করবে।

তারপর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আপনার ফোন নাস্বার জোগাড় করেছি।

এরপর তো আপনি সব জানেন!

অশেষ শিকদারের মুখটা ভীষণ বিষাদগ্রস্ত আর করুণ দেখাচ্ছিল। কাহিনি শেষ করে তিনি যেন কোনও কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

প্রিয়নাথ সিগারেট ধরিয়েছিলেন। অশেষবাবুও। তাঁর দুজনের ধোঁয়া ঘরের মধ্যে কুয়াশা তৈরি করছিল। প্রিয়নাথ ছায়াটাকে চোখের সামনে দেখতে চাইছিলেন। তাই মনে-মনে ছায়াটার রং কালো করে দিলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, ‘মৈরের ব্যাপারটা তো আপনি ঠিক খুলে বললেন না! ছায়াটাকে কী করে আপনি বন্দি করলেন?’

অশেষ শিকদার মলিনভাবে হাসলেন। হাতের সিগারেটটা নিভিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিলেন। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, ‘ছায়াটাকে আমি ঠিক বন্দি করিনি। বরং বলতে পারেন, ওটা নিজেই ধরা দিয়েছিল...’ কথা বলতে-বলতে চোখের চশমাটা খুললেন অশেষবাবু, টেবিলে নামিয়ে রাখলেনঃ ‘আপনাকে ব্যাপারটা দেখাই, তা হলে বুঝতে পারবেন...।’

পূর্ণ দৃষ্টি মেলে প্রিয়নাথের দিকে তাকালেন অশেষ শিকদার। ওঁর বড়-বড় চোখ দুটো ধীরে ঘোলাটে হয়ে গেল। তারপর একটা গাঢ় কালো ছায়া কোথা থেকে এসে ওঁর চোখ দুটো ঢেকে দিল।

অবাক হয়ে প্রিয়নাথ দেখলেন, একটা মানুষ—অথবা, মানুষের ধৰ্মসম্মতি—কুচকুচে কালো রঙের দুটো আয়ত চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সে-চোখের সবটাই চোখের মণি—সাদার ছিটেফোঁটাও কোথাও নেই।

প্রিয়নাথ ভেতরে-ভেতরে কেঁপে উঠলেন।

অশেষবাবু এবার হাঁ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে জমাট কালো ধোঁয়া ওঁর মুখের গহুর থেকে পাক খেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল। সেই ধোঁয়ার ভেতরে বালির কণার মতো চিকচিক করছে কয়েকটা সাদা আলোর ফুলকি।

‘বুঝতেই তো পারছেন। শেষ পর্যন্ত আমার শরীরের ভেতরে আস্তানা গেড়েছে ওই কালো ছায়াটা। আমাকে ছেড়ে ও কিছুতেই ক্রোধিত যাবে না। হয়তো এভাবেই তিলতিল করে আমাকে শেষ করবে।’ অশেষবাবু কপাল চাপড়ে কাঁদতে শুরু করলেন। কানা জড়ান্তে গলায় বললেন, ‘আপনার কাছে কোনও সাহায্য আমি চাইতে আস্তানা মিস্টার জোয়ারদার। আমার অবস্থা এখন সব সাহায্যের বাইরে চলে গেছে। শুধু—শুধু আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আপনাকে শোনাতে আসছিলাম। আমি হলফ করে বলতে পারি, এরকম ঘটনার কথা স্মরণে কখনও শোনেননি—দেখেননি।’

অশেষবাবুর কথার তালে-তালে ওর মুখ থেকে কালো ধোঁয়ার ঝলক বেরিয়ে আসছিল। কালো ধোঁয়ার প্রকাণ্ড বেলুনটা তখন প্রিয়নাথের মাথার ওপরে ভাসছিল, দুলছিল। অশেষ শিকদার কালো চোখ মেলে সেই বেলুনটাকে দেখছিলেন।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার জীবনে এই প্রথম ভয় পেলেন।

